৮৩ বর্ষ

ব. সা. প. প.

পত্রিকাধ্যক্ষ

ডক্টর শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮৩-তম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা

বৈশাখ—আশ্বিন

সূচীপত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

এল. লিওটার্ড

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস : প্রথম পর্ব
[১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮৯৩-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ]
হইতে পুনর্মুদ্রিত ॥

দেরাদুনে এল. লিওটার্ডের সমাধি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

চুরাশীতম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে

মানবিকী-বিদ্যায় ভারতের জাতীয় আচার্য্য

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত

সভাপতির অভিভাষণ

আজ তারিখ ৮ শ্রাবণ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, ২৪ জুলাই ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৪-তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষ্যে পরিষদের পুরাতন কর্মী ও অন্যতম অনুরাগী রূপে, আমি পরিষদের প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা জ্ঞাপন করিতেছি। দীর্ঘকাল ধরিয়া পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি, উপরন্তু বিগত চারি বর্ষ আপনাদের আগ্রহে পরিষদের সভাপতির কার্য্যভারও পরিচালনা করিয়া আসিয়াছি। উপস্থিত আমার বয়স ৮৬ চলিতেছে, শীঘ্রই ৮৭-তে পড়িব। বয়সের পক্ষে শরীর মোটের উপর ভাল থাকা সত্ত্বেও, বেশ কিছুকাল হইতে, কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ও অপটুতা আমাকে কষ্ট দিতেছে। আমার নির্দিষ্ট কর্তব্যের বাহিরে অন্য যে নানা কাজের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা সমাধান করার অক্ষমতা এবং অনাসক্তি আমাকে পীড়া দিতেছে। আমার চিকিৎসক ও আত্মীয় এবং মিত্রদের বিশেষ পরামর্শ—এই বয়সে আমি যথাসম্ভব শীঘ্র এই-সমস্ত কার্য্যভার হইতে নিজেকে মুক্ত করি।

এই হেতু, বহু চিন্তার পর আমি পরিষদের সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পরিষদের সম্পাদক ও কার্য্যনির্বাহক সমিতিকে পত্র দিয়াছি, এবং আমার স্থানে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, পরিষদের সঙ্গে আমার সংযোগ কখনও ছিন্ন হইবে না—যাবজ্জীবন যথাশক্তি যথারুচি পরিষদের সেবা করিয়া যাইবার বাসনা থাকিবে।

ইদানীন্তন কালের কয়েক বৎসরের মত, এ বৎসরও পরিষদের নবীন চুরাশীতম বর্ষগ্রন্থিতেও আশার কথা যথেষ্ট দেখিতে পাইতেছি, পরিষদের

কার্য্যভার হইতে বিদায়ের কালে তজ্জন্য বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারের বার্ষিক প্রতিবেদন হইতে তাহার পরিচয় পাইবেন। আমাদের নানা অভাব-অভিযোগ আছে, সেগুলির বিরক্তিকর উপস্থিতি এখনও অপরিহার্য্য। পরিষদের সম্পাদক ও অন্য কর্মিগণ এবং বেতনভোগী কর্মচারিগণের সমবেত চেষ্টায় সেগুলির যথাসম্ভব সমাধান চলিতেছে। পরিষদের মত বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিবর্ধক ও প্রসারক প্রতিষ্ঠানের দুইটি দিক্ বা বিভাগ আছে—বৈজ্ঞানিক দিক্ এবং ব্যবহারিক দিক্। অর্থাৎ সংগ্রহ, অনুসন্ধান, অনুশীলন, গবেষণা, রচনা, বাচন ও ভাষণ, গ্রন্থ ও পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশন, প্রদর্শনী প্রভৃতির একটি দিক্, এবং আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা, প্রচার, কার্য্যালয়-পরিচালনা, বেতন বৃত্তি পারিতোষিক প্রভৃতির যথানিয়ম স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ, পরিষদ্-ভবনের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন প্রভৃতি লইয়া আর একটি দিক্। এই দুইয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা পরস্পর-সম্পৃক্ত। পৃথক্ করিয়া এই দুইটি দিক্কে দেখা চলে না। দেশের শিক্ষিতজনের, জন-সাধারণের সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা যেমন একদিকে অপেক্ষিত, অন্য দিকে তেমনি আর্থিক সহায়তার জন্য চাই সরকারের, এবং বিদ্যানুরাগী, ভাগ্যবান্ লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের কল্যাণহস্তের প্রসারণ। এই কয় বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, এ বিষয়ে পরিষৎ, অর্থশালী ও হৃদয়বান্ মাতৃভাষানুরাগী দাতৃবর্গের সহায়তা একদিকে যেমন পাইয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্য-সরকারের তথা ভারত-রাষ্ট্র সরকারের নিকট হইতে কাম্য ও অপরিহার্য্য সহানুভূতি ও কার্য্যকর সহায়তা পাইয়াছেন। এই ব্যাপারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্টনি লান্সলট্ ডিয়াস মহাশয়ের অকুণ্ঠ প্রীতিলাভে ধন্য হইয়াছে, এবং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষাদেশিক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার গুহ, ইঁহাদেরও নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া পরিপুষ্টির পথে পরিচালিত হইয়াছে। তেমনি, ভারত-রাষ্ট্র সরকারের নিকট হইতে, পরিষদের আর্থিক ও অন্য সমস্ত প্রকারের অভাব-অনটনের এবং অনুপপত্তির বিচার করিয়া, দিল্লীর কর্তৃপক্ষের কাছে উপযুক্ত অর্থ-সহায়তার প্রস্তাব করিয়া প্রতিবেদন জ্ঞাপন করিবার জন্য, বিশেষ উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত আই. সী. এস্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়

প্রেরিত হইয়া কলিকাতায় আসেন, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, পরিষদের উজ্জীবনের জন্য উপযোগী অর্থ-সহায়তার জন্য তাঁহার আরজি বা সুপারিশ-নামা পেশ করেন, তজ্জন্য আমাদের ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। আশা করা যায়, ভারত-সরকারের অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত হিমাদ্রিনারায়ণ রায় আই. সী. এস্ মহাশয়ও এই অনুমোদনময় প্রতিবেদন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিবেন।

পরিষদের বিদ্যা ও অনুসন্ধানের দিকের কাজও ভাল-ভাবেই চলিতেছে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার তাঁহার গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও এই কার্য্যে পূর্ণ-ভাবে আত্ম-নিয়োজিত হইয়া আছেন। গবেষণা ও পুস্তক-প্রকাশনে এই বৎসরও তাঁহার লক্ষণীয় কৃতিত্বের প্রমাণ হইতেছে, পরিষৎ হইতে তাঁহার নব-প্রকাশিত পুস্তক "ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল দে (১৭৫২-১৮২৫)"। বহু গবেষণা করিয়া, এবং আমেরিকার কতকগুলি বিদ্যোৎসাহী সংস্থার সাহায্যে, নূতন সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া, তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক প্রায়-বিলুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার করিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন (প্রথম সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬+২২ ; ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩, ১৫ই মে ১৯৭৬)। ইহাতে বাঙ্গালাদেশের তরুণ গবেষকদের কাছে একটা নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইল। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, এ সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে, বাঙ্গালা দেশ তথা ভারত এবং আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ট বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগের বহু লুপ্ত তথ্য পাওয়া যাইবে। আমাদের পুরাতন পুস্তক এবং আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি চিত্রের মূল্য অপরিসীম—বিশেষতঃ রামদুলাল দে-র কাঠে-খোদাই প্রতিমূর্তি, এবং যে ধরণের পালে-চলা জাহাজে করিয়া আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে পণ্য-বস্তুর লেন-দেন হইত, সেইরূপ একখানি জাহাজের ছবি—এইরূপ একখানি জাহাজের নাম আমেরিকানরাই দিয়াছিলেন "রামদুলাল,"—ইহা রামদুলালের ব্যবসায়িক সততার ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার পরিচায়ক। বাঙ্গালাদেশ ও ভারত-বর্ষের অন্যতম বিরাট কৃতী সন্তান রামদুলালের বিলুপ্ত কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার করিলেন শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার—রামদুলালকে শ্রীকৃষ্ণ কবিরাজ, ভারতচন্দ্র, রামমোহন

রায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের পাশে তাঁহার যোগ্য স্থানে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৯৫২-৫৩ সালে আমি ছয় মাসের জন্য আমেরিকায় অতিথি-অধ্যাপক রূপে ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে কাটাইয়া আসি। সেই সময়ে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের খ্রীষ্টীয় আঠারোর ও উনিশের শতকের বাণিজ্যিক ও অন্যবিধ সংযোগের দুই একটি কথা জানিতে পারি। ফিলাডেল্‌ফিয়া এই ভারত-মার্কিন সংযোগের অন্যতম প্রধান আমেরিকান কেন্দ্র ছিল উনিশের শতকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত, যেমন ভারতবর্ষে এইরূপ কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। ১৭৮৪ সালের পরে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সংযোগের সূত্রপাত। তখন নবস্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশ আমেরিকার সঙ্গে ইংলাণ্ডের মিত্রতা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় বাঙ্গালীদের কাছে আমেরিকানরা যথেষ্ট সাহায্য পান। Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman থরো, রাল্‌ফ্ ওঅল্‌ডো ঈমর্‌সন, ওঅল্‌ট্ হুইট্‌মান্ প্রমুখ অল্পসংখ্যক কয়েকজন মনীষী ঐ সময়ে ভারতীয় জীবন, ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হন, আমেরিকার সাহিত্যে সেই সব প্রসঙ্গের গৌরবময় অবতারণাও করেন। অন্য ছোটো-খাটো নানান্ ব্যাপারে আমেরিকা আমাদের ঘরের মধ্যেও প্রবেশলাভ করে। ফিলাডেল্‌ফিয়া অঞ্চল-হইতে যে-সব পালে-চলা জাহাজ দুই-তিন মাসের পাড়ি দিয়া কলিকাতায় আসিত, সেই সব জাহাজে কলিকাতা বন্দরের জন্য অন্য পণ্য-দ্রব্য (ব্যবসায়ের মাল) না থাকিলে, কেবল জাহাজের ভারসাম্য ঠিক রাখিবার জন্য ballast অর্থাৎ খোল-ভরাটি মাল হিসাবে আমেরিকার নদীর শীতে-জমা বরফের বড় বড় চাঁই বা চাবড়া পাঠানো হইত, কাঠের গুঁড়া চাপা দিয়া সেই প্রাকৃতিক বরফের অনেকটা কলিকাতায় আসিয়াও ঠিক থাকিয়া যাইত, সম্পূর্ণ গলিয়া নষ্ট হইত না, কলিকাতার Ice-House-এর গুদামে সেই আমেরিকান বরফ রক্ষিত হইয়া চড়া দামে বিক্রী হইত, ডাক্তারের নির্দেশ মত সেই বরফ, রোগীর সেবায় অথবা ধনী ভোজন-বিলাসীর ভোগে লাগিত। ভাব-বিষয়েও আমেরিকার সঙ্গে এই বাণিজ্য-সূত্রে অল্পবিস্তর যোগাযোগ ঘটিত। এবং কলিকাতার বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত বাঙ্গালী বণিক্‌রা এই কাজেও মার্কিন বণিক্‌দের সহযোগী হইতেন। মার্কিন বণিক্‌রাও

বাঙ্গালী বণিক্‌দের সঙ্গে মেলামেশা করিতে চাহিতেন, তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ জীবনযাত্রা-পদ্ধতি রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁহারা কৌতূহলী ছিলেন, বাঙ্গালী বণিক্‌দের অনেকের ছবি আঁকিয়া তাঁহারা আমেরিকায় পাঠাইতেন—এই-সব ছবি বড় করিয়া তৈল-চিত্র রূপে অঙ্কিত হইয়া আমেরিকার বণিক্‌দের দপ্তরের ভিত্তি অলঙ্কৃত করিত, এবং ছোটো ছবি রূপে আমেরিকায় পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া জন-সাধারণের মধ্যেও প্রচারিত হইত। বাঙ্গালী বণিক্‌দের তাঁহারা প্রীতির নিদর্শন নানা উপহারও দিতেন, সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হইত—সৌখীন বস্তু যেমন ঘড়ি, মূর্তি, চিত্র—জর্জ ওয়াশিংটনের তৈল-চিত্র (শ্রীমদনমোহন কুমারের পুস্তকে মুদ্রিত) যেমন রামদুলালকে সম্মান ও প্রীতির নিদর্শন রূপে পাঠানো হয়।

বাঙ্গালী বণিক্‌দের এইরূপ বহু প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয় তখনকার কালে কাঠে-খোদই ছাপা-ছবির আকারে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারের বইয়ে রাম-দুলাল দে-র যে ছবিখানি দেওয়া হইয়াছে, সেটি এই-জাতীয় চিত্র, এবং ইহার মূল্য অসাধারণ। সাম্প্রতিক কালে আমেরিকায় ভারত-সম্বন্ধে (বিশেষত ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরে) যে জিজ্ঞাসা এবং আগ্রহ দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে, এ-সব ছবিরও পুনর্মুদ্রণ নূতন করিয়া আবার কোনও-কোনও আমেরিকান পত্র-পত্রিকায় দেখা দিতেছে। আমেরিকায় ১৯৫২ সালে থাকা কালীন আমার হাতে এইরূপ কতকগুলি পত্রিকা ফিলাডেল্‌ফিয়া-শহরে পুরাতন বইয়ের দোকানে আমি পাইয়াছিলাম—সেগুলি উনিশের শতকের তিরিশ ও চল্লিশের কোঠায় প্রকা-শিত বলিয়া মনে হইতেছে। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আমার গ্রন্থা-গারে রাখিয়া দিয়াছি—বহু বৎসর ধরিয়া যত্ন করিয়া রাখা, এখন পর্য্যবেক্ষণের অভাবে সেগুলি নষ্ট হয় নাই, কিন্তু আমার পুস্তক-সংগ্রহের প্রায় ত্রিশ হাজার বই ও কাগজপত্রের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে, অনেক শ্রম করিয়া খুঁজি-য়াও সেগুলির পুনর্দর্শন এখনো হয় নাই। তবে আমার বিশ্বাস, সেগুলি আছে ; খোয়া যায় নাই, এবং খোঁজ করিলে অন্যত্র সেই-সব পত্র-পত্রিকাও মিলিতে পারিবে। তাহা ভবিষ্যতে আশার কথা মাত্র। এই-সব ছবির মধ্যে চার-পাঁচটি ছবির কথা মনে আছে—ছোটো আকারে কাঠের ব্লক হইতে ছাপা—মনে পড়ে, পুণ্যশ্লোক মোতীলাল শীল মহাশয়ের ছবি তাহার মধ্যে অন্যতম, আর তাহা

ছাড়া কলিকাতার হাটখোলার দত্তদের বাড়ীর নামী বাঙ্গালী বেনিয়ান বা বণিক্ দুই একজনেরও ছবি ছিল। এগুলির আবার সন্ধান করিয়া পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার চেষ্টায় আছি —কিন্তু দুস্তর বইয়ের ও কাগজপত্রের স্তূপ পারাইয়া বাহির করা, বার্ধ্যক্যের দৌর্বল্যপীড়িত এই শেষ জীবনে আমার পক্ষে সম্ভব হইবে কি জানি না। একটা জিনিস ছবিগুলি দেখিয়া তখনই মনে হইয়াছিল। এখন তো ভারতবর্ষে বাঙ্গালী তাহার শিরোভূষণ-বিহীন খালি মাথার জন্যই চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে, পাগড়ী বা টুপি পরিহিত অন্য সমস্ত প্রদেশের ভারতীয়দের পাশে সহজেই "নঙ্গা-সির বঙ্গালী" ধরা পড়ে। কিন্তু এককালে মাথায় কিছু একটা পরিধান করা, বাঙ্গালীর পোশাকেরও বৈশিষ্ট্য ছিল। পুরাতন বাঙ্গালা কবিতায় পড়ি, বাঙ্গালীর পূরা পোষাক তিন খণ্ড বস্ত্র লইয়া হইত—"একখান কাছিয়া পিন্ধে, আরখান মাথায় বান্ধে, আরখান দিলা সর্ব গায়।" অর্থাৎ ধোত্র বা ধুতি, উত্তরীয় বা অঙ্গবস্ত্র বা চাদর, এবং শিরোবস্ত্র বা পাগড়ী—ইহাই ছিল বাঙ্গালীর full dress বা সামাজিক ভদ্র পোষাক। খালি ধুতি পরিয়া সমাজে বাহির হওয়া— "এক ছুটে" থাকা, অশোভন বলিয়া বিবেচিত হইত—মাথায় পাগড়ী না থাকুক, গায়ে উত্তরীয় রাখিতেই হইত। সাধারণ গৃহস্থ বাঙ্গালীর মধ্যে জামা পরিবার রীতি ছিল না। তবে পূরা রাজপুত বা মুসলমানী পোষাকে রাজা-রাজড়ারা আঙ্গিয়া বা আচকান পরিতেন। এবং আঠারোর ও উনিশের শতকে সাদা সুতির কাপড়ের মেরজাই বা "বেনিয়ান" (আমাদের "ফতোহী" বা "ফতুয়া"য় ইহার পরিবর্তনে)—ইহাতে প্রথমটায় সূতা বা ঝিনুকের বোতাম হইত না, তাহার পরিবর্তে দোড়ি বা ফিতা দিয়া বেনিয়ান ভিতর দিকে বাঁধা হইত। টুপিরও রেওয়াজ ছিল না। রাজ-রাজড়া বা পদস্থ ব্যক্তি মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিতেন—সেই যে বৈষ্ণব পদে আছে, গোপীরা মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছে—"রাজা হ'য়েছ, পাগ বেঁধেছ মাথে।" পদস্থ মুসলমানগণ যে সমস্ত মূল্যবান্ জরীদার টুপি পরিতেন, সেগুলির নকলে হিন্দু বাঙ্গালীরাও কখনও-কখনও পরিতেন, সেগুলিও নানা ধরণের হইত, এবং সেগুলির সাধারণ নাম ছিল "তাজ"। খাঁটি বাঙ্গালী বাঁধা পাগড়ীও নানান্ ধরণের হইত যথা—"পাক, পাগ, পাগড়ী, ফেটা, মুরেঠা বা মুরাঠা (মুণ্ডবেষ্ট),"—এগুলি যতদূর জানা যায়, কেবল শ্বেতবর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড, লঘু শিরোবেষ্টনী আকারে মাথায় জড়ানো

হইত, এবং এইরূপ পাগড়ী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বা বৈশ্যবৃত্ত পদস্থ ব্যক্তিরাই ব্যবহার করিতেন। রামদুলাল দে-র ছবিতে এই ফেটা বা মুরেঠা পাগ দেখিতেছি, এবং মার্কিনদের আঁকা সেযুগের অন্যান্য বাঙ্গালী বণিক্‌দের মাথায়ও এই ধরণের সাদা কাপড়ের ফেটা বা পাগ বা মুরেঠা। ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয় চিত্রকর যাঁহারা অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ ব্যবসায়বৃত্ত ব্যক্তিদের ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন—বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য Baltasar Solvyns বাল্‌তাজার সল্‌ভ্যাঁস নামে এক ফরাসী চিত্রকার বাঙ্গালী জীবনের বহু লক্ষণীয় ছবি ইনি উনিশের শতকের দ্বিতীয় দশকে বড়ো-বড়ো Album চিত্র-পুস্তক-রূপে প্রকাশিত করেন। শ্রীমতী Fanny Parker যিনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী পোষাকে কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষের সুন্দর-সুন্দর রঙ্গীন চিত্র প্রকাশিত করেন, এবং শ্রীমতী Belnos বেল্‌নস্‌, যিনি অতি মনোহর ঢঙ্গে আঁকা কলিকাতার জীবনের কতকগুলি লিথো বা পাথরে ছাপা দৃশ্য আঁকিয়া প্রকাশিত করেন,—সেগুলি আলোচনা করিয়া দেখিবার বস্তু যে-সব বাঙ্গালী স্বজাতির মধ্যে বাহ্য সংস্কৃতির বিকাশের কথা খুঁটিনাটির সঙ্গে চর্চা করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে। পূর্বে আঠারো-উনিশের শতকে এই সব বাঙ্গালী বণিক্‌, যাঁহারা সাহেব অর্থাৎ ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার, ফিরাঙ্গী বা পোর্তুগীজ, ও পরে আমেরিকানদের সঙ্গে মিলিয়া ভারতে আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, ইংরেজদের মধ্যে তাঁহাদিগের প্রচলিত নাম ছিল "বেনিয়ান," ও "মুৎসুদ্দি" "বুক-কিপার" ও শেষে "বড়া-বাবু"। এই বেনিয়ানদের পোষাক পরিচ্ছদের সুন্দর ছবি পাওয়া যাইবে শ্রীমতী Belnos-এর বইয়ে (বহু পূর্বে এই সব ছবির কিছু-কিছু "প্রবাসী" পত্রিকাতে পুনঃ প্রকাশিত করিয়া আমি ইদানীন্তন কালে প্রথম দেশবাসীর দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম, পরে স্বর্গত রায়বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বৃহৎ-বঙ্গ" গ্রন্থে এইসব ছবির অনেকগুলি ছাপাইয়া তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন।) পূর্বে বাঙ্গালী অভিজাত-বংশীয় রাজ-মর্য্যাদার ব্যক্তিগণ যে প্রকার খাঁটি বাঙ্গালী ধরণের পাগড়ী পরিতেন, তাহা আমরা রাজা রামমোহন রায়ের, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের ছবিতে পাই। সেকেলে দুর্গা প্রতিমার কার্ত্তিক-ঠাকুরের ধুতি-চাদর পরা মূর্তির মাথায়ও এই ধরণের রাজোচিত পাগড়ী। পরে নানা

পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার শেষ পরিণতি, এবং তৎপরে ইহার অবসান—আদালতের উকীলের সামলায়, লেজওয়ালা বাঁধা "পীরালী" পাগড়ীতে, এবং রাজস্থান ও পাঞ্জাব হইতে আগত মুর্শিদাবাদের ও আজীমগঞ্জের জৈন ব্যবসায়ী-দের ঘরোয়া ছোটো পাগড়ীতে।

এইভাবে, এইসব প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক বইয়ের মধ্যে নিহিত তথ্য থেকে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির একটি পূর্ণতর দিগ্‌দর্শনে সাহায্য পাওয়া যায়।

পরিষদের আরব্ধ পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গালা অভিধানের কাজ, যাহা শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক মহাশয়ের দান মাসিক সহায়তাকে অবলম্বন করিয়া আরম্ভ করা গিয়াছে, তাহা ধীরে-ধীরে চলিতেছে, কিন্তু নানা কারণে তাহা তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এজন্য আরও অর্থ, অধিক-সংখ্যক গবেষণা-সহায়ক ও কর্মী প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তা এজন্য আমরা প্রত্যাশা করিতেছি।

বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও অন্য মনীষীদের স্মৃতি-রক্ষার জন্য পরিষদ্ নানা আয়োজন করিয়াছেন এবং আমরা যথাসম্ভব স্বর্গত লেখক ও অন্য বিভিন্ন বরেণ্য মানবের জন্ম-তিথি পালন করিয়া আসিতেছি—তাঁহাদের শতবার্ষিকী পালন করা পরিষদের অন্যতম কর্তব্য গৃহীত হইয়াছে। এইবার, পরিষদের চুরাশীতম বর্ষে, আমরা সপ্তাহব্যাপী একটি শরৎ-শতবার্ষিক-প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেছি। আমাদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার, তাঁহার অতন্দ্র উৎসাহ ও কর্মশক্তি লইয়া এই কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন—এবং এ বিষয়ে তিনি শরৎ-অনুরাগী দেশবাসীগণের সাগ্রহ সাহচর্য্য পাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আশা করিতেছি যে তাঁহার জীবনের কিছু কিছু স্মারক বস্তু পরিষদের সংগ্রহশালার, বাঙ্গালীর জাতীয় সংগ্রহশালা বিধায়, দানরূপে অর্পিত হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বয়স, প্রচলিত বাঙ্গলা বাক্যরীতি অনুসারে, চার-কুড়ি-চার হইল। আর চার-চারে ষোলো বৎসর পরে, সাহিত্য-পরিষৎ পাঁচ-কুড়ি পূরা করিয়া শতায়ু হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বঙ্গভাষী জাতিরই মত সহস্রায়ু হউক, সংসারে জাজ্জল্যমান থাকিয়া তাহার বিধি-নির্দিষ্ট কৃত্য সাধন

করিয়া ধন্য হউক, এবং পরিষদের সেবকগণও সর্বকালে ধন্য হউন এবং চিন্তা ও অভিনিবেশ তথা শ্রম ও সেবা দানের দ্বারা পরিষদের কর্মিগণ যে নিঃস্বার্থভাবে মাতৃভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতির পরিপুষ্টি করিতেছেন, তাঁহারা, এবং যাঁহাদের হস্তে দ্রব্য-দানের ভার অর্পিত, সেই সব রাজপুরুষও ধন্য এবং জয়যুক্ত হউন ॥

"সুধর্মা", কলিকাতা ॥
২৭ আষাঢ় ১৩৮৩।
১১ জুলাই ১৯৭৬ ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

৮৩-তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৩-তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সশ্রদ্ধ ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ উপস্থিত করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষের মধ্যে যে সকল সাহিত্যসেবী ও দেশের কৃতী সন্তান পরলোকগমন করিয়াছেন সর্বাগ্রে তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, 'দীপালি'-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, প্রবোধ সমাদ্দার, দুর্গাদাস সরকার, সরলানন্দ সেন, শিশুসাহিত্যিক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শিক্ষাব্রতী বিনোদবিহারী দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র-কুমার দে, বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা-কাহিনীর লেখিকা জেন আগাথা ক্রিষ্টী, ডেম সিবিল্ থর্নডাইক, পল রবসন্, সুনীলচন্দ্র সরকার, 'কল্লোল'-যুগের লেখক সুধীরিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি জসীমুদ্দিন, শিল্পী জয়নুল আবেদিন, ডাক্তার কার্তিক মিত্র, নাট্যপরিচালক ও সাহিত্যিক অশোক সেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হরিদাস মিত্র, প্রখ্যাত খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল, স্বাধীনতা-সংগ্রামী ভবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ চৌধুরী, সঙ্গীত-শিল্পী রাজেশ্বরী দত্ত, শিক্ষাবিদ্ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ লাহিড়ী, কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী হরিদাস দত্ত, সাংবাদিক দীনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্তবালা দেবী, অধ্যাপক ভোলানাথ রায়, ডাক্তার জে. এম. সিদ্দিকী, হরিয়ানার রাজ্যপাল বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, কবি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত রায়, অনিল কুমার চন্দ, পরিমল গোস্বামী, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, সাংবাদিক খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আহমেদজান থেরাকুয়া, চৌ. এন. লাই, ডাক্তার হরিপদ পোদ্দার, সাংবাদিক নকুল

চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর রামস্বামী মুদালিয়ার, পল গ্যালিকো আলোচ্য বর্ষে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করি।

আর্থিক সহায়তা

আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে কর্মচারী নিয়োগ খাতে ২১,৩০৩ টাকা, পুস্তক-প্রকাশ খাতে ১,২০০ টাকা, পত্রিকা-প্রকাশ খাতে ২,০০০ টাকা, পৌনঃপুনিক অনুদান খাতে ১১,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামহাধ্যক্ষ ও শিক্ষাসচিব এবং অর্থসচিবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিষদের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও নব রূপায়নের জন্য মাননীয় রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নুরুল হাসানের আলোচনার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মন্ত্রক নূতন দিল্লী হইতে প্রাপ্তাবসর আই. সী. এস্. শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র দত্তকে পরিষদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া রিপোর্ট ও সুপারিশ করার জন্য প্রেরণ করেন। পরিষদের সম্প্রসারণের জন্য পরিষৎ সম্পাদক প্রেরিত প্রতিবেদন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র দত্ত পরীক্ষা, তদন্ত ও পর্য্যা-লোচনার পর তাঁহার অনুমোদনময় রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছেন। পরিষদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে শীঘ্রই সম্ভব হইবে এবং পরিষদ্ নবীন উদ্দীপনা লইয়া বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গ-সংস্কৃতির সেবায় সফল ও সার্থক হইবে।

কার্য্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিগত ছয় মাসে কার্য্যনির্বাহক সমিতির ৬টি অধিবেশন হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম **পরিশিষ্ট 'ক'**-এ প্রদত্ত হইল।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়:

১ম মাসিক অধিবেশন: ২৪ মাঘ ১৩৮২, শনিবার

সভাপতি: শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিষয়: ন্যাসরক্ষক সমিতির একটি শূন্যপদ পূরণের জন্য

সদস্য নির্বাচন।

২য় মাসিক অধিবেশন ২২ ফাল্গুন ১৩৮২, শনিবার

সভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নিবন্ধ পাঠ : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,
শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

বিষয় : ডেভিড হেয়ার।

৩য় মাসিক অধিবেশন : ২১ চৈত্র ১৩৮২, রবিবার

সভাপতি : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বিষয় : চারিজন ভোট পরীক্ষক নির্বাচন।

সভাসমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

১। ৮৩-তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব : ৮ শ্রাবণ ১৩৮২

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল),
শ্রীমদনমোহন কুমার।

২। বিরাশীতম বার্ষিক অধিবেশন : ২৬ পৌষ ১৩৮২

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল),
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীমদনমোহন কুমার।

প্রতি বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) জন্ম ও মৃত্যু দিবসে কবির সমাধিস্থলে মর্মর-মূর্তিতে ও কবিপত্নীর সমাধি-মর্মরে মাল্যদান করা হয়।

আলোচ্য বর্ষেও কবির জন্মদিবস ২৫ জানুআরি ও মৃত্যুদিবস ২৯ জুন পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সদস্য শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মধুসূদনের মর্মর-মূর্তিতে ও কবিপত্নীর সমাধিতে মাল্যদান করেন।

সদস্য

বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যদের বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ'-এ প্রদত্ত হইল।

চিত্রশালা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা সুদীর্ঘকাল হইতে বিভিন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তির বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত, মুদ্রা, মূর্তি, প্রত্নবস্তু, তৈলচিত্র, শিল্পকর্ম, ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি মহার্ঘ্য সামগ্রী দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। বিগত বৎসরে শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ৺রজনীকান্ত গুপ্তের একখানি আলোকচিত্র উপহার দিয়াছেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ষপূর্তি উৎসব পরিষদে অনুষ্ঠিত হইবার পর তাঁহার পুত্র শ্রীঅদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (১) জৈনধর্ম সম্পর্কে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি, (২) 'জৈনধর্ম' পাণ্ডুলিপি (৩) এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকাতে প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধাদির তালিকা (৪) রাখালদাসের ১৯১৯ সালের ডেস্ক ডায়েরী, (৫) রাখালদাসের সহধর্মিণী কাঞ্চনমালা দেবী লিখিত 'মল্লিকার দাবী'র অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, (৬) 'ধ্রুবা' উপন্যাস ও নাটকের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, (৭) প্রথম মহীপালের সময়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত রাখালদাসের একটি নাটকের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, (৮) শিরোনামহীন আর একখানি নাটকের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, (৯) 'ধ্রুবা' নাটকের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, (১০) প্রত্নবস্তু-অনুসন্ধানকালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহৃত খাকী হাফপ্যাণ্ট, (১১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহৃত সিগার পাইপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় দান করিয়াছেন।

শ্রীদাশরথি তা পরিষদের চিত্রশালায় (১) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকে বহেড়ায় মুদ্রাযন্ত্র চালাইবার ২ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের হাতে-লেখা সরকারী আদেশপত্র, (২) হরচন্দ্র রায়কে কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক পুনর্মুদ্রণের জন্য ১৬ জুন ১৮১৮ তারিখের হাতে-লেখা সরকারী আদেশপত্র, (৩) নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহেড়ায় মুদ্রাযন্ত্র চালাইবার ১৩ আগষ্ট ১৮৫৭ তারিখের মুদ্রিত সরকারী অনুমতিপত্র (Licence)—দান করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীঅদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও শ্রীদাশরথি তা-কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা হইতে অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধারের পর কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যমন্ত্রক ও পুরাতত্ত্ববিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত

পরিষৎ সম্পাদকের আলোচনাকালে ভারতের পুরাবস্তু সংরক্ষণ সম্বন্ধে ও পুরাবস্তু অপসারণ-রোধের সতর্কতামূলক ব্যবস্থারূপে জনসাধারণকে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা হয়। পরিষদ্ মন্দিরে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীআন্তনি লন্সলট্ ডিয়াস্ কর্তৃক বিষ্ণুমূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যমন্ত্রকের Film Division of India, Bombay একটি রঙীন তথ্যচিত্র নির্মাণের ভার গ্রহণ করেন। ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিসনের অধিকর্তা শ্রীসমীরণ দত্ত তাঁহার সহকারী শ্রীপুরুষোত্তম বাওকর ও অন্যান্য সহকর্মীদের লইয়া কলিকাতায় আসেন ও পরিষৎ সম্পাদকের সহিত আলোচনান্তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালার ও বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধার সম্পর্কে চিত্র গ্রহণ করিয়া একখানি রঙীন তথ্যচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। উক্ত তথ্যচিত্রের নাম প্রথমে "Save the Treasures of India" করা হইবে প্রস্তাব হয়। পরে "A Future in the Past" (Antiquities and Art Treasures Act, 1972 to preserve the cultural heritage and monuments) নামে ঐ রঙীন তথ্যচিত্রটি কলিকাতার Elite চিত্রগৃহে ৩—৯ জুলাই প্রদর্শিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাখ্যাসমন্বিত ঐ রঙীন তথ্যচিত্রটি কলিকাতায় ১১—১৭ জুলাই 'প্রাচী', 'কালিকা', 'অজন্তা', 'নবীনা' চিত্রগৃহে, ১৯—২৫ জুলাই 'ছায়া' চিত্রগৃহে, ২৭ জুলাই—২ আগস্ট 'জয়া' চিত্রগৃহে, ৪—১০ আগস্ট 'শুকতারা' চিত্রগৃহে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ভারত-সরকারের তথ্যমন্ত্রক জানাইয়াছেন।

আকাশবাণী, কলিকাতা-কেন্দ্র পরিষদের চিত্রশালা ও প্রদর্শনী সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে সংবাদ ও আলোচনা প্রচার করিয়া এবং কলিকাতার টেলিভিসন-কেন্দ্র পরিষদের পুথিশালা ও চিত্রশালা সম্বন্ধে সংবাদ-চিত্র প্রচার করিয়া পরিষদের আনুকূল্য করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাদের সকলকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

পুথিশালা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালা বিভিন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তির বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত বাঙ্গালী জাতির চিন্তাজগতের এক অমূল্য রত্নমন্দির।

আলোচ্য বর্ষে সর্বপ্রকার তালিকাভুক্ত পুঁথির সংখ্যা ৬৭১৬। ইহাদের বিষয়-ভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাংলা—৩৫৫০, সংস্কৃত—২৯২৭, হিন্দুস্থানী—২, তিব্বতী—২২০, ফার্সী—১৩। পরিষদে প্রদত্ত বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে আছে বাংলা পুঁথি : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সংগ্রহ—৪১১, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংগ্রহ—২১ এবং গোপালদাস চৌধুরী সংগ্রহ—২৬। সংস্কৃত পুঁথি : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংগ্রহ—৩২৪, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সংগ্রহ—১৩, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংগ্রহ—৬০ এবং গোপাল দাস চৌধুরী সংগ্রহ—২৫৬।

সম্প্রতি পরিষদের পুঁথিশালার জন্য আয়ুর্বেদের তিনখানি প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রাচীন পুঁথি তিনখানি প্রেমতোষ সেনগুপ্ত মহাশয় দান করিয়াছেন। পুঁথি তিনখানি সেনগুপ্ত মহাশয়ের পিতা কবিরাজ ৺অমুতোষ সেনগুপ্ত মহাশয়ের পূর্বপুরুষদের সংগ্রহে ছিল। শ্রীপ্রেমতোষ সেনগুপ্ত মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

বর্ত্তমান বর্ষে মোট তিনজন গবেষক ৩৩ খানি পুঁথি পরিষদ গ্রন্থাগারে বসিয়া ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থশালা

আলোচ্য বর্ষে (১৩৮২ সাল) গ্রন্থাগারের কার্য্যাদি যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এ বৎসর গ্রন্থাগার মোট ২৮৪ দিন খোলা ছিল এবং সর্বমোট ১০, ৪৬০ জন, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪৪·৫৭ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রন্থাগারের লেন-দেন বিভাগেও মোট ২৮৪ দিন কাজ হয় এবং সর্বমোট ৫৭৯২ জন, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২০·৪৬ জন পাঠক-পাঠিকা এই বিভাগ হইতে বাড়ীতে পুস্তক লইয়া যান। গ্রন্থাগার পাঠকক্ষেও মোট ২৮৪ দিন কাজ হয় এবং মোট ৪৬৬৮ জন, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬·৪৩ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পাঠকক্ষ ও লেনদেন বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৯ ও ৪৬ জন।

এ বৎসর গ্রন্থাগারে মোট ২০, ৪৩০ খানি, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৭২·৯৩ খানি পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেন-দেন পত্রকের সাহায্যে ৯০১২ খানি, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩১·৭ খানি এবং পাঠকক্ষে ১১,৪১৮ খানি,

অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪০·২ খানি পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। বিষয়ানুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের সংখ্যাগত হিসাব **পরিশিষ্ট 'গ'**-এ দেওয়া হইয়াছে।

১৩৮২ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারের মোট পঞ্জীকৃত (catalogued) পুস্তক-তালিকা **পরিশিষ্ট 'ঘ'**-এ দেওয়া হইল। গত কয়েক বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে পঞ্জীকৃত গ্রন্থের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রন্থশালার পুস্তক সংরক্ষণ ও বাঁধাইয়ের ব্যবস্থাও আলোচ্য বৎসরে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। অবিরত ব্যবহারে গ্রন্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থাভাব-বশত বাঁধাই ও সংরক্ষণের কার্য্য প্রয়োজনানুসারে অগ্রসর হইতেছে না। অতএব এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা আশু প্রয়োজন।

সাহিত্য পরিষদে ছাত্র-সদস্যের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন ও সমকালীন গ্রন্থাদি সরবরাহ করা সম্ভবপর হইতেছে না। এ বিষয়ে যথোচিত সাহায্য লাভের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থী ছাত্র-সদস্যগণের প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

তরুণ ছাত্র-সদস্যগণের পরিষৎপ্রীতির জন্য তাঁহাদের অভিনন্দন জানাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বঙ্গের এই প্রাচীনতম স্বারস্বত-মন্দিরের তাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি করুন, পরিষদ্ মন্দিরে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' তাঁহারা সফল করুন, এই প্রার্থনা করি।

১৩৮২ বঙ্গাব্দে পরিষৎ গ্রন্থাগারে মোট ৪৪৩ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে, পুস্তকগুলির আনুমানিক মূল্য টাকা ৩২৬৯·৬১ পয়সা। যাঁহারা উপহার দানে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শরৎচন্দ্রের আসন্ন জন্মশতবর্ষ-পূর্তি-উৎসব

আগামী ৩১ ভাদ্র ১৩৮৩ (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬) শুক্রবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে সপ্তাহ-

কালব্যাপী একটি প্রদর্শনী ও সাধারণ সভার আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে সহৃদয় দেশবাসীর নিকট সংবাদপত্র মারফত এই মর্মে আবেদন করা হইয়াছে, যদি তাঁহাদের নিকট শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, রচনার পাণ্ডুলিপি, স্বাক্ষরিত পুস্তক, ব্যবহৃত জিনিষপত্র থাকে তাঁহারা যেন পরিষদের এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিবার জন্য পাঠান। ইহাতে কিছু সংখ্যক সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ প্রতিশ্রুতি এখনও পাওয়া যায় নাই। সংবাদপত্রে আবেদন প্রকাশ ছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পরিষৎ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের অনুরাগী বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট সংরক্ষিত তাঁহার স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্রাদি পরিষদের প্রদর্শনীর জন্য সংগ্রহ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই পরিষৎ সম্পাদকের ব্যক্তিগত চেষ্টায় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', 'বামুনের মেয়ে', 'অভাগীর স্বর্গ', 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীর একটি অধ্যায়', 'লালু' প্রভৃতি রচনার মূল পাণ্ডুলিপির ও শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি পত্রের সম্পূর্ণ অলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে। আপনাদের সকলের নিকট আবেদন করিতেছি, আপনারা এই প্রদর্শনী ও স্মরণসভা-উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে সর্ব্ববিধ সহায়তা করুন এবং আপনাদের নিকট যদি শরৎচন্দ্রের লিখিত পত্র, স্বাক্ষরিত পুস্তক, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি কিছু থাকে তাহা এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য দান অথবা প্রেরণ করুন। সকল প্রকার সহায়তা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এবং পরিষদের মুদ্রিত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে।

আপনারা অবগত আছেন যে. ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাঙ্গালী মনীষী ও সাহিত্য-সাধকগণের বহু চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্ত, প্রদর্শিত বা রক্ষিত শরৎচন্দ্রের পত্রগুলি 'শরৎচন্দ্রের পত্রগুচ্ছ' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। যে সকল সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের মূল পত্র বা ফোটোস্ট্যাট পরিষদের সংগ্রহ-শালায় সংরক্ষণের জন্য দিবেন সেগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

পুস্তক মুদ্রণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকখানি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে :

১. ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল দে (১৭৫২-১৮২৫)

—শ্রীমদনমোহন কুমার

চারখানি দুর্লভ প্রাচীন চিত্র—১. রামদুলাল দে (পুরাতন উড্ এনগ্রেভিং হইতে); ২. প্রাচীন কলিকাতার ডক : রামদুলালের কর্মক্ষেত্র ; ৩. জর্জ ওয়াশিংটনের তৈলচিত্র : মার্কিন বণিকগণ কর্তৃক রামদুলালকে উপহৃত (বহু বর্ণ রঞ্জিত); ৪. অষ্টাদশ শতকের মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজ (এইরূপ একখানি মার্কিন বাণিজ্য জাহাজের নাম ছিল 'রামদুলাল')—এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে :

১. সেকাল আর একাল (৩য় মুদ্রণ)—রাজনারায়ণ বসু
২. উইলিয়ম কেরী (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ১৫ সংখ্যক পুস্তক)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ডের অবশিষ্ট অংশের এবং 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থ ছাপার কাজ চলিতেছে।

পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে পরিষদের আজীবন সদস্য, পূর্বতন ন্যাসরক্ষক, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তিনখানি পত্র পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিশিষ্ট ঙ-য় মুদ্রিত হইল।

পরিষৎ বাঙ্গালা অভিধান

পরিষৎ বাঙ্গালা অভিধানের কাজ আলোচ্য বর্ষে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাঙ্গালা শব্দ চয়নের কাজ বর্তমানে

চার জন বৃত্তিভোগী গবেষকের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক প্রদত্ত 'আরতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি' এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানশঙ্কর সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রদত্ত 'রামকমল সিংহ স্মৃতি-তহবিলের' বৃত্তি হইতে এই কার্য্য চলিতেছে। এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আরও অর্থ প্রয়োজন। এইরূপ একখানি অভিধান সংকলনের কাজে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাই। এই কাজে সহযোগিতার জন্য বঙ্গভাষার অধ্যাপক ও অবৈতনিক গবেষকদের স্বেচ্ছাশ্রম পরিষৎ সব সময় প্রার্থনা করিতেছেন। আর্থিক সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকটও প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যের প্রত্যাশা করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ পত্রিকার ১৩৮২ বঙ্গাব্দের ১ম-২য় সংখ্যা (বৈশাখ-আশ্বিন) প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বর্ষের ৩য়-৪র্থ (কার্তিক-চৈত্র) সংখ্যার মুদ্রণের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। অচিরে এই সংখ্যাটিও প্রকাশিত হইতেছে।

পরিশেষে, সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক হিসাব বিনা পারিশ্রমিকে অডিট্ করার জন্য শ্রীবলাইচাঁদ সাহা (কুণ্ডু), চাটার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট ও তাঁহার সহকারীদের পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি॥

শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

পরিশিষ্ট—ক
৮৩-তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য	শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীকুমারেশ ঘোষ

সম্পাদক

শ্রীমদনমোহন কুমার

সহকারী সম্পাদক

শ্রীহারাধন দত্ত শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য

সর্বশ্রী অধীর দে, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকুমার ঘটক, কানাইচন্দ্র পাল, কামিনীকুমার রায়; গজেন্দ্রকুমার মিত্র, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ শেঠ, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ধীরাজ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনসুর আলি সিদ্দিকী, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, সুধাকান্ত দে, সুব্রত কুমার।

শাখা প্রতিনিধি

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, নৈহাটি শাখা। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ শাখা। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ, বিষ্ণুপুর শাখা। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, কৃষ্ণনগর শাখা।

পরিশিষ্ট—'খ'

৮৫-তম বর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য

পৃষ্ঠপোষক : পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীআন্তনি লান্সলট দিয়াস্‌।

বান্ধব : রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্ট সদস্য : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ন্যাসরক্ষক : *সর্বশ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, প্রমথনাথ* বিশী, অশোককুমার সরকার, বিমলেন্দুনারায়ণ রায় (কোষাধ্যক্ষ)।

আজীবন সদস্য : সর্বশ্রী সত্যচরণ লাহা, নেমিচাঁদ পাণ্ডে, প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন মাইতি, হিরণকুমার বসু, সমীরেন্দ্রকুমার সিংহরায়, ইন্দুভূষণ বিদ্, ত্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নীহাররঞ্জন রায়, সত্যপ্রসন্ন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দে, বিভুভূষণ চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলকুমার রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্দ্র তফাদার, ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী, সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীমকুমার দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষা সেন, রঞ্জিতকুমার দাস, শিবেন্দ্রনাথ কুণ্ড, কমলকুমার গুহ, বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সরকার, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহন সাহা, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল, দেবকুমার বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী সেন, অশোককুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিন্দ বসু, অতীশচন্দ্র সিংহ, তুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মিত্র, মধুসূদন মজুমদার, দেবজ্যোতি দাস, অরুণকুমার সেন, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র ঘোষ, মলয়কুমার চক্রবর্ত্তী, দীনেশচন্দ্র সরকার, অজিতকৃষ্ণ ঘোষ, সীতারাম সাকসেরিয়া, চিত্তরঞ্জন সাহা, রামকুমার ভুয়ালকা, মণীন্দ্রকুমার কুণ্ডু, নন্দলাল কানোরিয়া, বি. পি. খৈতান, পুরুষোত্তম দাস তুলসায়ন, তুষারবরণ সাহা, সত্যরঞ্জন কোনার, মুকুলিকা কোনার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসরঞ্জন দে বিদ্যানিধি, জ্যোতির্ময় গুহ, ধীরাজকৃষ্ণ বসু, কালীচরণ সেন, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

পরিশিষ্ট—'গ'

পুস্তক আদান-প্রদান : ১৩৮২—বিষয়ানুযায়ী

	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন (১০০)	৭১	৭১	১৪২
ধর্ম (২০০)	২৩৯	৪২৬	৬৬৫
সমাজ বিজ্ঞান (৩০০)	৯২	২৪৪	৩৩৬
শিক্ষা (৩৭০)	২২	৩৪	৫৬
ভাষা (৪০০)	৭৬	১২৪	২০০
বিজ্ঞান (৫০০)	৩০	১৩	৪৩
ফলিত-বিজ্ঞান (৬০০)	১৬	১৬	৩২
শিল্পকলা (৭০০)	৬৯	৫১	১২০
সঙ্গীত (৭৮০)	৩৭	৬৫	১০২
সাহিত্য (৮০০)	৭৩৮২	৩৮০০	১১,১৮২
ভূগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০)	১৩৯	৩২	১৭১
জীবনী (৯২০)	৫৫১	৭০৬	১২৫৭
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯)	১৩৬	২৮৬	৪২২
সহায়ক গ্রন্থ (০০০)	৪২	১৮০	২২২
পত্র-পত্রিকা	---	৪৫৪০	৪৫৪০
	৮,৯০২	১০,৫৮৮	১৯,৪৯০

ভাষানুযায়ী

বাঙ্গালা	৮,৯০২	১০,৫৮৮	১৯,৪৯০
ইংরজী	৮২	৬৯৭	৭৭৯
সংস্কৃত	২৪	১৩৩	১৫৭
হিন্দী	৪	—	৪
	৯,০১২	১১,৪১৮	২০,৪৩০

পরিশিষ্ট-'ঘ'

পঞ্জীকৃত পুস্তক (১৩৮২ বঙ্গাব্দে পঞ্জীকৃত)

বাঙ্গালা	...	১৪৩১
ইংরজী	...	৬০০
ইংরজী পত্র-পত্রিকা	...	৯
বাঙ্গালা পত্র-পত্রিকা	...	১০২
সংস্কৃত	...	৫৭
হিন্দী	...	৫৬
		মোট —২২৫৫

পরিশিষ্ট—ঙ

[মাননীয় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্র]

জয়মঙ্গল

টেলিফোন : ৪৬-২৫০৫

১১৭/১ সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা-২৯
১৯ শে আষাঢ়, ১৩৮৩
(৩. ৭. ৭৬)

প্রীতিভাজনেষু,

কয়েক দিন পুর্ব্বে আপনার রচিত 'রামদুলাল দে' গ্রন্থখানার এক কপি লোক মারফত পাইয়া বাধিত হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত মাত্র পাতা উল্টাইয়া দেখিয়াছি, পড়িতে পারি নাই। আমার শরীর অনেক দিন হইতেই অসুস্থ, তাহাতে আবার চক্ষুতে ছানি পড়িতে আরম্ভ করায় লেখা এবং পড়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাই, আজ গ্রন্থখানার প্রাপ্তি স্বীকার মাত্র করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। অনুমান করি, যে ইংরেজী সন্দর্ভটির একটি টাইপ করা কপি আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন, বাংলা বইটি তাহারই পরিবর্দ্ধিত রূপান্তর। অল্প-কালের মধ্যে আপনি কত যে অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ইংরেজী সন্দর্ভটিতে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

সাহিত্য পরিষদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্য আকর্ষণ ও তাহাদের নিকট হইতে পরিষদের উন্নতিকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য আপনার অক্লান্ত চেষ্টা কতকাংশে ফলপ্রসূ হইয়াছে জানিয়া পুলকিত হইয়াছি। আপনি তো পরিষদের কল্যাণকামীদের ধন্যবাদার্হ বটেনই, R. C. Dutt মহাশয়ও। তিনি গভীর সহানুভূতির সহিত সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করিয়া পরিষদের সঙ্কটমোচনের জন্য একটি যুক্তিপূর্ণ রিপোর্ট পেশ না করিলে হয়তো এই অনুদান লাভ সম্ভব হইত না। পরিষদের সহিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত মহামনীষীর সংস্রবও নিশ্চয়ই কার্য্যকর হইয়াছে।

আশা করি কুশলে আছেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত ডঃ মদনমোহন কুমার
সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

৩৩৯৫ / তাং ৬. ১০. ১৩৯২

জয়মঙ্গল

টেলিফোন: ৪৬-২৫০৫

১১৭/১ সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

২৫শে আষাঢ়, ১৩৮৩
(৯. ৭. ৭৬)

প্রীতিভাজনেষু,

কয়েক দিন পূর্ব্বে এক সংক্ষিপ্ত চিঠিতে আপনার রচিত এবং আমাকে উপহৃত 'রামদুলাল দে' গ্রন্থটির প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলাম। আশা করি সেই চিঠি আপনার হস্তগত হইয়াছিল। 'আশা করি' বলিতেছি এই কারণে যে আজকাল ডাকবিভাগকে একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না।

ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষু লইয়া গ্রন্থটি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম চক্ষুকে অতিরিক্ত পীড়ন না করিয়া কেবলমাত্র পাতাগুলির উপর ভাসাভাসা-ভাবে বুলাইয়া যাইব। কিন্তু আপনার রচিত কাহিনীটি এমনই চিত্তাকর্ষক যে বইখানা আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে না পড়িয়া পারিলাম না। কত যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যে কেমন করিয়া করিলেন, ভাবিয়া পাই না। আমাদের ছাত্রাবস্থায় সাময়িক পত্রিকা-গুলিতে প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনায় একটি বাক্য প্রায়ই দেখিতাম—"ইহা উপন্যাস অপেক্ষাও কৌতূহলোদ্দীপক"। ঐ বর্ণনা আপনার গ্রন্থটির প্রতি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। উহাতে যে কেবলমাত্র রামদুলাল দে প্রকট হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা নয়, সমসাময়িক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ও তৎকালীন বাণিজ্যিক পরিবেশের একটি পরিপূর্ণ চিত্রও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক অজ্ঞাত ও স্বল্পজ্ঞাত তথ্য আপনার গ্রন্থটিতে বিধৃত হইয়া রহিল বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও হইবে অপরিসীম। তাহা ছাড়া, আপনার নিরাভরণ বর্ণনার গুণে গ্রন্থটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, পাঠকেরা ইহার মধ্যে বিগত কালের এক ভিন্ন জাতের ও বৃহৎ মাপের বাঙালীর সাক্ষাৎ পাইয়া পুলকিত হইবে। [আজকাল যে শব্দটির বহুল প্রচলন দেখিতেছি, সেই অশুদ্ধ 'আকর্ষণীয়' শব্দটি ব্যবহার করিলাম না।]

গ্রন্থখানি লিখিতে লিখিতে আপনি রামদুলালকে উপহৃত ওয়াশিংটনের তৈলচিত্রটি আমেরিকায় ফিরিয়া গিয়া বর্ত্তমানে কোথায় রহিয়াছে, তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেন। চিত্রটির অঙ্কনকারী শিল্পী কে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে। দেখিলাম যে যাঁহারা চিত্রটি Stuart-এর অঙ্কিত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারা Winstanley নামক এক শিল্পীর নাম করিয়াছেন। এই প্রকার কোন বিষয়ে আমার মত লোকের কোন মত প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা, তবু না বলিয়া পারিতেছি না যে আমার আর এক জন শিল্পীর কথা মনে হয়, তিনি Trumbull। Stuart-এর জীবন-কাল ছিল ১৭৫৫-১৮২৮ ; Trumbull-এর ১৭৫৬-১৮৪৩। উভয়েই আমেরিকা হইতে লণ্ডন ও প্যারিসে আসিয়া Benjamin West নামক এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। West-ও ছিলেন আমেরিকার লোক, তিনি Rome, Florence, Bologna এবং Venice ঘুরিয়া অবশেষে লণ্ডনে আসিয়া স্থিত হন এবং George III-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তিনি Royal Academy-র প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের অন্যতম ছিলেন এবং Academyর প্রথম প্রেসিডেন্ট Sir Joshua Reynolds-এর পর দ্বিতীয় President হন। তিনি প্রতিকৃতি অঙ্কনের এক নূতন রীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং Stuart ও Trumbull, উভয়েই সেই রীতির অনুসারী ছিলেন। শুধু তাঁহারা নয়, লণ্ডন ও প্যারিসের চিত্রশিল্পীরাও বহুদিন পর্য্যন্ত West-এর প্রবর্ত্তিত প্রতিকৃতি অঙ্কনরীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। Trumbull আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেকগুলি ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করেন, সেগুলির কয়েকটিতে ওয়াশিংটনের প্রতিকৃতি আছে। ঐ চিত্রগুলির অনেকগুলি Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রশালায় রক্ষিত, অবশিষ্টগুলি নানা মিউজিয়ামে। এবারে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে USIS যে দেয়াল পঞ্জিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ছয়টি পাতাতেই এক একটি করিয়া Trumbull অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি আছে। তাহা ছাড়া Recent Additions to American Libraries নামে যে পুস্তিকাটি মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে, তাহারও প্রত্যেক সংখ্যার প্রচ্ছদপট Trumbull কর্তৃক অঙ্কিত একটি ছবির প্রতিলিপি। ঐ সকল ছবির অন্তর্ভুক্ত ওয়াশিংটনের প্রতিকৃতির সঙ্গে রামদুলালকে উপহৃত প্রতিকৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য

দেখিতে পাওয়া যায়—তবে আমেরিকার সমালোচকেরা প্রতিকৃতিটি Trumbull কর্তৃক অঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা কোন সঙ্গত কারণেই বাদ দিয়া থাকিবেন।

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে আপনি যখন রামদুলাল দে সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন, তখন আপনাকে আমি বলিয়াছিলাম যে একটি সাময়িক পত্রে রামদুলাল সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি সেই পত্রিকাটি সেই সময়ে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। আপনার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট গ্রন্থপঞ্জী দেখিয়া মনে পড়িল যে ঐ সাময়িক পত্রটি ছিল Indo-American Society কর্তৃক প্রকাশিত 'The Calcuttan'। অমি প্রথমে উক্ত Society-র Foundation Member ছিলাম, তাই পত্রিকাটি পাইতাম।

'মুখবন্ধ'টিতে আপনি আমার নামোল্লেখ করিয়া আমা-কর্তৃক আপনাকে সহায়তা করিবার যে সব কথা নিজচিত্তের ঔদার্য্যবশতঃ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমি বিব্রত বোধ করিয়াছি। আমি তো আপনাকে উল্লেখযোগ্য কোন সহায়তাই করিতে পারি নাই।

আশা করি কুশলে আছেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত ডঃ মদনমোহন কুমার
সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

জয়মঙ্গল

টেলিফোন: ৪৬-২৫০৫ ১১৭/১, সাদার্ন এভিনিউ কলিকাতা-২৯

১২।৭।৭৬

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ৭ই জুলাই তারিখের চিঠিখানা পাইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে 'রামদুলাল দে' বইটির পাঠ সমাপ্ত করিয়া আপনাকে একটি চিঠি লিখিয়াছি। সেটি সাহিত্য পরিষদের ঠিকানায় লেখাতে হয়ত আপনার হস্তগত হইতে বিলম্ব হইবে। আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে এই চিঠিটা আপনার বাড়ীর ঠিকানায় লিখিলাম।

ওয়াশিংটনের তৈলচিত্রটি সম্পর্কে পূর্ব্বপত্রে যাহা লিখিয়াছি, তাহার পরিপূরক হিসাবে লিখি যে চিত্রটিতে ওয়াশিংটনের মুখমণ্ডল স্টুয়ার্টেরই অঙ্কিত, কিন্তু অবশিষ্ট অংশ তাঁহার কোন শিষ্য বা সহকারীর কৃত, আমেরিকার শিল্পসমালোচকদের মধ্যে কতিপয়ের ঐ অনুমান সত্য হইতে পারে। প্রধান অংশ নিজে অঙ্কিত করিয়া অবশিষ্টাংশ সহকারীদের দিয়া সমাপ্ত করাইবার পদ্ধতি প্রাচীনকালের মহৎ শিল্পীদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। আমার কাছে পাশ্চাত্ত্যের প্রধান চিত্র-শিল্পীদের প্রায় সকলেরই অঙ্কিত চিত্রের বিখ্যাত Phaidon কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এলব্যাম আছে। সেগুলির চিত্র-পরিচিতিতে ঐরূপ যুগ্মকর্ম্মের অনেক উল্লেখ আছে।

আগেকার দিনের উচ্চপদস্থ ইংরেজ ও ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। তাঁহারা এই দেশকে যেমন করিয়া চিনিয়াছিলেন এবং এ দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের যেমন করিয়া যুক্ত করিয়াছিলেন, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ও বর্তমান রাজকর্মচারীদের ক্ষেত্রে সেরূপ কিছু ভাবিতেই পারা যায় না। আমাদের District Gazetteer গুলি দেখুন, Imperial Gazetteer দেখুন, লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত বইগুলি দেখুন, আমাদের স্থাপত্য সম্বন্ধে এখনও প্রামাণ্য গ্রন্থ ফার্গুসনের বই, এ দেশের অধিবাসীদের জাতিবিভাগ সম্বন্ধে প্রাথমিক গ্রন্থ এখনও রিজলীর বই, অশোকের লিপি উদ্ধার করিয়াছিলেন একজন ইংরেজ, বাংলাভাষার বনিয়াদ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন গ্রীয়ার্সন ও বীমস্, এ দেশের পুরাকীর্ত্তিগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন কার্জ্জন, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

আমি গতকাল হইতে আবার জ্বরে পড়িয়াছি। নিরন্তর রোগযন্ত্রণাক্লিষ্ট এই দেহটা এখন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

আপনি শীঘ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠুন এবং আপনার কর্ম্মকুশলতা দ্বারা সাহিত্য পরিষদকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতে থাকুন, সর্ব্বান্তঃকরণে এই কামনা করি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

অধ্যাপক ডঃ মদনমোহন কুমার

সাহিত্য পরিষদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাদেশের স্থানে স্থানে সাহিত্যপরিষদের শাখা স্থাপন ও বৎসরে বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিষদের বাৎসরিক-মিলনোৎসব সাধনের প্রস্তাব অন্তত দুইবার আমার মুখ দিয়া প্রচার হইয়াছে। তাহাতে কি উপকারের আশা করা যায় এবং তাহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাও সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছি। অতএব তৃতীয়বারে আমাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত ছিল। একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ করিতে গেলে ফলন ভাল হয় না, নিঃসন্দেহেই আমার সুহৃদগণ সেকথা জানেন—কিন্তু তাঁহারা যে ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও আমাকে সভাস্থলে পুনশ্চ আকর্ষণ করিলেন, এর কারণ ত আর কিছু বুঝি না,—এ কেবল আমার প্রতি পক্ষপাত। এই অকারণ পক্ষপাত ব্যাপারটা অপব্যয় অন্যের সম্বন্ধে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সেটা তেমন অত্যুগ্র অন্যায় বলিয়া ঠেকে না—মনুষ্য-স্বভাবের এই আশ্চর্য্য ধর্ম্মবশত আমি বন্ধুদের আহ্বান অমান্য করিতে পারিলাম না—ইহাতে যদি আমার অপরাধ হয় ও আমাকে অপবাদ সহ্য করিতে হয়, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে পালপার্ব্বণ অনেক রকমের ছিল—তাহাতে আমাদের একঘেয়ে একটানা জীবনের মাঝে মাঝে নাড়া দিয়া ঢেউ তুলিয়া দিত। আজকাল সময়াভাবে, অন্নাভাবে ও শ্রদ্ধার অভাবে সে সকল পার্ব্বণ কমিয়া আসিয়াছে। এখন সভা-সমিতি-সম্মিলন সেই সকল পার্ব্বণের জায়গা দখল করিতেছে। এই জন্য সহরে-মফস্বলে কত রকম উপলক্ষ্যে কত প্রকার নাম ধরিয়া কত সভাস্থাপন হইতেছে, সেই সকল সভায় দেশের বক্তাদের বক্তৃতার পালা জমাইবার জন্য কত চেষ্টা ও কত আয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন।

অনেকে এই সকল চেষ্টাকে নিন্দা করেন ও এই সকল আয়োজনকে হুজুগ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। বাংলাভাষায় এই 'হুজুগ' শব্দটা কোথা হইতে আসিল, তাহা আমাদের পরিষদের শব্দতাত্ত্বিক মহাশয়গণ স্থির করিবেন—কিন্তু এটা যে আমাদের সমাজের শনিগ্রহের রচনা, আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। নিজের জড়ত্বকে অন্য লোকের উৎসাহের চেয়ে বড় পদবী দিবার জন্যই প্রায় অচল লোকেরা এই শব্দটা ব্যবহার করিয়া দেশের সমস্ত উদ্যমের মূলে হুল ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

দেশের মধ্যে কিছুকাল হইতেই এই যে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে, এটা যদি হুজুগ হয় ত হোক্। আমাদিগকে ভুল করিতে দাও, গোল করিতে দাও, বাজে-কাজ করিতে দাও, পাঁচজন লোককে ডাকিতে ও পাঁচ জায়গায় ঘুরিতে দাও। এই নড়াচড়া চলুক। এই নড়াচড়ার দ্বারাই, যেটা যেভাবে গড়িবার সেটা ক্রমে গড়িয়া উঠে, যেটা বাহুল্য সেটা আপনি বাদ পড়ে, যেটা বিকৃতি সেটার

সংশোধন হইতে থাকে। বিবেচকভাবে চুপচাপ করিয়া থাকিলে তাহার কিছুই হয় না। আমাদের মনটা যে স্থির হইয়া নাই, দেশের নানা স্থানেই যে ছোট বড় ঘূর্ণাবেগ আজকাল কেবলি প্রকাশ পাইতেছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে, একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে জ্যোতির্বাষ্পই যে কেবল আকার ধারণ করে, তাহা নহে—মানুষের মনগুলি যখন গতির বেগ পায়, তখন তাহারা জমাট বাঁধিয়া একটা-কিছু গঠন না করিয়া থাকিতে পারে না। অন্তত, আমরা যদি কিছু গড়িয়া তুলিতে চাই, তবে এই প্রকার বেগবান্ অবস্থাই তাহার পক্ষে অনুকূল। কুমোরের চাকা যখন ঘুরিতে থাকে, তখনি কুমোর যাহা পারে গড়িয়া লয়, যখন তাহা স্থির থাকে, তখন তাহার কাছে প্রত্যাশা করিবার কিছুই থাকে না।

আজ দেশের মধ্যে চারিদিকে যে একটা বেগের সঞ্চার দেখা যাইতেছে, তাহাতেই হঠাৎ দেশের কাছে আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাই বাড়িয়া গেছে। আমাদের যাহার মনে যে উদ্দেশ্য আছে, এই বেগের সুযোগে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবার জন্য আমরা সকলেই চকিত হইয়া উঠিয়াছি। আজ আমরা দশজনে যে-কোনো উপলক্ষ্যে একত্র হইলেই তাহার মধ্য হইতে কিছু একটা মথিয়া উঠিবে, এমন ভরসা হয়। এই রকম সময়ে যাহা অনপেক্ষিত, তাহাও দেখা দেয়, যাহাকে আশা করিবার কোনো কারণ ছিল না, তাহাও হঠাৎ সম্ভব হইয়া উঠে। আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সামান্য হইলেও সমস্ত সমাজের বেগে ক্ষণে ক্ষণে অসাধ্যসাধন হইতে থাকে।

আজ আমাদের সাহিত্যপরিষদেরও আশা বাড়িয়া গেছে। এই যে এখানে নানা জেলা হইতে আমরা বাঙালী একত্র হইয়াছি, এখানে শুধু একটা মিলনের আনন্দেই এই সম্মিলনকে শেষ করিয়া দিয়া যাইব, এমন আমরা মনে করি না—হয় ত এই বারেই, ফল যেমন যথাসময়ে ডাল ছাড়িয়া ঠিকমত জমিতে পড়ে ও গাছ হইবার পথে যায়, সাহিত্য পরিষদ্‌ও সেইরূপ নিজেকে বৃহৎ বাংলাদেশের মধ্যে রোপিত করিবার অবসর পাইবে। এবার হয়ত সে বৃহত্তর জন্মলাভ করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। আপনাদের আহ্বান শুধু সমাদরের আহ্বান নহে, তাহা সফলতার আহ্বান। আমরা ত এই মতই আশা করিয়াছি।

যদি আশা বৃথাই হয়, তবু মিলনটা ত কেহ কাড়িয়া লইবে না ;—বুদ্ধিমান্ কবি ত বলিয়াছেন যে, মহাবৃক্ষের সেবা করিলে ফল যদি বা না পাওয়া যায়, ছায়াটা পাওয়া যাইবেই। কিন্তু ঐটুকু নেহাৎপক্ষের আশা লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিব না—আমরা এই কথাই বলিব, আচ্ছা, আজ যদি বা শুধু ছায়াই জুটিল, নিশ্চয়ই কাল ছায়াও পাইব, ফলও ধরিবে ; কোনোটা বাদ দিব না। সফলতা সম্বন্ধে আধাআধি রফানিষ্পত্তি করা কোনো মতেই চলিবে না। বহরমপুরের ডাকে আজ আমরা সাহিত্যপরিষদ্ অত্যন্ত লোভ করিয়াই এখানে আসিয়া জুটিয়াছি—শুধু আহার দিয়া বিদায় করিলে নিন্দার বিষয় হইবে—দক্ষিণা চাই। সেই দক্ষিণার প্রস্তাবটাই আজ আপনাদের কাছে পাড়িব।

আমার দেশকে আমি যত ভালবাসি, তার দশগুণ বেশি ভালবাসা ইংরেজের কর্তব্য, এ কথা আমরা মুখে বলি না, আমাদের ব্যবহারে তাহাই প্রকাশ পায়। এই জন্য ভারতবর্ষের হিত সাধনে বিদেশীর যত কিছু ত্রুটি, তাহা ঘোষণা করিয়া আমাদের শ্রান্তি হয় না, আর দেশী লোকের যে

ঔদাসীন্য, সে সম্বন্ধে আমরা একেবারেই চুপ। কিন্তু এ কথাটার আলোচনা বিস্তর হইয়া গেছে, এমন কি, আমার আশঙ্কা হয়, কথাটা আপনার অধিকারের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়াছে বা। কথা-জিনিষটার দোষই ঐ—সেটা হাওয়ার জিনিষ কিনা, তাই উক্তি দেখিতে দেখিতে অত্যুক্তি হইয়া উঠে। এখন যেন আমরা একটু বেশি তারস্বরে বলিতেছি, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা কিছুই লইব না। কেন লইব না? দেশের হিতের জন্য যেখানে যাহা পারি, সমস্ত আদায় করিব। কেবল এইটুকু পণ করিব, সেই লওয়ায় পরিবর্ত্তে নিজেকে বিকাইয়া দিব না। যাহা বিশেষভাবে ইংরেজ গবর্মেণ্টের কাছ হইতেই পাইবার, তাহা ষোলো-আনাই সেইখান হইতেই আদায় করিবার পূরা চেষ্টাই করিতে হইবে—না করিলে সে ত নিতান্তই ঠকা। নির্ব্বুদ্ধিতাই বীরত্ব নহে।

কিন্তু এই আদায় করিবার কোনো জোর থাকে না,—আমরা যদি নিজের দায় নিজে স্বীকার না করি। দেশের যে সকল কাজ আমরা নিজে করিতে পারি, তাহা নিজেরা সাধ্যমত করিলে তবেই আদায়-করাটা যথার্থ আদায় করা হয়, ভিক্ষা করা হয় না। এ নহিলে অন্যের কাছে দাবি করার আব্রুই থাকে না। কিছুকাল হইতে আমাদের সেই আব্রু একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছিল—সেই জন্যই লজ্জাবোধটাকে এত জোর করিয়া জাগাইবার একটা একান্ত চেষ্টা চলিতেছে। সকলেই জানেন, জামেকায় ভূমিকম্পের উৎপাতের পর সেখানকার কিংষ্টন্-সহরে ভারি একটা সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সঙ্কটের সময় আমেরিকার রণতরীর কাপ্তেন্ ডেভিস্ তাঁহার মানোয়ারি গোরার দল লইয়া উপকার করিবার উৎসাহবশত কিছু অতিশয় পরিমাণে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—ইহা সেখানকার ঘোরতর দুর্যোগেও জামেকাদ্বীপের ইংরেজ অধ্যক্ষ সহ্য করিতে পারেন নাই। ইহার ভাবখানা এই যে, অত্যন্ত দুঃসময়েও পরের কাছে সাহায্য লইবার কালে নিজের ক্ষমতার অপমান করা চলে না—তা যদি করি, তবে যাহা পাই, তাহার চেয়ে দিই অনেক বেশি। পরের কাছে আনুকূল্য লওয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে করিবার নহে।

এইরূপ, দান পাইয়া যদি ক্ষমতা বিক্রয় করি, আমার দেশের কাজ আমি করিবই এবং আমিই করিতে পারি এই পুরুষোচিত অভিমান যদি অনর্গল আবেদনের অজস্র অশ্রু-জলধারায় বিসর্জন দিই, তবে তেমন করিয়া পাওয়ার ধিক্কার হইতে ঈশ্বর যেন আমাদিগকে নৈরাশ্য দ্বারাই রক্ষা করেন।

বস্তুত এমন করিয়া কখনই আমরা কোনো আসল জিনিষ পাইতেই পারি না। গ্রামে কোন উৎপাত ঘটিলে আমরা রাজসরকারে প্রার্থনা করিয়া দুজন পুলিসের লোক বেশি পাইতে পারি, কিন্তু নিজেরাই যদি সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারি, তবে রক্ষাও পাই, রক্ষার শক্তিও হারাইতে হয় না। বিচারের সুযোগের জন্য দরখাস্ত করিয়া আদালত বাড়াইয়া লইতে পারি, কিন্তু নিজেরা যদি নিজের সালিশিসভায় মকদ্দমা মিটাইবার বন্দোবস্ত করি, তবে অসুবিধার জড় মরিয়া যায়। মন্ত্রণা সভায় দুজন দেশী লোক বেশি করিয়া লইলেই কি আমরা রেপ্রেজেণ্টেটিভ্ গবর্মেণ্ট পাইলাম বলিয়া হরির লুঠ দিব? বস্তুত আমাদের নিজের পাড়ার, নিজের গ্রামের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অশন-বসন-সম্বন্ধীয় সমস্ত শাসন ব্যবস্থা আমরা যদি নিজেরা গড়িয়া তুলিতে পারি, তবেই

যথার্থ খাঁটি জিনিষটি আমরা পাই। অথচ এই সমস্ত অধিকার গ্রহণ করা পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না। এ আমাদের নিজের ইচ্ছা, চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকারের অপেক্ষা করে। আমাদের *দেশজোড়া এই সমস্ত কাজই আমাদের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সে পথও আমরা মাড়াই না,* পাছে সেই কর্ত্তব্যের সঙ্গে চোখে-চোখেও দেখা হয়। যাহাদের এম্‌নি দুরবস্থা, তাহারা পরের কাছ হইতে কোনো দুর্লভ জিনিষ চাহিয়া লইয়া সেটাকে যথার্থভাবে রক্ষা করিতে পারিবে, এমন দুরাশা কেন তাহাদের মনে স্থান পায়? যে কাজ আমাদের হাতের কাছেই আছে এবং যাহা আমরা ছাড়া আর কেহই ঠিকমত সাধন করিতে পারে না, তাহাকেই সত্যরূপে সম্পন্ন করিতে থাকিলে তবেই আমরা সেই শক্তি পাইব, যে শক্তির দ্বারা পরের কাছ হইতে নিঃসঙ্কোচে আমাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া তাহাকে কাজে খাটাইতে পারি। এই জন্যই বলিতেছি, যাহা নিতান্তই আমাদের নিজের কাজ, তাহার যেটাতেই হাত দিব, সেটার দ্বারাই আমাদের মানুষ হইয়া উঠিবার সহায়তা হইবে এবং মানুষ হইয়া উঠিলে তবেই আমাদের দ্বারা সমস্তই সম্ভব হইতে পারিবে।

আমরা যখন প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব লইয়া স্বদেশাভিমান অনুভব করিতে সুরু করিয়াছিলাম, তখন সেই প্রাচীন বিবরণের জোগান পাইবার জন্য আমরা বিদেশের দিকেই অঞ্জলি পাতিয়াছিলাম—এমন কোনো পণ্ডিত পাইলাম না, যিনি স্বদেশের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য জর্মান্ পণ্ডিতের মত নিজের সমস্ত চেষ্টা ও সময় এই কাজে উৎসর্গ করিতে পারিলেন। আজ আমরা স্বদেশপ্রেম লইয়া কম কথা বলিতেছি না—কিন্তু আজও এই স্বদেশের সামান্য একটি বৃত্তান্তও যদি জানিতে ইচ্ছা করি, তবে ইংরেজের রচিত পুঁথি ছাড়া আমাদের গতি নাই। এমন অবস্থায় পরের দরবারে দাবী লইয়া দাঁড়াই কোন্ মুখে, সম্মানই বা চাই কোন্ লজ্জায়, আর সফলতাই বা প্রত্যাশা করি কিরূপে? যাহার ব্যবসা চলিতেছে, বাজারে তাহারই ক্রেডিট্ থাকে, সুতরাং অন্য ধনীর কাছ হইতে সে যে সাহায্য পায়, তাহাতে তাহার লজ্জার কারণ ঘটে না—কিন্তু যাহার শিকি পয়সার কারবার নাই, সে যখন ধনীর দ্বারে দাঁড়ায়, তখন কি সে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়ায় না—এবং তখন যদি সে আঁজলা ভরিয়া কড়ি না পায়, তবে তাহা লইয়া বকাবকি করা কি তাহার পক্ষে আরো অবমানকর নহে?

সেইজন্য আমি এই কথা বারবার বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, নিজের দেশের কাজ যখন আমরা নিজেরা করিতে থাকিব, তখনই অন্যের কাছ হইতেও যথোচিত কাজ আদায় করিবার বল পাইব। নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া কেবল মাত্র গলার জোরে যাহা পাই, সেই পাওয়াতে আমাদের গলার জোর ছাড়া আর সকল জোরই কমিয়া যায়।

আমার অদৃষ্ট ক্রমে এই কথাটা আমাকে অনেকদিন হইতে অনেকবার বলিতে হইয়াছে—এবং বলিতে গিয়া সকল সময় সমাদরও লাভ করি নাই;—এখন না বলিলেও চলে, কারণ এখন অনেকেই এই কথাই আমার চেয়ে অনেক জোরেই বলিতেছেন। কিন্তু কথা জিনিষটার এই একটা মস্ত দোষ যে, তাহা সত্য হইলেও অতি শীঘ্রই পুরাতন হইয়া যায়—এবং বরঞ্চ সত্যের হানি লোকে সহ্য করে, তবু পুরাতনত্বের অপরাধ কেহ ক্ষমা করিতে পারে না। কাজ জিনিষটার মস্ত সুবিধা এই যে, যতদিনই তাহা চলিতে থাকে, ততদিনই তাহার ধার বাড়িয়া ওঠে।

এই জন্যই বাংলাদেশের ভাষাতত্ত্ব, পুরাবৃত্ত, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি দেশের সমস্ত ছোট বড় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার জন্য সাহিত্য পরিষদ্ যখন দেশের সভার একটি ধারে আসিয়া আসন লইল, আমরা আনন্দে ও গৌরবে তাহার অভিষেক কার্য্য করিয়াছিলাম।

যদি বলেন, সাহিত্য পরিষদ্ এতদিনে কি এমন কাজ করিয়াছে—তবে সে কথাটা ধীরে বলিবেন এবং সঙ্কোচের সহিত বলিবেন। আমাদের দেশের কাজের বাধা যে কোথায়, তাহা আমরা তখনই বুঝিতে পারি, যখনই আমরা নিজেরা কাজ হাতে লই—সে বাধা আমরা নিজেরা—আমরা প্রত্যেকে। যে কাজকে আমরা **আমাদের** কাজ বলিয়া বরণ করি, তাহাকে আমরা কেহই **আমার** কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে এখনো শিখি নাই। সেইজন্য আমরা সকলেই পরামর্শ দিতে অগ্রসর হই, কেহই সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইনা; ত্রুটি দেখিলে কর্মকর্ত্তার নিন্দা করি, অকর্ম্মকর্ত্তার অপবাদ নিজের উপর আরোপ করি না,—ব্যর্থতা ঘটিলে এমন ভাবে আস্ফালন করি, যেন কাজ নিষ্ফল হইবে পূর্ব্বেই জানিতাম এবং সেই জন্যই অত্যন্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক নির্ব্বোধের উদ্‌যোগে যোগ দিই নাই। আমাদের দেশে জড়তা লজ্জিত নহে, অহঙ্কৃত—আমাদের দেশে নিশ্চেষ্টতা নিজেকে গোপন করে না—উদ্‌যোগকে ধিক্কার দিয়া এবং প্রত্যেক কাজের খুঁৎ ধরিয়া সে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চায়। এইজন্য আমাদের দেশে এ দৃশ্য সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, দেশের কাজ একটিমাত্র হতভাগ্য টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, হাওয়া এবং স্রোত দু-ই উল্টা; এবং দেশের লোক তীরে বসিয়া দিব্য হাওয়া খাইতে খাইতে কেহ বা প্রশংসা করিতেছে, কেহ বা লোকটার অক্ষমতা ও বিপত্তি দেখিয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতেছে।

এমন অবস্থায় দেশের অতি ক্ষুদ্র কার্জটিকেও গড়িয়া তোলা কত কঠিন, সে কথা আমরা যেন প্রত্যেকে বিবেচনা করিয়া দেখি। একটা ছোট ইস্কুল, একটা সামান্য লাইব্রেরী, একটা আমোদ করিবার দল বা একটা অতি ছোট-রকমেরও কাজ করিবার ব্যবস্থা আমরা জাগাইয়া রাখিতে পারি না। সমুদ্রে জল থই থই করিতেছে, তাহার এক ফোঁটা মুখে দিবার জো নাই—আমাদের দেশেও ষষ্ঠীর প্রসাদে মানুষের অভাব নাই, কিন্তু কর্ত্তব্য যখন তাহার পতাকা লইয়া আসিয়া শঙ্খধ্বনি করে, তখন চারিদিকে চাহিয়া একটি মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই যে আমাদের দেশে কোনোমতেই কিছুই আঁট বাঁধে না, সঙ্কল্পের চারিদিকে দল জমিয়া উঠে না—কোনো আকস্মিক কারণে দল বাঁধিলেও সকালের দল বিকালবেলায় আল্‌গা হইয়া আসে, এইটি ছাড়া আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় কোনো বিপদ্ নাই। আমাদের এই একটিমাত্র শত্রু। নিজের মধ্যে এই প্রকাণ্ড শূন্যতা আছে বলিয়াই আমরা অন্যকে গালি দিই। আমরা কেবলি কাঁদিয়া বলিতেছি আমাদিগকে দিতেছে না, বিধাতা আমাদের কানে ধরিয়া বলিতেছেন তোমরা লইতেছ না। আমরা একত্র হইব না, চেষ্টা করিব না, কষ্ট সহিব না, কেবলি চাহিব এবং পাইব, কোন জাতির এতবড় সর্ব্বনেশে প্রশ্রয়ের দৃষ্টান্ত জগৎ সংসারের ইতিহাসে ত আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তবু কেবল আমাদেরই জন্য বিশ্ববিধাতার একটি বিশেষ-বিধির অপেক্ষায় আকাশে চাহিয়া বসিয়া আছি—সে বিধি আমাদের দেশে কবে চলিবে জানি না, কিন্তু বিনাশ ত সবুর করিবে না। সবুর করেও নাই; অনশন, মহামারী, অপমান, গৃহবিচ্ছেদ

চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে। রুদ্রদেব বজ্রহাতে আমাদের অনেক কালের পাপের হিসাব লইতে আসিয়াছেন ;—খবরের কাগজে মিথ্যা লিখিতে পারি, সভাস্থলে মিথ্যা বলিতে পারি, রাজার চোখে ধূলা দিতে পারি, এমন কি, নিজেকে ফাঁকি দেওয়াও সহজ, কিন্তু তাঁহাকে ত ভুল বুঝাইতে পারিলাম না। যাহার উপরেই দোষারোপ করি না কেন, রাজাই হোক্ বা আর যেই হোক্, মরিতেছি ত আমরাই। মাথা ত আমাদেরই হেঁট হইতেছে, এবং পেটের ভাত ত আমাদেরই গেল ! পরের কর্ত্তব্যের ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া আমাদের শ্মশানের চিতা ত নিবিল না !

আরামের দিনে নানা প্রকার ফাঁকি চলে. কিন্তু মৃত্যুসহচর বিধাতা যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন আজ আর মিথ্যা দিয়া হিসাবপূরণ হইবে না। এখন আমাদের কঠোর সত্যের দিন আসিয়াছে। আজ আমরা যে-কোনো কাজকেই গ্রহণ করি না কেন, সকলে মিলিয়া সে কাজকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের যে কোনো যথার্থ মঙ্গল-অনুষ্ঠানকে আমরা উপবাসী করিয়া ফিরাইব, সে-ই আমাদের পৃথিবীর মধ্যে মাথা তুলিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার কিছু-না-কিছু কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। ছোটো হউক বড় হউক, নিজের হাতে দেশের যে-কোনো কাজকে সত্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, সেই কাজই রুদ্রের দরবারে আমাদের উকিল হইয়া দাঁড়াইবে, সে-ই আমাদের রক্ষার উপায় হইবে।

কেবল সংকল্পের তালিকা বাড়াইয়া চলিলে কোনো লাভ নাই, কিন্তু যেমন করিয়া হউক, দেশের যথার্থ স্বকীয় একটি একটি কাজকে সফল করিয়া তুলিতেই হইবে। সে কেবল সেই একটি বিশেষ কার্য্যের ফললাভ করিবার জন্য নহে ; —সকল কার্য্যেই ফললাভের অধিকার পাইবার জন্য। কারণ, সফলতাই সফলতার ভিত্তি। একটাতে কৃতকার্য্য হইলেই অন্যটাতে কৃতকার্য্য হইবার দাবী পাকা হইতে থাকে—এই কথা মনে রাখিয়া দেশের কাজগুলিকে সফল করিবার দায় আমাদের প্রত্যেককে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার টাকা আছে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা ভোগ করিবেন না, যাঁহার বুদ্ধি আছে তিনি কেবল অন্যের প্রয়াসকে বিচার করিয়া দিনযাপন করিবেন না ; দেশের কাজ-গুলিকে সফল করিবার জন্য যেখানেই আমাদের সকলের চেষ্টা মিলিত হইতে থাকিবে, সেখানেই আমাদের স্বদেশ সত্য হইয়া উঠিবে।

দেশ জিনিষটা ত কাহাকেও নিজের শক্তিতে উপার্জ্জন করিয়া আনিতে হয় নাই। আমরা যে পৃথিবীতে এত জায়গা থাকিতেই এই বাংলাদেশেই জন্মিতেছি ও মরিতেছি, সে ত আমাদের নিজগুণে নহে, এবং বাংলাদেশেরও বিশেষ পুণ্য-প্রভাবে, এমনও বলিতে পারি না। দেশ পশুপক্ষি-কীটপতঙ্গেরও আছে—কিন্তু স্বদেশকে নিজে সৃষ্টি করিতে হয়। সেইজন্যই স্বদেশে কেহ হাত দিতে আসিলে স্বদেশীমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, কেন না, সেটা যে বহুকাল হইতে তাহাদের নিজের গড়া—সেখানে যে তাহাদের বহুযুগের আহরিত মধু সমস্ত সঞ্চিত হইয়া আছে। যে সকল দেশের লোক তাহাদের নিজের শরীর-মন-বাক্যের সমস্ত চেষ্টার দ্বারা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্ম্মে স্বদেশকে আপনি গড়িয়া তুলিতেছে, দেশের অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য-জ্ঞানের সমস্ত অভাব আপনি পূরণ করিয়া তুলিতেছে, দেশকে তাহারাই স্বদেশ বলিতে পারে, এবং স্বদেশ জিনিষটা যে কি, তাহাদিগকে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইতেও হয় না ;—মৌমাছিকে আপন চাকের মর্য্যাদা বুঝাইবার জন্য বড় বড় পুঁথির দোহাই

পাড়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমরা দেশের কোনো সত্যকর্ম্মে নিজেরা হাত না লাগাইয়াও আজ ২৫।৩০ বৎসর ইংরেজি ও বাংলায়, গদ্যে ও পদ্যে স্বদেশের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই স্বদেশের স্বটা যে কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া গোল্ড্‌ষ্টুকর, ম্যাক্সমূলর, মুয়রের প্রত্নতত্ত্ব খুঁজিয়া হয়রান্ হইতে হইয়াছে। শাণ্ডিল্য-মুনির আশ্রমের জায়গাটার যদি আজ হঠাৎ আবিষ্কার হয়, তবে আমি শাণ্ডিল্যগোত্রের দোহাই দিয়া সেটা দখল করিতে গেলে আইনের পেয়াদা ত মানিবে না। পাঁচ সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বের উপর স্বদেশের স্বকীয়ত্বের বরাৎ দিয়া গৌরব করিতে বসিলে কেবল গলাভাঙাই সার হয়। স্বকীয়ত্বকে অবিচ্ছিন্ন নিজের চেষ্টায় রক্ষা করিতে হয়। আজ আমাদের পক্ষে স্বদেশ কোথায়? সমস্ত দেশের মধ্যে যেখানেই আমরা নিজের শক্তিতে দেশবাসীদের জন্য কিছু একটা গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি, কেবলমাত্র সেখানেই আমাদের স্বদেশ। এম্নি করিয়া যাহা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিব, তাহাতেই আমাদের স্বদেশের বিস্তার ঘটিতে থাকিবে—সেই স্বদেশের উপর আমাদের সমস্ত প্রাণের দাবী জন্মিতে থাকিবে—অন্যে যাহা দয়া করিয়া দিবে, তাহাতেও নহে এবং বহু হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে দলিল পাকা হইয়াছিল, তাহাতেও না।

অদ্যকার সভায় আমার নিবেদন এই, সাহিত্য-পরিষদের মধ্যে আপনারা সকলে মিলিয়া স্বদেশকে সত্য করিয়া তুলুন। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্য-পরিষদের মধ্যে নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে একত্রে জাগ্রত করিয়া আজ যাহা অস্ফুট আছে তাহা স্পষ্ট করুন, যাহা ক্ষুদ্র আছে তাহাকে মহৎ করুন। কোনখানে এই পরিষদের কি অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা লইয়া প্রশ্ন করিবেন না, ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়া প্রত্যেকে গৌরবলাভ করুন। দেবপ্রতিমা ঘরে আসিয়া পড়িলে গৃহস্থকে তাহার পূজা সারিতেই হয়, আজ বাঙ্গালীর ঘরে তিনটি দেবপ্রতিমা আসিয়াছে—সাহিত্য-পরিষদ্, শিক্ষা-পরিষদ্ ও শিল্প-বিদ্যালয়; ইঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিলে দেশে যে অমঙ্গল ঘটিবে, তাহার ভার আমরা বহন করিতে পারিব না।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন উঠিবে, দেশের কাজ হিসাবে সাহিত্য-পরিষদের কাজটা এম্নি কি একটা মস্ত ব্যাপার! এইরূপ প্রশ্ন আমাদের দেশের একটা বিষম বিপদ্। য়ুরোপ-আমেরিকা তাহার প্রকাণ্ড কর্ম্মশালা লইয়া আমাদের চোখের সাম্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই দেখিয়া আমাদের অবস্থা বড় হইবার পূর্ব্বেই আমাদের নজর বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে কাজ দেখিতে ছোট, তাহাতে উৎসাহই হয় না; —এই জন্য বীজরোপণ করা হইল না,—একেবারে আস্ত বনস্পতি তুলিয়া আনিয়া পুঁতিয়া অন্য দেশের অরণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ব্যস্ত লইয়া পড়িয়াছি। এ ত প্রেমের লক্ষণ নহে, এ অহঙ্কারের লক্ষণ। প্রেমের অসীম ধৈর্য্য, কিন্তু অহঙ্কার অত্যন্ত ব্যস্ত। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে ইংরেজ নানা মতে আম্যাদিগকে অবজ্ঞা দেখাইয়া আমাদের অহঙ্কারকে অত্যন্ত রাঙা করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের এই কথাই কেবল বলিবার প্রবৃত্তি হইতেছে, আমরা কিছুতেই কম নই। এই জন্য আমরা যাহা কিছু করি, সেটাকে খুবই বড় করিয়া দেখাইতে না পারিলে আমাদের বুক ফাটিয়া যায়। একটা কাজ ফাঁদিবার প্রথমেই ত একটা খুব মস্ত নামকরণ হয়—নামের সঙ্গে "ন্যাশনাল্" শব্দটা কিংবা ঐ রকমের একটা বিদেশী বিড়ম্বনা জুড়িয়া দেওয়া যায়। এই নাম-করণ-অনুষ্ঠানেই গোড়ায় ভারি একটি পরিতৃপ্তি বোধ হয়। তার পরে বড় নামটি দিলেই বড় আয়তন না দিলে চলে না,—নতুবা বড় নাম

ক্ষুদ্র আকৃতিকে কেবলি বিদ্রূপ করিতে থাকে। তখন নিজের সাধ্যকে লঙ্ঘন করিতে চাই। তকমা-ওয়ালা লাগামের খাতিরে ওয়েলারের জুড়ি না হইলে মুখরক্ষা হয় না—এদিকে 'অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণঃ'। যেমন করিয়া হোক্, একটা প্রকাণ্ড ঠাট গড়িয়া তুলিতে হয়; ছোটকে ক্রমে ক্রমে বড় করিয়া তুলিবার যে স্বাভাবিক প্রণালী, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া যত বড় প্রকাণ্ড স্পর্দ্ধা খাড়া করিয়া তুলি, তত-বড়ই প্রকাণ্ড ব্যর্থতার আয়োজন করা যায়। যদি বলি, গোড়ার দিকে সুর আর একটু নামাইয়া ধর না কেন? তবে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাতে লোকের মন পাইব না। হায় রে লোকের মন! তোমাকে পাইতেই হইবে বলিয়া পণ করিয়া বসাতেই তোমাকে হারাই। তোমাকে চাইনা বলিবার জোর যাহার আছে, সে-ই তোমাকে জয় করে। এইজন্যই যে ছোট, সে-ই বড় হইতে থাকে; যে গোপনে সুরু করিতে পারে, সেই প্রকাশ্যে সফল হইয়া উঠে।

সকল দেশেরই মহত্ত্বের ইতিহাসে যেটা আমাদের চক্ষুর গোচর, তাহা দাঁড়াইয়া আছে কিসের উপরে? যেটা আমাদের চক্ষুর গোচর নহে, তাহারই উপর। আমরা যখন নকল করিতে বসি, তখন সেই দৃষ্টিগোচরটাই নকল করিতে ইচ্ছা যায়—যাহা চোখের আড়ালে আছে, তাহা ত আমাদের মনকে টানে না। এ কথা ভুলিয়া যাই, যাহাদের নামধাম কেহই জানে না, দেশের সেই শত সহস্র অখ্যাত লোকেরাই নিজের জীবনের অজ্ঞাত কাজগুলি দিয়া যে স্তর বাঁধিয়া দিতেছে, তাহারই উপরে নামজাদা লোকেরা বড় বড় ইমারৎ বানাইয়া তুলিতেছে। এখন যে আমাদিগকে ভিত্ কাটিয়া গোড়াপত্তন করিতে হইবে—সে ব্যাপারটা ত আকাশের উপরকার নহে, তাহা মাটির নীচেকার,—তাহার সঙ্গে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলের তুলনা করিবার কিছুই নাই। গোড়ায় সেই গভীরতা, তার পরে উচ্চতা। এই গভীরতার রাজ্যে স্পর্দ্ধা নাই, ঘোষণা নাই—সেখানে কেবল নম্রতা অথচ দৃঢ়তা, আত্মগোপন এবং আত্মত্যাগ। এই সমস্ত ভিতের কাজে, ভিতরের কাজে, মাটির সংস্রবের কাজে আমাদের মন উঠিতেছে না—আমরা একদম চূড়ার উপর জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ধ্বজা উড়াইয়া দিতে চাই। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাও তেমন করিয়া বিশ্বনির্ম্মাণ করেন নাই। তিনিও যুগে যুগে অপরিস্ফুটকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন।

তাই বলিতেছি, সকল দেশেই গোড়ার কাজটা ঠিকমত চলিতেছে বলিয়াই ডগার কাজটা রক্ষা পাইতেছে; নেপথ্যের ব্যবস্থা পাকা বলিয়াই রঙ্গমঞ্চের কাজ দিব্য চলিয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষা, অন্ন-উপার্জ্জন, জ্ঞান-শিক্ষার কাজে দেশ ব্যাপিয়া হাজার হাজার লোক মাটির নীচেকার শিকড়ের মত প্রাণপণে লাগিয়া আছে বলিয়াই সে সকল দেশে সভ্যতার এত শাখাপ্রশাখা, এত পল্লব, এত ফুলদলের প্রাচুর্য্য। এই গোড়াকার অত্যন্ত সাধারণ কাজগুলির মধ্যে যে-কোনো-একটা কাজ করিয়া তোলাই যে আমাদের পক্ষে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোককে শিখাইতে হইবে, তাহার উদ্‌যোগ করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়; খাওয়াইতে হইবে, তাহার সঙ্গতি নাই; রোগ দূর করিতে হইবে, সাহেব এবং বিধাতার উপর ভার দিয়া বসিয়া আছি। মাটসীনি, গারিবাল্ডি, হ্যাম্প্‌ডেন্, ক্রমোয়েল হইয়া উঠাই যে একমাত্র বড় কাজ, তাহা নহে; তাহার পূর্ব্বে গ্রামের মোড়ল, পাঠশালার গুরুমশায়, পাড়ার মুরুব্বি, চাষাভূষার সর্দ্দার হইতে না পারিলে বিদেশের ইতিবৃত্তকে ব্যঙ্গ করিবার চেষ্টা একান্তই প্রহসনে পরিণত হইবে। আগে দেশকে স্বদেশ

করিতে হইবে, তার পরে রাজ্যকে স্বরাজ্য করিবার কথা মুখে আনিতে পারিব। অতএব পরিষদের কাজ কি হিসাবে বড় কাজ, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না—এ সমস্ত গোড়াকার কাজ—ইহার ছোট বড় নাই।

দেশকে ভালবাসিবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্তব্য দেশকে জানা—এই কথাটা আমাদের দেশ ছাড়া আর কোনো দেশে উল্লেখমাত্র করাই বাহুল্য। পৃথিবীর অন্যত্র সকলেই আপনার দেশকে বিশেষ করিয়া তন্নতন্ন করিয়া জানিতেছে। না জানিলে দেশের কাজ করা যায় না। শুধু তাই নয়—এই জানিবার চর্চায় ভালবাসার চর্চা। দেশের ছোট বড় সমস্ত বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেই তবে সে আমার আপন ও আমার পক্ষে সত্য হইয়া উঠে। নহিলে দেশহিতসম্বন্ধে পুঁথিগত শিক্ষা লইয়া আমরা যে সকল বড় বড় কথা বার্ক-মেকলের ভাষায় আবৃত্তি করিতে থাকি, সেগুলো বড়ই বেসুরো শোনায়।

তাই দেশের ভাষা, পুরাবৃত্ত, সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক দিয়া দেশকে জানিবার জন্য সাহিত্য পরিষদ্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাংলাদেশের সকল জেলাই যদি তাঁহার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দেন, তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। সফলতা দুই দিক দিয়াই হইবে- এক, যোগের সফলতা, আর এক, সিদ্ধির সফলতা। আজ বরিশাল ও বহরমপুর যে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহাতে মনে মনে আশা হইতেছে, আমাদের বহুদিনের চেষ্টার সার্থকতা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

দীপশিখা জ্বালিবার দুইটা অবস্থা আছে। তাহার প্রথম অবস্থা চকমকি-ঠোকা। সাহিত্য-পরিষদ্ কাজ আরম্ভ করিয়া প্রথম কিছুদিন চকমকি ঠুকিতেছিল, তাহাতে বিচ্ছিন্নভাবে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। দেশে বুঝি তখনো পলিতা পাকানো হয় নাই অর্থাৎ দেশের হৃদয়গুলি একপ্রান্ত পর্য্যন্ত এক সূত্রে পাকাইয়া ওঠে নাই। তারপরে স্পষ্টই দেখিতেছি, আমাদের দেশে হঠাৎ একটা শুভদিন আসিয়াছে—যেমন করিয়াই হৌক্, আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে একটা যোগ হইয়াছে—তাহা হইবামাত্র দেশের যেখানে যে-কোন আশা ও যে-কোনো কর্ম্ম মরোমরো হইয়াছিল, তাহারা সকলেই যেন একসঙ্গে রস পাইয়া নবীন হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য পরিষদ্‌ও এই অমৃতের ভাগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এইবার তাহার বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যদি শুভ দৈব ক্রমে পলিতার মুখে ধরিয়া উঠে, তবে একটি অবিচ্ছিন্ন শিখারূপে দেশের অন্তঃপুরকে সে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারিবে।

অতএব বিশেষ করিয়া বহরমপুরের প্রতি এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সমস্ত জেলার কাছে আজ আমাদের নিবেদন এই যে, সাহিত্য পরিষদের চেষ্টাকে আপনারা অবিচ্ছিন্ন করুন—দেশের হৃদয়-পলিতাটির একটা প্রান্ত ধরিয়া উঠিতে দিন, তাহা হইলে একটি ক্ষুদ্র সভার প্রয়াস সমস্ত দেশের আধারে তাহার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অমর হইয়া উঠিবে। আমাদের অদ্যকার এই মিলনের আনন্দ স্থায়ী যোগের আনন্দে যদি পরিণত হয়, তবে যে চিরন্তন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে, সেখানে ভাগীরথীর তীর হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্য্যন্ত, সমুদ্রকূল হইতে হিমাচলের পাদদেশ পর্য্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত প্রদেশ আপন উদ্‌ঘাটিত প্রাণভাণ্ডারের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য বহন-পূর্ব্বক এক ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তুলিবে। আপনারা মনে করিবেন না, আমাদের এ সভা কেবল বিশেষ একটি কার্য্যসাধন করিবার সভামাত্র।

দেশের অদ্যকার পরম দুঃখদারিদ্র্যের দিনে যে-কোনো মঙ্গলকর্ম্মের প্রতিষ্ঠান আমরা রচনা করিয়া তুলিতে পারিব, তাহা শুদ্ধমাত্র কাজের আপিস্ হইবে না, তাহা তপস্যার আশ্রম হইয়া উঠিবে—সেখানে আমাদের প্রত্যেকের নিঃস্বার্থ সাধনার দ্বারা সমস্ত দেশের বহুকাল-সঞ্চিত অকৃতকর্ত্তব্যের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে থাকিবে। এই সমস্ত পাপের ভরা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ দেশের অতি ছোট কাজটিও আমাদের পক্ষে এত একান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। আজ হইতে কেবলি কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের এই সমস্ত কঠিন বাধা ক্ষয় করিবার জন্য আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। হাতে-হাতে ফল পাইব, এমন নহে—বারংবার ব্যর্থ হইতে হইবে, কিন্তু তবু অপরাধমোচন হইবে, বাধা জীর্ণ হইবে, দেশের ভবিতব্যতার রুদ্রমুখচ্ছবি প্রতিদিন প্রসন্ন হইয়া আসিবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শুভ উৎসব বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পূর্বে, স্বদেশী আন্দোলনের সময়, ৯ই ভাদ্র ১৩১২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা টাউন হলের একটি সভায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে বঙ্গলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান" করিয়া "পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখা স্থাপন" করিয়া "পর্য্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন" করিবার প্রস্তাব করিয়া বলেন "আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্ত্তব্য পালনের ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন।" বর্ষে বর্ষে জেলায় জেলায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠান করিয়া বঙ্গসাহিত্যসেবীদের মিলন সাধন এবং বাঙ্গলার ইতিহাস ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের মাতৃভাষায় আলোচনা ও অনুসন্ধানের দ্বারা জাতীয় ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করার প্রস্তাব সাহিত্য পরিষদ্ গ্রহণ করেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভূমি আইনের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইল—রাখীবন্ধন ও অরন্ধন পালন করিয়া, মিলন মন্দিরের (Federation Hall-এর) ভিত্তিস্থাপন করিয়া, 'জাতীয় ঘোষণাপত্র' পাঠ করিয়া বাঙ্গালী জাতীয় শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করিল। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের এক মাস পূর্ণ হওয়ার দিন ৩০শে কার্ত্তিক জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ গঠিত হইল। ১৩১২ বঙ্গাব্দের শেষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রঙ্গপুর-শাখার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলন অনুষ্ঠানের জন্য পরিষৎকে আহ্বান করিলেন; লাখুটিয়ার তরুণ জমিদার দেবকুমার রায়চৌধুরী বরিশালে সম্মিলন আহ্বান করিয়া পরিষৎকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ১লা ও ২রা বৈশাখ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির (Bengal Provincial Committee-র) অধিবেশন আহূত হইয়াছিল, ৩রা বৈশাখ ১৩১৩ বরিশালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম

অধিবেশন আয়োজিত হইল এবং রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করিবেন স্থির হইল। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর সার্ ব্যামফিল্ড্ ফুলারের আদেশে পূর্ববঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ হইয়াছিল—১লা ও ২রা বৈশাখ বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে পুলিসের নির্মম অত্যাচার, পুলিসের অবিশ্রাম লাঠির আঘাতে রক্তপ্লুত দেহে চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি-উচ্চারণ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তার, জরিমানা ও অপমান এবং পুলিস কর্তৃক সম্মিলন-মণ্ডপ ভাঙিয়া দেওয়ার ফলে এবং বরিশালে কোথাও কোন সভা অনুষ্ঠিত হইবে না সরকারী আদেশের ফলে ২রা বৈশাখ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সমবেত সভ্যবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া ৩রা বৈশাখের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অনুষ্ঠান বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পরবর্তী অধিবেশন ১৩১৩ বঙ্গাব্দের শেষ ভাগে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির রাজনৈতিক অধিবেশনের সময় আহূত হয়—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বহরমপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের আহ্বানকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নির্বাচিত সভাপতিরূপে তাঁহার ভাষণ রচনা করেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের আকস্মিক অকাল-বিয়োগে বহরমপুরে আহূত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন স্থগিত রাখিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের লিখিত সভাপতির ভাষণটি পঠিত না হওয়ায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভাষণটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (৬ষ্ঠ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা) চৈত্র ১৩১৩ "সাহিত্য পরিষদ" নামে প্রকাশিত হয়।

পরিষৎ-পত্রিকায় অমুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের রচনাটি ৭০ বৎসর পরে পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রণ করিয়া সাহিত্য পরিষৎ একটি "অকৃতকর্তব্য" পালন করিলেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে শ্যামাপূজার অব্যবহিত পূর্বে, ১৭ই ও ১৮ই কার্তিক, কাশিমবাজার রাজবাটীর সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত হয়।

—পরিষৎ সম্পাদক

প্রথম শূরপালের তাম্রশাসন

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

প্রায় সাত বৎসর পূর্বে উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলার কোন স্থানে বাংলো-বিহারের পালবংশীয় সম্রাট্ প্রথম শূরপালের (আ° ৮৫০-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ জাদুঘরের শ্রী হ্বি. এন. শ্রীবাস্তব এই শাসনের ঐতিহাসিক মূল্য বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া Bulletin of Museums and Archaeology in U. P. সংজ্ঞক পত্রিকায় পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যায় (লক্ষ্ণৌ, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৬৭-৭০) প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত Asiatic Society Monthly Bulletin-এর ষষ্ঠ খণ্ড দশম সংখ্যায় (নবেম্বর, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৪-৫) ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শ্রীবাস্তব মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণের সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। পালবংশীয় রাজগণের বংশলতা এবং কালপঞ্জীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরাও ইহার ভিত্তিতে দুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি।[১]

কিন্তু আমরা সম্প্রতি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, শ্রীবাস্তব মহাশয়ের বিবরণে কতকগুলি গুরুতর ভুল আছে। গতমাসে পাটনার শ্রীযুক্ত এস. হ্বি. সোহোনী মহাশয় আমাকে তাম্রশাসনটির আলোকচিত্র প্রদান করিয়া অনুরোধ করেন যে, আমি যেন শাসনের পাঠোদ্ধার পূর্বক তৎসম্পাদিত Journal of the Bihar Research Society পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করি। পরে তিনি আমাকে শাসনের ছাপও পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। আমার ইংরেজী প্রবন্ধে শাসনটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থলে শ্রীবাস্তব মহাশয়ের ভুলপাঠ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীবাস্তব মহাশয় এবং তদনুযায়ী ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের বিবরণে বলা হইয়াছে যে, রাজ্ঞী মহেশো-ভট্টারিকার অনুরোধে ভবদেবীর গর্ভজাত সম্রাট শূরপাল বারাণসীর শৈবাচার্যদিগকে কতকগুলি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, শাসনের দূতক ছিলেন যুধিষ্ঠির এবং যে ব্যক্তি দলিলটি লিপিবদ্ধ করেন তাঁহার নাম ছিল সামন্ত দক্ষাদাস-বৈরোচন দাস।

এই বিবরণের প্রথম ত্রুটি এই যে, দেবপালের পুত্র শূরপালের গর্ভধারিণীর নাম ভবদেবী নহে; তাঁহার নাম ছিল মাহটা। শাসনের ১৪শ শ্লোকে ইহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

> "শ্রীমদ্দুর্লভরাজ-রাজতনয়া শ্রীমাহটাখ্যাভবদ্
> দেবী তস্য করগ্রহপ্রণয়িনী শ্লাঘ্যা দ্বিতীয়েব ভূঃ।
> প্রত্যেতব্য-পতিব্রতা-গুণকথাঃ শৈলাত্মজারুন্ধতী-
> সাবিত্রীরপি যা চকার চরিতৈঃ পুণ্যামৃতস্যান্দিভিঃ ॥"

শ্লোকটির অর্থ এই যে, শ্রীযুক্ত দুর্লভরাজ নামক নরপতির কন্যা শ্রীমতী মাহটা ছিলেন তাঁহার (অর্থাৎ দেবপালের) বিবাহিতা মহিষী। রাজা পৃথিবীর পতি, তাই মহিষী ভূ দেবীর শ্লাঘনীয়া সপত্নী হইলেন। মহিষীর মধুর এবং পবিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই জনগণ পার্বতী, অরুন্ধতী এবং সাবিত্রীর পাতিব্রত্য গুণ বিষয়ক কাহিনী সমূহ বিশ্বাস করিল।

যাহা হউক, সহজেই বুঝা যায় যে, শাসনের "অভবদ্দেবী" হইতেই "ভবদেবী"র উদ্ভব। অর্থাৎ শ্রীবাস্তব মহাশয় শ্লোকটি পড়িতেও পারেন নাই, উহার অর্থও বুঝেন নাই।

যে শ্লোকে শাসনের দূতকের উল্লেখ আছে, সেই ৩১শ শ্লোকের পাঠ ও ব্যাখ্যাতেও এই ধরনের ভ্রান্তি দেখিতে পাই। কারণ শাসনের দূতকের নাম যুধিষ্ঠির নহে। ৩১শ শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীমান্ শ্রীশূরপালেন নৃপচন্দ্রমসা কৃতঃ।
হরিযু'ধিষ্ঠিরেণেব বলবর্ম্মাত্র দূতকঃ ॥"

অর্থাৎ যেমন যুধিষ্ঠির হরি বা কৃষ্ণকে দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ নৃপচন্দ্র শ্রীযুক্ত শূরপাল শ্রীমান্ বলবর্ম্মাকে এই শাসন ব্যাপারে দূতক নিযুক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের পক্ষ হইতে দূতরূপে কৃষ্ণের দুর্যোধন সমীপে গমনের কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বলবর্মা দেবপালের নালন্দাশাসনের দূতক ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের শাসনকর্তা। ঐ মণ্ডলটি বোধ হয় সুন্দরবনের কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত ছিল। যাহা হউক, অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত এইরূপ সহজ শ্লোকের পাঠ এবং অর্থবোধে যদি কাহারও অসুবিধা হয়, তাঁহার পক্ষে এই শাসনের বহু সুকঠিন শ্লোকের পাঠোদ্ধার এবং ব্যাখ্যা একেবারেই অসম্ভব। এবং ঠিক এই কারণেই আমাদের দেশে প্রশস্তিমূলক লেখাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা এখন প্রায় শূন্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ লেখের পাঠোদ্ধারের জন্য সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু কেবল উহাই যথেষ্ট নহে। আরও দরকার সত্যনিষ্ঠা, প্রত্নলিপিবিদ্যার জ্ঞান, অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, ইতিহাস ও লেখসাহিত্যে সুগভীর জ্ঞান, ইত্যাদি।

যাঁহার অনুরোধে রাজা শূরপাল গ্রাম দান করিয়াছিলেন, তিনি "তাঁহার মহিষী মহেশো-ভট্টারিকা" নহেন, তাঁহার মাতা মাহটা-ভট্টারিকা। বর্তমান শাসনে শূরপালের মহিষীর কোন উল্লেখ নাই। আশ্চর্যের বিষয়, যিনি ১৪শ শ্লোকে রাজমাতার নাম ধরিতে পারেন নাই, এখানেও তিনি তাঁহার নাম পড়িতে এবং শূরপালের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বুঝিতে পারেন নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই রাজমাতার নাম শাসনটিতে আরও একবার উল্লিখিত হইয়াছে এবং সেখানেও শ্রীবাস্তব মহাশয় উহা পড়িতে বা বুঝিতে পারেন নাই। শাসনে শ্রীনগরভুক্তি অর্থাৎ পাটনা অঞ্চলে অবস্থিত চারিটি গ্রাম দানের কথা আছে। শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন যে, গ্রামগুলি বারাণসীর শৈবাচার্যদিগকে দান করা হইয়াছিল। কিন্তু আসল কথা এই যে, গ্রাম চারিটির মধ্যে দুইটি গ্রাম বারাণসীতে রাজমাতাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার নামাঙ্কিত মাহটেশ্বর সংজ্ঞক শিবলিঙ্গের উদ্দেশ্যে দান করা হয় এবং বাকী দুটি গ্রাম পাইয়াছিলেন রাজমাতার প্রসাদপুষ্ট শৈবাচার্য পর্ষৎ। এই শৈবাচার্যগণ সম্ভবতঃ ঐ মাহটেশ্বরের মন্দিরের তত্ত্বাবধান করিতেন।

দেখা যাইতেছে যে, দেবপালের মহিষী এবং শূরপালের জননী বারাণসীতে শিবমন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া সেখানে পূজাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, বারাণসী এই সময়ে পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, পালদিগের শত্রু গুর্জর-প্রতীহার বংশের কবলে নহে। আমরা জানি যে, দেবপালের পিতা ধর্মপাল (আ° ৭৭৫-৮১২ খ্রীঃ) ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন ; তিনি তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজ সিংহাসন দান করিয়াছিলেন।[২] কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট (আঃ ৮০০-৩৩ খ্রীঃ) কনৌজ অঞ্চল অধিকার করিয়া পূর্বদিকে মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গের পর্যন্ত অগ্রসর হন।[৩] এদিকে আবার সমসাময়িক তিব্বতরাজ Mu-lig Btsan-po (৮০৯-১৫ খ্রীঃ) ধর্মপালকে পরাজিত করার দাবি করিয়াছেন এবং তাঁহার অন্যতম উত্তরাধিকারী Ral-pa-chan (আঃ ৮১৭-৩৬ খ্রীঃ) নাকি দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।[৪] গুর্জর-প্রতীহার এবং তিব্বতরাজগণ পালদিগের বিরুদ্ধে মিত্রতাবদ্ধ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বারাণসীতে দেবপাল ও শূরপালের অধিকার হইতে বুঝা যায়, শত্রুগণ পালদিগকে তখনও সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করিতে পারে নাই। অবশ্য নবম শতাব্দীর শেষদিকে দ্বিতীয় নাগভটের প্রপৌত্র প্রথম মহেন্দ্র পাল বাংলা ও বিহারের বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হন এবং দশম শতাব্দীতে কম্বোজেরা বাংলা দেশের অনেকাংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এই কম্বোজেরা সম্ভবতঃ তিব্বতীয় ছিল। তাহারা বর্তমান কোচ জাতির পূর্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

বর্তমান শাসনে দেবপালকে নেপালরাজ-বিজয়ী বলা হইয়াছে। এই সময়ে নেপাল তিব্বত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল।[৫] সুতরাং নেপালের সহিত বিরোধকে তিব্বতীয় বা কম্বোজ সংগ্রামের সহিত সংশ্লিষ্ট বলা যাইতে পারে। আরও বলা হইয়াছে যে, সুবর্ণদ্বীপের অধিপতি দেবপালের নিকট প্রণত হইয়াছিলেন। ইহার প্রকৃত অর্থ দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন[৬] হইতে জানা যায়। শৈলেন্দ্রবংশীয় সুবর্ণদ্বীপাধিপতি বালপুত্রদেব দেবপালের রাজ্যমধ্যে অবশ্যই তাঁহার অনুমতি লইয়া নালন্দাতে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। তাঁহার অনুরোধে দেবপাল ঐ বিহারের উদ্দেশ্যে পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সুমাত্রার অন্তর্গত পলেম্বঙে (প্রাচীন শ্রীবিজয়ে) এবং মালয়ের অন্তর্গত পেনাঙের নিকটবর্তী কেডাতে (প্রাচীন কটাহে) শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল।[৭]

পালবংশের ইতিহাসের উপর বর্তমান শাসনটি কি নূতন আলোকপাত করিয়াছে, তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।[৮] এই প্রথম জানা গেল যে, প্রথম শূরপাল সম্রাট দেবপালের পুত্র ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত ছিল ; কিন্তু বাদাল প্রশস্তিতে[৯] দেখা গিয়াছিল যে, তিনি দেবপাল (আঃ ৮১২-৫০ খ্রী) এবং নারায়ণ পালের (আঃ ৮৬০-৯১৭ খ্রী) মধ্যবর্তী সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাই তখন অনুমিত হইয়াছিল যে, তিনি নারায়ণপালের পিতা প্রথম বিগ্রহ-পালের (আঃ ৮৫৮-৬০ খ্রী) সহিত অভিন্ন। এই বিগ্রহপাল ছিলেন ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র। সুতরাং বর্তমান শাসন আবিষ্কারের পর দেখা যাইতেছে যে, প্রথম শূরপাল এবং প্রথম বিগ্রহপাল স্বতন্ত্র নরপতি ; কারণ শূরপাল দেবপালের পুত্র আর বিগ্রহপালের পিতা ছিলেন জয়পাল। সম্ভবতঃ শূরপালকে উৎখাত করিয়া বিগ্রহপাল সিংহাসন

অধিকার করিয়াছিলেন। দেবপাল এবং নারায়ণপালের মধ্যে এখন আমাদিগকে দুইজন নরপতির স্থান করিতে হইবে। রাজৌনাগ্রামে[১০] প্রাপ্ত মূর্তিলেখ শূরপালের পঞ্চম রাজ্যবর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যকাল ৮৫০-৫৮ খ্রীঃ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথম বিগ্রহপাল ইহার পর অল্পকালমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শাসনের শেষ পংক্তিতে বলা হইয়াছে, সামন্ত দক্ষদাস এবং বৈরোচনদাস নামক দুই ব্যক্তি উহা উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। 'সামন্ত' অধীন রাজার উপাধি। এইরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কোন লেখ উৎকীর্ণ করা একেবারে নূতন ব্যাপার নহে। বিজয় সেনের সুপ্রসিদ্ধ দেওপাড়া প্রশস্তি[১১] 'বারেন্দ্রক-শিল্প-গোষ্ঠী-চূড়ামণি' রাণক উপাধিধারী শূলপাণি কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

পাদটীকা

১. Asiatic Society Monthly Bulletin, January, 1976, pp. 8-9; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৮২তম বর্ষ, ১৩৮২ সাল, পৃ. ১৫-২২।

২. ধর্মপালের খালিমপুর শাসনের ১২শ শ্লোক এবং নারায়ণপালের ভাগলপুর শাসনের ৩য় শ্লোক দ্রষ্টব্য (মৈত্রেয়কৃত 'গৌড় লেখমালা', পৃ ১৪, ৫৭)।

৩. প্রতীহার বাউকের জোধপুর শাসন (৮৩৭ খ্রী.) অনুসারে তাঁহার পিতা কক্ক মুদ্‌গগিরিতে গৌড়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া যশ অর্জন করিয়াছিলেন। এই কক্ক অবশ্যই দ্বিতীয় নাগভটের সামন্ত ছিলেন। Epigraphia Indica, Vol. XVIII, p. 96, verse 24 দ্রষ্টব্য।

৪. R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, p. 118.

৫. H. C. Ray, Dynastic History of Northern India, Vol. I, pp. 192ff.

৬. Ephigraphia Indica, Vol. XVII, pp. 310ff.

৭. শৈলেন্দ্রবংশের ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য R. C. Majumdar, Hindu Colonies in the Far East, 1963, pp. 33 ff.

৮. ১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৯. মৈত্রেয়কৃত 'গৌড় লেখমালা', পৃ. ৭০ হইতে।

১০. Journal of Ancient Indian History, Vol. VII, pp. 102ff.

১১. N. G. Majumdar, Inscriptions of Bengal, Vol. III, pp. 42ff.

অচিন্ত্যকুমারের "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ"

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

অচিন্ত্যকুমারের "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ" একখানি অনবদ্য গদ্যকাব্য—যেমন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" বা রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা", যদিও পুস্তকত্রয়ের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। রসাত্মক বাক্যালাপই কাব্য,—তা'র রচনাশৈলীতে মিল, এমন কি ছন্দও, থাক বা না থাক। তবে কাব্যে অলঙ্কারও থাকে, যার মধ্যে উপমা প্রধান; অবশ্য ধ্বনিবাদীরা যাকে ব্যঞ্জনা আখ্যা দিয়েছেন, শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে তার উপস্থিতি আবশ্যক। কবি শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে রসের ছড়াছড়ি, আর উপমা তো ছত্রে ছত্রেই রয়েছে প্রোজ্জ্বল রত্নের মতো। যাঁর বাণী এই গ্রন্থের মূলাধার, তাঁর সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন—"উপমা রামকৃষ্ণস্য"। বস্তুত মহাকবি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে, ভারতীয় সাহিত্যে রামকৃষ্ণের উপমার তুলনা মেলেনা—এমন কি বিদ্যাপতিতেও নয়। তবে ওই তিনজনের উপমা বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক—তাঁদের উপমায় যেন মণিমাণিক্যের দ্যুতি, আর রামকৃষ্ণের উপমায় বনফুলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য যার পাপড়ির রস শিশিরকণায় সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করছে: সূর্যরশ্মি তত্ত্বের দীপ্তি। তত্ত্বকে সরল ভাষায় প্রকাশ করা সত্ত্বেও বাঙ্ময়ের ব্যঞ্জনা আমাদের হৃদয়কে ভাবার অতীত তীরে নিয়ে যায় আমাদের অজান্তেই।

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ রচনার পূর্বে অচিন্ত্যকুমার চারখণ্ডে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। ওই গ্রন্থে, যার সব খণ্ডগুলি আমি পড়ে উঠতে পারিনি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য, অচিন্ত্যকুমার রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক বাণী পরিবেশন করেছেন। কিন্তু কবি শ্রীরামকৃষ্ণ পুস্তকে তিনি রামকৃষ্ণকে কবিরূপে উপস্থাপিত করেছেন, যা তাঁর আগে অন্য কেউ ভাবেননি। রামকৃষ্ণের কথামৃত থেকে তিনি কবিত্ব-মঞ্জুল বাণীগুলি চয়ন করেছেন এবং একটি বহুবর্ণ মাল্য রচনা করেছেন, যার বর্ণাভা ও সুরভি মনোমুগ্ধকর।

বইখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমি 'তা প্রায় এক নিঃশ্বাসে পাঠ ক'রে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবার অবশ্য সমালোচকের দৃষ্টিতে পুস্তকটি পড়তে গিয়ে দেখলাম যে—রামকৃষ্ণের নিজস্ব কবিত্ব মনোলোভন হলেও অচিন্ত্যকুমারের ভক্তিরসান্বিত ভাষ্য তাকে অপূর্ব কাব্যের রূপ দিয়েছে, যার জন্য অচিন্ত্যকুমারের অবদান সমধিক। আমার মতে, অচিন্ত্যকুমারের মতো সুন্দর বাংলা আজ অবধি কম সাহিত্যিকই লিখতে পেরেছেন, এবং কবি শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে তাঁর ঝরণা-কলম সুবর্ণ নির্ঝরের রূপ গ্রহণ করেছে। রামকৃষ্ণের উপমার সঙ্গে অজস্র নিজস্ব উপমা তিনি যোগ করেছেন; অবশ্য তা' করতে গিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের কাছে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এটা দোষের নয়; আমরা কেউ আত্মভূ নই, পূর্বসূরিদের দায়ভাগ আরম্ভ ক'রেই আমরা নবতর সৃষ্টি করতে পারি, যা জগতের সেরা কবিরাও করেছেন—যথা কালিদাস, শেক্সপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথ।

তবে উল্লেখ্য এই যে—আলোচ্য গ্রন্থের সমস্ত কবিত্বযশ রামকৃষ্ণের প্রাপ্য নয় ; বস্তুত ওরূপ সংযোজন ও বিশদীকরণের জন্যই কবি শ্রীরামকৃষ্ণ একখানি অপূর্ব মনোজ্ঞ গদ্যকাব্যে পরিণত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে যার জুড়ি মেলে না। কবি শ্রীরামকৃষ্ণ অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।

আমি যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গে কবি শ্রীরামকৃষ্ণ পুস্তকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, কারণ তত্ত্বের দিক্ থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক—আমি যুক্তিবাদী নৈয়ায়িক এবং নাস্তিক,—সেশ্বরবাদী ভক্ত নই। ভারতপথিক রামমোহন এদেশে পাশ্চাত্য নবজাগরণের উদ্‌গাতা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই জাগরণযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবাদ ও মানবিকতা পুনরভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। উপনিষৎ-নিষ্ণাত রামমোহন অবশ্য ব্রহ্মবাদী ছিলেন, যদিও তাঁর ব্রহ্মে ব্যক্তিসত্তা আরোপিত। বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন সংশয়বাদী, এদেশের গোঁড়াদর্শন সাংখ্য ও অদ্বৈত বেদান্তকে তিনি ভ্রমাত্মক বিবেচনা করতেন এবং প্রাচীন ভারতের সনাতন ঐতিহ্যকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেছিলেন, শ্রুতিকে অপৌরুষেয় ব'লে স্বীকার করেন নি। কিন্তু—মুখ্যত গীতার আকর্ষণের জন্য—অদ্বৈতবাদ ও সাংখ্যযোগের সংমিশ্রিত দর্শন এদেশের মানসজগতে অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করলো। তাছাড়া, বৈদেশিক শাসনের আচারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে স্বাদেশিকতা জন্মলাভ করলো তা' প্রতীচীর নব জাগরণের মূলমন্ত্রকে প্রায় অস্বীকার ক'রে ভারতীয় আপ্তসর্বস্ব ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের অধিকতর আকৃষ্ট করলো,—যা' সব সময়েই অচলায়তনের মতো বিরাজ করছিল আমাদের মনোরাজ্যে। পরমপুরুষরাও যুগমানব, অর্থাৎ যুগভারতীর সংস্কৃতিস্তন্যে লালিত। কিন্তু গত শতাব্দীতে এদেশে দু'টি বিভিন্ন ভাবধারা বইছিল—বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণ যাদের প্রতিভূ। প্রকৃতপক্ষে, দু'রকমের মানুষ প্রতি যুগেই জন্মায়—যাদের বলা হয়েছে প্লেটোপন্থী ও এরিস্টটলবাদী ; একদলের দৃষ্টি অপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক জগতের দিকে এবং অন্যদলের দৃষ্টি বাস্তব জগতের দিকে—যেখানে বস্তুসত্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই চরম তত্ত্ব। দর্শন বা ন্যায়ানুগ বিচার (—সাধনালব্ধ দর্শন বা দিব্যদৃষ্টি নয়) ওই দুই সহজাত প্রবৃত্তির সমর্থন বৈ নয়। সুতরাং "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর"—এই কথাটি প্রায় আক্ষরিক অর্থে সত্য।

তবে এখানে বলা প্রয়োজন—সুধীসংসদে সম্প্রতি আলোচনার ফলে তা' অত্যাবশ্যক মনে করি—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্", যা' আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন। অনেকেরই জানা নেই যে ভারতীয় দর্শনে "নাস্তিক" শব্দের মানে মুখ্যত নিরীশ্বরবাদী নয়। যিনি বেদের প্রামাণ্যতায় কিংবা পরলোকে বিশ্বাস করেন না তিনিই নাস্তিক। চার্বাকপন্থীরা ঈশ্বরে, বেদের প্রামাণ্যতায় ও পরলোকে বিশ্বাস করতেন না ; বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে ঈশ্বর বা বেদের আপ্তবাক্যকে স্বীকার করা হয়না, কিন্তু পরলোকে বিশ্বাস আছে। আস্তিক্যবাদী দর্শনের মধ্যে আছে ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ, এবং মীমাংসা ও বেদান্ত ; এ'রা সবাই বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করেন। প্রথম চারটি দর্শন প্রধানত যুক্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু শেষোক্ত দুটির প্রথম ও শেষ কথা বেদ, যদিও মীমাংসা বেদকে কর্মাত্মক বা যজ্ঞাত্মক এবং বেদান্ত বেদকে জ্ঞানাত্মক মনে করে। লক্ষণীয় এই যে—বৈশেষিকের জনক কণাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি, এবং ন্যায়কার গৌতম ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন কর্মফলদাতা বিচারক রূপে, কর্মবাদ মানলে যার সার্থকতা নেই। সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী ; যোগদর্শনে ঈশ্বরকে ধ্যানের সহায়ক হিসেবে একজন পরমপুরুষ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। আর পূর্ব-

মীমাংসা দর্শন যজ্ঞকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করেছে এবং ক্ষুদ্রশক্তি দেবতাদের মন্ত্রবশ্য রূপে পরিণত করেছে। একমাত্র উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তদর্শনই ঈশ্বরকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়েছে; তবে কেবলাদ্বৈতবাদে ঈশ্বর পরম সত্তা নন;—বিশিষ্টাদ্বৈত ও অন্যান্য বেদান্তবাদে পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে ভক্তির আধার বলা হয়েছে। নিরপেক্ষ বিচারে—বিভিন্ন দার্শনিক মতের নিরসনে আপত্তি থাকা উচিত, নয় কিন্তু তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃত বিশ্লেষণ পক্ষপাতদুষ্ট এবং অযৌক্তিক। আমার বক্তব্য এই যে এদেশে যুক্তিবাদী দার্শনিকের অভাব ছিল না, বরং অন্য দেশের থেকে বেশিই ছিল। কিন্তু আস্তিক দর্শনের নানারকম প্রচলিত রূপ সম্প্রতি এদেশের সামাজিক চিন্তাধারাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করেছে; যার বিষময় ফল হচ্ছে সংস্কারের অক্টোপাসে বন্ধন করে যুক্তিবাদকে গুরুবাদের যূপকাষ্ঠে ছাগশিশুর মতো বলিদান। শুধু নিন্দা বা প্রশস্তি করা বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য নয়; মতের বৈভিন্ন্য সত্ত্বেও যে রামকৃষ্ণের তথা অচিন্ত্যকুমারের কাব্যামৃত পান ক'রে আনন্দিত হয়েছি, তা জানানোই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। তত্ত্বের যাথার্থ্য না মেনেও আমরা কাব্যের রস আস্বাদনে যে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারি তা' নিঃসন্দেহ। কাব্য নবরস-রুচির হ্লাদময় অনন্যপরতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করে—এদেশের অলঙ্কারিকরা বলেছেন; এবং পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে এরিস্টটল ও শেক্সপীয়ার তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। অবশ্য, মম্মটপ্রমুখ আলঙ্কারিকরা নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দকে পরা নির্বৃতির আনন্দের সঙ্গে অভিন্ন বা তুলনীয় ভেবেছেন। অচিন্ত্যকুমার রামকৃষ্ণের কবিত্বের সুখ্যাতি করতে গিয়ে গোড়াতেই বলেছেন—"কবি র্মনস্বী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ"—যিনি দেখেন জানেন প্রকাশ করেন, তিনিই কবি। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি বলেছেন—"সর্বদর্শী, সর্বানন্দী, সর্বানুভূঃ"। বস্তুত—ঈশ্বর থাকলে—তাঁর সম্বন্ধেই কথাটি প্রযোজ্য, কোনো মহামানব সম্পর্কেও নয়। এরূপ অতিরঞ্জন, ও ভক্তিবিহ্বলতা আমাদের মতে কাব্যের স্বরূপ আস্বাদন ও বিশ্লেষণ ব্যাহতই করে। সিদ্ধপুরুষ ও ভক্ত মৌন থাকলে আমাদের কিছু *বলার নেই; নিজেদের মধ্যে তাঁদের ভক্তিসর্বস্ব আলোচনা সীমিত থাকলেও ততোটা আপত্তি দেখিনা; কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্যরূপে কোনো মত প্রকাশ করলে যুক্তির নিয়ম মেনে তাঁকে চলতেই হবে। ন্যায় ও* ভক্তির মধ্যে প্রকৃত বিরোধ নেই; স্ব স্ব ক্ষেত্রে উভয়েই নিরপেক্ষ। 'প্রেম' 'ভক্তি'-রূপে ফ'লে রইতে পারে,—তা'রা ন্যায়ের নিয়মশৃঙ্খল মানেও না, নিরঙ্কুশ কল্পনা তাদের অধিগত; কিন্তু ভক্তির ন্যায়ী-করণের প্রচেষ্টা হেত্বাভাসই সৃষ্টি করে,—বিশেষত আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেঃ বিস্তারিত আলোচনার অবসর এখানে নেই। বলা বাহুল্য, আধ্যাত্মিকতাবাদীরা এরূপ মত স্বীকার করেন না, এবং যুগে যুগে ও দেশে দেশে তাঁরা তাঁদের মতের দার্শনিক রূপ দিয়েছেন। কিন্তু বিতর্ক থামিয়ে আমরা এবার অচিন্ত্যকুমারের গ্রন্থের কাব্যমাধুর্য পরিবেশন করবো—মানে, তার খানিকটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। কাব্যালোচনা কিন্তু কাব্যরসাস্বাদের প্রতিকল্প নয়, যদিও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যস্বাদকে ঘনীভূত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা ছিল—"আমাকে রসে বশে রাখিস, মা! আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিসনে।" অচিন্ত্যকুমার যোগ করলেন ভাষ্যঃ "এই হচ্ছে নিত্যকালের কবির প্রার্থনা।" সকল কবি কারো কাছে এরূপ প্রার্থনা না জানালেও তাঁরা শুকনো সন্ন্যাসী নন,—তাঁরা রসের আস্বাদক ও

পরিবেশক। তবে তারপরেই অচিন্ত্যকুমার যা বললেন তা' সম্পূর্ণ সত্য ঃ "রস চাই সঙ্গে সঙ্গে বশও চাই। আবেশ চাই, সেই সঙ্গে চাই বন্ধন, সংযম, শৃঙ্খল। ভাবের সঙ্গে চাই রূপ, সীমা, সৌষ্ঠব।" এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পংক্তিত্রয় স্মর্তব্য ঃ

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া ;
অসীম চাহে সে সীমার নিবিড় সঙ্গ।"

অচিন্ত্যকুমার আবার বললেন ঃ "নিবিড়তার সঙ্গে পরিমিতি।" বস্তুত এরূপ সংযমের অভাবে অনেক সাম্প্রতিক কবিতা ভাবের ঐশ্বর্য ও কল্পনার চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও রসোত্তীর্ণ কাব্য হতে পারেনি—যেমন নেই বল্গাহীন তুরঙ্গের গতিতে ছন্দ। অচিন্ত্যকুমারের ভাষ্যে ফিরে যাই ; "রস যদি অ-বশ হয় তাহলে যা', বশ যদি বিরস হয় তাহলেও তাই। ফল একই, অর্থাৎ কোনোটাই কবিতা হয় না। একটি তৈলস্নিগ্ধ পলতেতে আগুনকে বন্দী করতে পারলেই সে মসৃণ দীপশিখা হয়ে ওঠে, নইলে হয় সে স্ফুলিঙ্গ, নয় সে দাবানল। দীপশিখাটিই কবিতা।" লক্ষ্য করুন—কাব্যবহ্নিকণাকে অচিন্ত্য-কুমার আগুনের পরশমণিতে পরিণত করেছেন, যার স্পর্শে ক্ষীণ তত্ত্বমূলক কাব্যস্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠেছে মনোরম বর্তিকা। অচিন্ত্যকুমার বলে চলেছেন ঃ "অল্প কথায়, কবিতা হচ্ছে একটা প্রকাশ, প্রস্ফুটন। অন্তরের ভাবকে রসে জ্বাল দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা। ছন্দ বা মিল, যতি বা ঝঙ্কার—এসব বসনভূষণ মাত্র, নয় প্রাণবস্তু। প্রাণের আসল দীপ্তিটি চর্মে নয়, চক্ষে।" অচিন্ত্যকুমারের ভাষ্যটি যেন শুক্তি থেকে মুক্তো উদ্ধার ক'রে আমাদের চোখের ও মনের সামনে তুলে ধরেছে, আর আমরা মুক্তোর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছি।

কিন্তু তারপরে অচিন্ত্যকুমার যা বললেন তা' বিতর্কের বিষয় ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি' ততক্ষণ গদ্য। যেই তুমি এলে অমনি হলো কবিতার জন্ম। যতক্ষণ আমি ততক্ষণ বদ্ধ। যেই তুমি এলে অমনি ছন্দ বেজে উঠলো। আমি তোমার 'সহিত' হলাম।" বিতর্কের কারণ এই যে—শুধু আমি থাকলে ভাষার প্রয়োজন নেই, এমন কি গদ্যেরও। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে প্রতীকাত্মক ভাষার মাধ্যমে ; এমন কি উন্মাদও যখন আপন মনে বিড়বিড় করে, সেটা সম্ভব হয়েছে যেহেতু একসময় তার কাছে 'তুমি'ও ছিল। ওয়াটসন বলেছেন—"চিন্তন অনুচ্চার ভাষণ" ; তাঁর সঙ্গে একমত না হয়েও আমরা বলতে পারি যে মনুষ্যোচিত চিন্তন শব্দপ্রতীকের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়, এবং শব্দরাজি সমাজের দান,—ভর্তৃহরিকল্পিত কোনো অলৌকিক শব্দব্রহ্মের স্বীকৃতি অপরিহার্য নয়। গদ্যও সাহিত্য, যা' বক্তা ও শ্রোতা, পাঠক ও শ্রোতার মধ্যে সেতু রচনা করে। সঙ্কীর্ণ অর্থে সাহিত্যই কাব্য, অর্থাৎ রসাত্মক বাগ্মাল্য। কথাটি একজায়গায় রবীন্দ্রনাথ গানের সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু সমস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য—যা তিনিই অন্যত্র বলেছেন। সকল দেশের ও সর্বযুগের সাহিত্যিকরা তা' জানেন ; সাহিত্যমীমাংসাকরা তাকে সাধারণ তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত করেন মাত্র। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে—অচিন্ত্যকুমারের কথাটি কাব্যিক, যদিও যথার্থ তাত্ত্বিক নয়। এইজন্য রসোত্তীর্ণ কাব্যও রসমাধুর্য সত্ত্বেও অযথার্থ হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ কাব্যলক্ষ্মী সর্বত্র মনোমোহিনী উর্বশী এবং কোথাও কোথাও যুগপৎ কল্যাণদায়িনী লক্ষ্মী। লাবণ্যরশ্মিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেলে

আমরা অসত্য বা অর্ধসত্যকেও সত্য বলে ভাবতে পারি। কাব্যের সীমিত প্রাঙ্গণে তা' সহনীয়, কিন্তু সমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তা' সহনীয় নয়। তত্ত্বকে কাব্যরূপে পরিবেশন করলে কখনো কখনো সঙ্কট দেখা দেয়; এবং যাঁদের অধিকাংশ তত্ত্বগ্রন্থই কাব্যাকারে রচিত, তাঁদের স্বপ্নের মায়াজালে বন্দী হবার আশঙ্কা থাকে,—জীবনের পক্ষে যা' মঙ্গলকর নয়। কারণ জ্ঞানই শক্তি, এবং জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হলে জ্ঞানের প্রয়োজন,—স্বপ্নের নয়। কল্পনার অঘটনঘটনপটীয়সী সৃজনী শক্তির কথা স্বীকার করেও একথা বলা প্রয়োজন, যদিও শিশু কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে সব সময় তফাৎ করতে পারে না। কবিরা যে কল্পনার সাহায্যে সত্যের সন্ধান পান, তা' তাঁদের হৃদয়বত্তার জন্য—যে গুণ মানুষকে অন্য মানুষের অন্তরে প্রবেশ করায়। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে কল্পনার উদ্দাম লীলা রূপকথাই রচনা করে এবং কখনো কখনো বৈদিক ধর্মের মতো ধর্মও, যেখানে সুন্দর ও মহীয়ান্ প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ঘটনা দেবদেবীতে পরিণত। অবশ্য দৈনন্দিন জীবনের অর্থক্রিয়াকারিত্বের কথা ভুলে আমরা কাব্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি, যে সৌন্দর্য দেশকালাতীত, অর্থাৎ দেশ ও কাল যেখানে অবান্তর—তুচ্ছ। এরূপ চিন্তা থেকেই আমাদের দেশের আলঙ্কারিকরা কৈবল্যানন্দের সঙ্গে রসাস্বাদের তুলনা করেছেন।

একথা ভেবেই আমেরিকান কবি-দার্শনিক সান্তায়ানা বলেছেন: "সৌন্দর্য বোধহয় পূর্ণতার পরম প্রকাশ এবং তার সম্ভাবনার চরম সাক্ষ্য; সৌন্দর্যই মানবাত্মা ও নিসর্গের মধ্যে সম্ভাব্য মিলনের প্রতিশ্রুতি।" নন্দনতাত্ত্বিক বা পারতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সৌন্দর্যই একমাত্র সত্য নয়; প্রকৃতিতে দুর্যোগ আছে এবং মানবহৃদয়ে মাৎসর্য-মালিন্য আছে। অবশ্য, ভগবদ্ভক্ত কবিরা একথা স্বীকার করবেন না; এবং শেষ বয়সে অচিন্ত্যকুমার রামকৃষ্ণের করুণায় ভক্তিস্পর্শমণি পেয়ে দুঃখগ্লানির আয়সকে সুবর্ণে রূপায়িত করেছেন। তা' না হলে তিনি বলতে পারতেন না: "পৃথিবীতে অনেক কান্না, সেটা হচ্ছে সংবাদ, কিন্তু কান্না ছাপিয়ে শুনতে পাচ্ছি একটি হাসির শব্দ, সেইটিই হচ্ছে সত্য।" অথচ যে গৌতম বুদ্ধকে জগতের অনেক মনীষী শ্রেষ্ঠমানব আখ্যা দিয়েছেন, তিনি বলেছিলেন: "মানবজাতির আবির্ভাব থেকে আজ অবধি মানুষ যতো অশ্রু বিসর্জন করেছে, তার কাছে সপ্তসিন্ধুর সমস্ত বারিরাশি অকিঞ্চিৎকর।" এবং ভারতের সমস্ত দর্শনের লক্ষ্যই হলো দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক বিনাশ, কিন্তু সে-বিনাশ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? ঘটুক বা না ঘটুক, দুঃখের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কাব্য হিসেবে অচিন্ত্যকুমারের কথাটি সুন্দর; এর যাথার্থ্য স্বীকার করেই বোধহয় প্রাচীন ভারতের আলঙ্কারিকরা বিয়োগান্ত নাটক রচনার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন, এবং অচিন্ত্যকুমারের সমানধর্মা কুশাগ্রীয়ধী অল্‌ডাস হাক্সলি বৃদ্ধ বয়সে তপস্বী সেজে ভেবেছেন—বিয়োগান্ত নাটক জীবনের অসম্পূর্ণ পরিচয় বহন করে। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজিডি ও শেক্সপিয়ারের বিয়োগান্ত নাটকের তুলনা কোথায়—বাস্তব সত্য ও মহত্ত্বের দিক্ থেকে? আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর আলোকপাত করেছেন, কিন্তু ভক্তির বন্যায় ওরূপ মত স্বাভাবিক কারণেই (—কোনো প্রবঞ্চনাত্মক চিন্তার জন্য নয়) খড়কুটোর মতো ভেসে যায়।

প্লেটোর দার্শনিক বিশ্লেষণে যখন দুরূহ সমস্যা দেখা দিত, তখনি তিনি রূপকথার আশ্রয় গ্রহণ করতেন—যেসব রূপকথা খুবই মনোজ্ঞ। কিন্তু তাঁর বাস্তববাদী শিষ্য এরিস্টট্‌ল্ বলতেন—"ওসব কাব্যিক রূপক"। বস্তুত উপমার আপেক্ষিক কাব্যিক সাম্য সত্ত্বেও তা কাব্যই, কারণ

উপমামাত্রই একদেশদর্শী হয়, এবং দর্শনের ক্ষেত্রে একদেশদর্শিতা মারাত্মক ত্রুটি। কিন্তু শুনিতে কী মিষ্ট—"আমরা অমৃতের পুত্র ঃ এই বিশ্বসৃষ্টিটা মানুষের কাছে ঈশ্বরের একটি প্রেমপত্র, আর মানুষের সাহিত্য হচ্ছে তা'র প্রত্যুত্তর"! আসলে মানুষের নভশ্চুম্বী স্পর্ধা এতে প্রকাশ পাচ্ছে, যার দৃষ্টিভঙ্গী প্রাক্-কোপার্নিকীয়। অচিন্ত্যকুমার আরো বলেছেন, "আমি যেমন আমার লেখার স্রষ্টা, তেমনি এই বিশ্বরচনার কি কেউ স্রষ্টা নেই?" এই বালসুলভ প্রশ্নের উত্তর বহু ভারতীয় দার্শনিকই দিয়ে গেছেন,—আধুনিক বিজ্ঞানের কথা না-ই বা আনলাম? অচিন্ত্যকুমার আরো বলেছেন ঃ "যতক্ষণ মানুষের পেটে রুটি নেই, ততক্ষণই চাঁদ ঝলসানো রুটি ; যতক্ষণ তা'র মাঠে ধান নেই, ততক্ষণই চাঁদ কাস্তে। অজন্মা বা অভাবের সমস্যা চিরকালিক নয়। অভাবের শেষ আছে, কিন্তু ভাবের শেষ নেই। রোষ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু রস অফুরন্ত। ক্ষিদে জুড়োয় কিন্তু চাঁদ ফুরোয় না।" কথাগুলি বড়ো সুন্দর—ছুরির শাণিত ফলার মতো ঝলমল করছে। কিন্তু এই হঠাৎ-আলোর-ঝলকানি মুখ্যত শাব্দিক, যা' অচিন্ত্যকুমারের বাগ্‌রীতির বৈশিষ্ট্য—প্রায় মুদ্রাদোষের মতো। প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাস ও যমকের প্রাচুর্যে তিনি ঋদ্ধিমান্, কিন্তু কেউ কেউ একে বাক্‌চাতুর্যও বলতে পারেন, যদিও আমি তাঁর চাতুরীতে অনেক মাধুরীও পাই। তবু প্রকৃত সমাজচেতনার অভাবে এবং দুঃখদৈন্যকে সুখে রূপায়ণের বিলাসে, আপাতঃ প্রমা ছেড়ে তিনি কতোটা অগাধ প্রেমে ডুবেছেন, শাব্দিক ফেনোর্মি সে বিষয়ে মাঝে মাঝে সংশয় জাগায়।

রামকৃষ্ণের নিজের উপমা কিন্তু ভাবগভীর, এবং তিনি নবরস বিতরণ করেছেন অফুরন্ত ভাবে। হাস্যপরিহাসের তরলতা তাঁর রসঘনতাকে ব্যাহত না ক'রে মানবিকতার সাধারণত্বে অসাধারণ ক'রে তুলেছে।—ঈশ্বর সকলেরই ভালবাসার পাত্র, "চাঁদমামা সকলের মামা"। রামকৃষ্ণও নিজেও অবাক্ হতেন—কী ক'রে এতো কথা জুটেছে তাঁর ঝুলিতে? তিনি ভাবতেন "মা আমার পেছন থেকে রাশ ঠেলে দেন"। তাঁর তত্ত্বরাজি কিন্তু কালীর কাছে তিনি পেয়ে থাকলেও তাদের অধিকাংশ এদেশের স্বল্পশিক্ষিত বাউল বৈরাগীর—এমন কি চাষাভুষোরও অলভ্য নয়। ওসব কথা আমাদের সাংস্কৃতিক আবহাওয়াতে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে ; ছেলেবেলা থেকে ওসব কথা প্রায় সবাই জানে। তবে তিনি কবি, বলার ধরণ তাঁর স্বকীয় অশিক্ষিতপটু কবিত্বের প্রকাশ। কাজেই যে মা পেছন থেকে রাশ ঠেলে দেন তিনি দেবী ভারতী, যেমন বলা হয়—কালিদাসের রসনায় মঞ্জীরচরণা সরস্বতী নৃত্য করতেন। এই নিজস্ব ভঙ্গীর জন্যই অতিসাধারণ কথাও মনোরম হয়ে উঠেছে—তা'রা কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে ও শ্রোতাদের প্রাণ আকুল ক'রে তোলে। এমন কি স্থলে স্থলে তাঁর রসিকতা গ্রাম্যতাদুষ্ট হলেও তা'তে অশ্লীলতার চিহ্ন নেই,—সারল্যের জন্যই রাস্তার নর্তকী যেন সম্ভ্রান্ত বাইজী পদে উন্নীত হয়েছে।

রামকৃষ্ণের অপূর্ব উপমার কিছু নমুনা উপহার দিচ্ছি।—"ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘিয়ের শব্দ নেই। তেমনি, যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না-বসে, ততক্ষণ ভন্‌ভন্ করে। ফুলে ব'সে মধু খেতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। আবার, পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্‌ভক্ শব্দ করে ; পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না।" রামকৃষ্ণ সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে তুলনা করছেন শিক্ষানবীশের ঃ কী সুন্দর রূপকগুলি! অথচ আমরা অনেক সাধকম্মন্য বাবাজী

দাদাজীর মুখে কিন্তু কল্‌কল্যানি, ভন্‌ভন্‌ ও ভক্‌ভক্‌ শুনতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যাই—দিব্য বিভূতির মাহাত্ম্য কল্পনা ক'রে। রামকৃষ্ণ বলেছেন : "বেশি বিচার করতে গেলেই সব গুলিয়ে যায়। এদেশের পুকুরের জল উপর-উপর খাও, বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশি নীচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়।" অচিন্ত্যকুমারের টীকা : "তাই বিচার নয়, বিশ্বাস। তর্ক নয়, প্রেম।" বাণী ও টীকা দু'টিই সুন্দর। তাহলেও সাধক ছাড়া অন্য লোক বিচার করে, কারণ বিচারশক্তি বা বুদ্ধিতেই মানুষের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য, প্লেটোর মন্ত্রে দীক্ষিত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ শিশুকে মহান্‌ ঋষি ও মহিমান্বিত হজরৎ ব'লে অভিহিত করেছিলেন, কারণ তা'রাও বিচার করে না—শুধু বিশ্বাস করে এবং প্রাক্তন দিব্য জীবনের স্মৃতিচারণে মগ্ন থাকে। মনস্তাত্ত্বিক সত্যের কথা এখানে তুলে' বলবো—জ্ঞানী হয়েও শিশুর নিষ্কলঙ্ক সারল্যই কাম্য, তা'র অর্বাচীন চিন্তন-কল্পনের আলো-আঁধারির খেলা নয়, বাস্তব-অবাস্তবের আলিম্পন রচনা নয়। যীশুখ্রীষ্টও শিশুদের তাঁর কাছে আসতে দিতে বলতেন, যেহেতু প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ ও শিশুর মধ্যে সারল্য ও বিশ্বাসের ব্যাপারে সমমনস্কতা আছে। ওরূপ সারল্য কিন্তু স্বকীয় বাক্যের যুক্তিজালে বন্দী হয়ে পরকীয় যুক্তি খণ্ডনের ব্যসন নয়,—উপলব্ধির কিরণে প্রস্ফুটিত চিত্তমুকুলের আনন্দবিহার।

আরেকটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : "নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আর খোল আলাদা হয়ে যায় ; আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়নড় করে।...পাকা অবস্থায় রস যায় শুকিয়ে। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে শুকিয়ে যায় বিষয়রস।" অচিন্ত্যকুমারের টিপ্পনী : "আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়নড় করে। ভাষায় তেজ আর প্রসাদগুণ একসঙ্গে ; তার সঙ্গে অর্থের বিদ্যুতি।" উভয়েই সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন, যদিও আমরা জানি যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে আত্মা বা মন ও দেহের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। অচিন্ত্যকুমার বলে চলেছেন : "আমি কবে নির্লিপ্ত হব ? কুমুদ জলে থেকেও জলে নেই, তার যোগ চাঁদের সঙ্গে।" রূপকটি মনোজ্ঞ হলেও কুমুদ ও কৌমুদীমান্‌ চন্দ্রের বন্ধুত্ব সংস্কৃত কবিপ্রথিত মাত্র, কারণ অমাবস্যাতেও কুমুদ ফোটে ব'লেই আমাদের ধারণা। রামকৃষ্ণ বললেন : "হরিদাস বাঘের ছাল প'রে ছেলেদের ভয় দেখাচ্ছে। একজন বীর ছেলে বললে—তোকে আমি চিনেছি ; তুই আমাদের হরে।" অচিন্ত্যকুমার যোগ করলেন : "হরিদাস নয়, হরে ; একেবারে নস্যাৎ ক'রে দিলে। যে জ্ঞানী সে-ই বীর।" জৈনরাও জ্ঞানী তীর্থঙ্করদের বীর আখ্যা দিয়েছিলেন ; শ্রেষ্ঠ তীর্থঙ্কর মহাবীর। একদল অন্ধের হস্তিদর্শনের গল্পও রামকৃষ্ণ বলেছেন ; এটাও জৈনদের অনেকান্তবাদের তত্ত্ব—উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যাত। রামকৃষ্ণ বললেন : "আমি সমস্ত বেলটিকেই চাই ; শাঁস-বীচি-খোল সমস্ত নিয়েই বেল।" অচিন্ত্যকুমার একে বলেছেন একটি হৃদয়স্পন্দী কবিতা। অত্যন্ত হৃদয়স্পন্দী হোক বা না হোক, এটি একটি কবিতাই বটে, এবং কবিতা হয়েও কেবলাদ্বৈত-বাদের পরিপন্থী সত্যের ব্যঞ্জনা এতে রয়েছে ; রামকৃষ্ণ নিজে গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং সংসারত্যাগী গৈরিকবাস সন্ন্যাসীর থেকে গৃহনিবাস ত্যাগীকে গরীয়ান্‌ মনে করতেন। এ সম্পর্কে একাধিক সুন্দর গল্প ও রূপক তিনি পরিবেশন করেছেন। স্থানাভাবে সব উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন : "যতো মত ততো পথ"। অচিন্ত্যকুমারের ভাষ্য : "ধর্মের জগতে তিনি সর্বসমন্বয়ের প্রবর্তক।" কথাটি খুব ঠিক নয়, কারণ গীতাতে নানা মার্গের সমন্বয়ের

প্রচেষ্টা হয়েছিল প্রথম, এবং নানা ধর্মের সার সংগ্রহ ক'রে নবধর্ম দীন্ এলাহির প্রবর্তন করেছিলেন বাদশাহ আকবর। তবে রামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মনির্দিষ্ট মার্গে সাধনা ক'রে একই লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন—এরূপ জনশ্রুতি আছে। এ কথা অবিশ্বাস করার হেতু নেই, কারণ সত্যিসত্যি যদি কেউ একবার লক্ষ্যে পৌঁছে যান, তারপরে অন্যান্য রাস্তা দিয়েও তিনি—সহজে বা কষ্ট ক'রে—সেখানে পৌঁছতে পারবেন।

গার্হস্থ্যজীবনে থেকে সাধনা সম্পর্কে রামকৃষ্ণের অনেক সুন্দর রূপক আছে, ত'ার কয়েকটি মাত্র পরিবেশন করছি। "নর্তকীর মতো থাকবে ; নর্তকী যেমন মাথায় বাসন নিয়ে নাচে। পশ্চিমের মেয়েদের দেখনি ? মাথায় জলের ঘড়া, হাস্‌তে হাস্‌তে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে। তেমনি ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করবে।" আবার ঃ "থাকো পানকৌটির মতো। পানকৌটি জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই গায়ে আর জল থাকেনা।" আরো আছে ঃ "জলে-দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মতো দুধটি নিয়ে জলটি ত্যাগ করো।" এ উপমাটি কিন্তু রামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ নয়, কারণ ওটা তথ্য-পরিপন্থী প্রাচীন কবিপ্রথিতি মাত্র। পরমহংস রামকৃষ্ণ শাস্ত্র এবং কাব্যও পাঠ করেছিলেন আমার বিশ্বাস,—যদিও শুধু কৈশোরে বিরাট রামকৃষ্ণায়নের অতি সামান্য অংশই আমি পড়েছিলাম। অবশ্য, হংসের নীর ত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বরের জীবপ্রীতি সম্পর্কে অতি সুন্দর কথা বলেছেন রামকৃষ্ণ ঃ "ঈশ্বর উৎকর্ণ হয়ে আছেন। তিনি পিঁপড়ের পায়ের নুপুরগুঞ্জন শুনতে পান্।" এ কবিতার তুলনা হয়না এবং কবি-ভাষ্যকার অচিন্ত্যকুমারের মুখর লেখনীও এখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে, ব্যাখ্যার অক্ষম চেষ্টা তিনি করেননি।

সংসার সম্বন্ধে অনেক সুন্দর উপমা আছে ঃ যেমন, "সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ'", "মানুষ যেন উটের মতো", "সংসার হচ্ছে আমড়া—অ'াটি আর চামড়া", "মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলি" ইত্যাদি। আরো বলেছেন ঃ "কচ্ছপের মতন থাকো। কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু ডিম থাকে আড়াতে। যেখানে ডিম, সেখানেই তা'র মন প'ড়ে থাকে।" "সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ"। আবার বললেন ঃ "থাকো পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁকের চিহ্ন নেই। গা পরিষ্কার, ঝক্‌ঝক্ করছে।" "উপমার কতো বৈচিত্র্য"—যোগ করলেন অচিন্ত্যকুমার। "থাকো ঝড়ের এ'টো পাতা হয়ে" ; ভাষ্য—"এ তুলনার তুলনা নেই"। ঈশ্বরের শরণাগতির ভাবটি ফুটিয়েছেন আদালতের ভাষায়—"ঈশ্বরকে আমমোক্তারি দাও।" ব'লেই আরেকটি উপমা দিলেন ঃ "বাঁদরের বাচ্চা হয়ো না, বেড়ালের বাচ্চা হও।" বাঁদরের বাচ্চা লাফিয়ে মাকে ধরতে গিয়ে কখনো প'ড়ে যায়, কিন্তু বিল্লীর বাচ্চাকে তা'র মা কামড়ে ধ'রে যেখানেই নিয়ে যায় সেখানেই মিউমিউ ক'রে সে যায়, কিন্তু প্রতিবাদ করে না—অহমিকা নেই তা'র। অচিন্ত্যকুমার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য দিয়েছেন ঃ "একটি সার্থক কবিতা ; ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী।"

পরিহাসরসমিশ্রিত দু একটি উপমার উল্লেখ ক'রেই আমার প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি। একটি গ্রামের ছেলে পদ্মলোচন পোড়ো মন্দিরে ভোঁ ভোঁ ক'রে একদিন শাঁখ বাজালো ; ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সবাই সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলো—ঠাকুরপ্রতিষ্ঠার কথাই ওঠে না, মন্দির মার্জনই হয়নি।

তখন সবাই চেঁচিয়ে উঠলো :

"মন্দিরে তোর নাহিক মাধব,
পোদো, শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল !"

অচিন্ত্যকুমারের ভাষ্য : "আমরাও এমনি ফাঁকা শঙ্খধ্বনি করছি। তাঁকে প্রকাশ করছি না, শুধু আত্মপ্রচার করছি। মন্দিরে মাধবপ্রতিষ্ঠা নেই, শুধু স্তোত্রপাঠের অনুষ্ঠান। সে-স্তোত্র আরাধনা নয়, আত্মস্তুতি। তাঁকে জানানো নয়, শুধু নিজের বিজ্ঞাপন।" এখানে টিপ্পনীর প্রয়োজন দেখিনা। আরেকটি গল্প : "দু'বন্ধু বেড়া'তে চলেছে। একজায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বললে—এসো ভাই, একটু ভাগবত শুনি। আর একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে।" তারপর দ্বিতীয় বন্ধু রক্তদীপ এলাকায় চ'লে গেলো কিন্তু সর্বক্ষণ নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো—ভাগবতপাঠ শোনেনি ব'লে। প্রথম বন্ধুটি সর্বক্ষণ অনুশোচনা করতে লাগলো—ওই এলাকায় যায়নি ব'লে। "এরা যখন ম'রে গেলো, যে ভাগবত শুনছিল তা'কে যমদূত নিয়ে গেল ; আর যে অন্যত্র গিছল তা'কে বিষ্ণুদূত নিয়ে গেল বৈকুণ্ঠে।" অচিন্ত্যকুমার যোগ করেছেন : 'আর একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে—কী চমৎকার একটি ব্যঞ্জনা। ছবিটি যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি।" বস্তুত, রামকৃষ্ণের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল সুতীক্ষ্ণ ও প্রগাঢ়, অথচ হাস্যরসে প্রাণটি ছিল টইটম্বুর। তাই তিনি ওরূপ সজীব বাঙ্ময় চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছেন ; তত্ত্ব গভীর অথচ তা'র প্রকাশ হাসির বর্ণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল।

অচিন্ত্যকুমার বলছেন : "যে সমন্বয় করেছে সেই লোক। হাসির মধ্য দিয়েই মেলালেন রামকৃষ্ণ।" তারপর স্বয়ং রামকৃষ্ণের বাচনে : "বৈষ্ণবচরণকে অনেক সুখ্যাত ক'রে আনলুম সেজ বাবুর কাছে। সেজবাবু খুব খাতির যত্ন করলে। রূপোর বাসন বার ক'রে জল খাওয়ানো পর্যন্ত। তারপর সেজবাবুর সামনে বলে কি, আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না। সেজবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।" অচিন্ত্যকুমার যোগ করলেন : "একটি কৌতুককুশল পরিচ্ছন্ন মনের স্বাচ্ছন্দ্য।" মধ্যমরা পরিহাস করেনা তাদের পাণ্ডিত্যের মুখোষ খসে প'ড়ে যাবার ভয়ে। কিন্তু উত্তমের সে শঙ্কা নেই ; তিনি অনায়াসে অধমের সঙ্গে কৌতুকরসের ভোজে যোগ দেন এক পংক্তিতে ব'সে।

অচিন্ত্যকুমার গ্রন্থটি শেষ করেছেন এইভাবে—কবিসাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ ক'রে : "তোমার উপস্থিতির অবিরাম আনন্দ আমার সমস্ত অস্তিত্বে সঞ্চারিত হোক ! তোমার স্পর্শে আমরাও কবি হবো, প্রীতিতে মৈত্রীতে প্রসারিত হবো সর্বভূতে ; আপনার মাঝে নিহিত ও সমাহিত যে পরমাত্মা, তা'কে প্রসারিত করবো অস্তিত্বের অবারিত আনন্দে। এই প্রকাশের মন্ত্রটি প্রেম। আর এই প্রেমই মহাকবির শাশ্বত কাব্য। মনের মাধুর্য, প্রাণের আরাম, আত্মার প্রশান্তি।"

অচিন্ত্যকুমার নবীন বয়সে রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখেছিলেন ভাষা, আর প্রবীণ বয়সে রামকৃষ্ণের কাছে শিখলেন ভাব--প্রেমের সুধারসে নিষিক্ত। প্রেম-যে জীবনের তথা কাব্যের প্রধান উপজীব্য—এ বিষয়ে আমিও একমত। এবং প্রেম কবি শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থের সঙ্গীতধ্রুব ব'লে গ্রন্থটি বেঁচে থাকবে মনোরম কাব্যরূপে।

চালা শৈলীর ঐতিহ্য

শ্রীঅজীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষ আরাধনার জন্য মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ইহা তাহাদের বাসগৃহের অনুরূপ হইত। সেজন্য সিরীয় চার্চগুলির সহিত ফরাসী দেশ, ব্রিটেন, আয়ারের সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। শেষোক্ত দেশসমূহের চার্চগুলির সাদৃশ্য বেশীর ভাগ সুইডেন, নরওয়ে এবং ফিনল্যাণ্ডের উপাসনাগারগুলির সহিত রহিয়াছে, তাহার কারণ বিবিধ। স্থপতি অথবা সূত্রধারেরা কিম্বা তাহাদের আদিম পূর্বসূরীরা নিজ নিজ দেশে আবহাওয়া, ঝড়, জল, বৃষ্টি, শৈত্য, গ্রীষ্মের তাপ এবং সর্বোপরি ইমারত তৈয়ারী করিবার উপাদানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তখনকার সময় বাষ্পীয় যান অথবা পোত, ট্রাক প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় নাই। দূর দেশ হইতে মনোহর পাষাণ আনয়ন করা সম্ভবপর ছিল না। তথাপিও মৌর্য্য সম্রাটগণের কারিগরেরা দূর দূর দেশে—নেপাল, তরাই হইতে আরম্ভ করিয়া বিদিশা পর্যন্ত—চুনারের বেলে পাথর বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বারাণসীর উপকণ্ঠে মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথ) ইহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। চুণারের বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড উত্তরবাহিনী গঙ্গার সাহায্যে ভেলা দ্বারা বহন করিয়া বারাণসী পর্যন্ত আনিতেন। তাহার পর বরুণা নদীতে প্রবেশ করাইয়া একটি খাল দিয়া সারনাথে আনা হইত। বর্তমান সংগ্রহশালার পশ্চিমদিকে এবং তিমরিয়া গ্রামের পূর্বদিকে যেখানে এখন ধান চাষ করা হয় সেই সমস্ত জমি এই মজাখালের স্থান। পরে এই খালটী দিয়া সারনাথের উত্তরদিকে নরখোরতাল, সারঙ্গতালে প্রবেশ করিয়া হৎ বৃবৃহৎ পাষাণখণ্ড প্রতিষ্ঠার স্থানে আনয়ন করা হইত। ১৯৫০ সন পর্যন্ত ইহারা বিদ্যমান ছিল। তাহার পর নতুন সারনাথ স্টেশন করিবার পর এইসব খাল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এখন মূল বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাক। উত্তরবঙ্গের হিমালয়ের পাদদেশ ব্যতীত পাষাণ অতি দুর্লভ। তবে ক্ষমতাশালী রাজবংশীয়রা স'াওতাল পরগণার রাজমহল হইতে প্রস্তর আহরণ করিতেন। সুতরাং অতি আদিমকাল হইতে গৃহনির্মাণকারীগণকে বাংলা দেশে উৎপন্ন কাঠ, বাঁশ, সুপারী অথবা নারিকেল বৃক্ষ প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে গৃহনির্মাণ করিতে শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল। সর্বশেষ উপাদানটি হইতেছে ইষ্টক, যাহা নদীমাতৃক বাংলাদেশের পলিমাটী, লক্ষ বৎসর ব্যবহার করিলেও যাহা নিঃশেষ হইবার নহে।

ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী দেবতাকে কখনও অতি উচ্চাসনে বসান নাই। তিনি যে অতিমানব, অনাদি, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, মানুষের জীবনের কর্ণধার, সসব জানিয়া লইলেও বাঙ্গালীর গৃহে দেবতার উপর একটু আত্মীয়ভাব ছিলই। বাসগৃহের বিভিন্ন কক্ষে, অথবা সম্পূর্ণ আলাদা কক্ষে ননীচোরা শ্রীকৃষ্ণ অথবা সর্বত্যাগী ভোলানাথ বা বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর নারায়ণ পরিবারের সভ্য বলিয়া শতাব্দীর

পর শতাব্দী আদৃত হইয়াছেন। এইরূপ পারিবারিক স্নেহ অন্য কোন দেশে সচরাচর দেখা যায় না।

কেবল বাংলাদেশে কেন নিম্নলিখিত প্রমাণ হইতে বোঝা যায় যে চালা শৈলী প্রাচীন বঙ্গদেশে নহে, নিখিল ভারতে সর্ব্বপ্রাচীন দেব-দেউল-শৈলী। প্রাচীন বাঙ্গালীও নিজ নিজ বাসস্থানের অনুরূপ নিজ প্রিয়তম গৃহদেবতার, গ্রাম-দেবতা অথবা নগরদেবতার মন্দির নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই চালা মন্দিরের প্রাচীনত্বের সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও আমাদের অজ্ঞাত। কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মূল্যায়ন এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে একথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে এই চালা স্থাপত্য কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। যদ্যপি ইহার সমীক্ষা অন্যান্য দেশে করা হয় নাই, তথাপিও একথা বলা ভ্রম হইবে না যে অধ্যাপক শ্রীগ্রীষম্যান, শুস অথবা সুষা নামক ইরাণের প্রাগৈতিহাসিক রাজধানীতে খ্রীষ্ট-জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বের দোচালা সমাধি আবিষ্কার করিয়াছেন। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বর্তমানেও মফঃস্বলে বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি চালা স্থাপত্যের নির্মিত বৃহদাকার বাটীতে বাস করেন—ইংরেজীতে ইহাকে Gable roofed বলা হইয়া থাকে। নরওয়ে, সুইডেন, রাশিয়ার তো কথাই নেই। ভারতে চালা স্থাপত্যের প্রমাণ আমরা কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র এবং মালয় দেশে দেখিতে পাই। কোম্পানীর রাজত্বের পর ভারতীয় নগর হইতে দূরে যে-সব সেনা-শিবির (Cantonment) স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে সেনানায়কদের জন্য চারচালা গৃহ নির্মিত হইত। তবে তাহাদের ছাদ পোড়ামাটীর অর্দ্ধবৃত্তাকার টাইলে আচ্ছাদিত হইত।

এখন আমাদের বাংলাদেশের চালাশৈলীর প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা যাক। একথা অবশ্যই সত্য যে গঙ্গা, দামোদর, অজয়, মহানন্দা, পুনর্ভবা, করতোয়া ও তিস্তাধৌত শস্যশ্যামল অখণ্ডিত বাংলাদেশে গৃহনির্মাণের প্রকরণের বাহুল্য হেতু প্রথম হইতেই চালা গৃহ ও মন্দির নির্মিত হইত। গঙ্গা ও শোন সঙ্গমে মৌর্য্য সম্রাটগণ পাটলিপুত্র নামক যে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে যবন রাজদূত মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন যে এক সম্রাটের প্রাসাদ ব্যতীত পাটলিপুত্রে আর ইষ্টক বা পাষাণ নির্মিত হর্ম্ম্য ছিল না। পূর্ব্ব-ভারতের চালা স্থাপত্যের কয়েকটী বিভাগ আছে, যথা—দোচালা, চারচালা, আটচালা। চারচালা হইতে আর একটি বিশেষ ভাগ বাহির হইয়াছে, ইহাকে রত্নমন্দির বলা হয়। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, ডেভিড ম্যাক্‌কাচিয়ন ও হিতেশ সান্যাল এবং আমার ন্যায় অর্বাচীন করিয়াছেন।

আমাদের বর্তমান জ্ঞানে এই চারিটী বিভাগের মধ্যে কোনটী সর্ব্বপ্রাচীন তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে একথা ধরিয়া লইলে বোধ হয় ভ্রম হইবে না যে দোচালাই সর্ব্বপ্রাচীন, কারণ ইহা অতি সাধারণ। কিন্তু আমরা সর্ব্বপ্রাচীন প্রমাণ পাই আটচালা মন্দিরে যাহাকে বন্ধুবর ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার মড়াই আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পাঠের উপর নির্ভর করে। ইহা গোরখ্‌পুর জেলার অন্তর্গত সমৌরা গ্রামে উৎকীর্ণ একটী কাঁসার (Bronze) ফলকে (Plaque)

খ্রীষ্টজন্মের ৩য় শতাব্দী পুর্ব্বে ভারত ও নেপাল সীমান্তে (তখন বোধহয় শাক্যরাজের অন্তর্গত ছিল) কোন হর্ম্যে সংযোজিত হইয়াছিল। সুতরাং এই ফলকটী পূর্ব্ব-ভারতের অন্যতম মৌর্য্যযুগের প্রাচীন লিপি। দ্বিতীয়টি হইতেছে মহাস্থানগড়ের ইষ্টকলিপি। এই বহুমূল্য ফলকটী এখন কলিকাতার এশিয়াটীক সোসাইটীতে সংরক্ষিত আছে। ইহার উপরিভাগে ছয়টী চিহ্ন (symbol) উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। যথা, বেষ্টনীর মধ্যে বৃক্ষ, পর্বতের উপর অর্দ্ধচন্দ্র এবং দুই দিকে দুইটী আটচালা গৃহ ইত্যাদি। প্রত্যেক গৃহের প্রাচীরের সামনে চারিটী স্তম্ভের উপর প্রথম চারচালা ছাদ নির্মিত হইয়াছিল। তাহার উপর ক্ষুদ্রকার দ্বিতীয় চালা, এবং তাহার শিরোপরি ত্রিশূলের ন্যায় তিনটী চূড়া (Spires)।

দ্বিতীয় প্রমাণও উত্তর প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। তবে এবার বারাণসী জেলার সারনাথে। শুঙ্গ যুগের স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে পাষাণ নির্মিত অপূর্ব কারুকার্য্যখচিত কয়েকটি বেষ্টনীর ভগ্নাংশ অলম্বন, শুচী এবং স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। কোন কারণে কুষাণ যুগ আরম্ভ হইবার পূর্বে এইগুলি ভগ্নপ্রাপ্ত হইয়া নানান হর্ম্যে পুনর্ব্যবহৃত হয়। ইহাদের অন্যতম একটী স্তম্ভগাত্রে আমরা একটি জোড়বাংলার প্রতিলিপি দেখিতে পাই। ইহাকে খ্রীষ্টজন্মের ১৫০ পূর্ব্বাব্দের ধরিয়া লইলে বোধহয় ভ্রম হইবে না। ভগ্নাংশগুলি লিপিযুক্ত। সেজন্য লিপিতত্ত্ব আমাদের সময় নির্ধারণে সাহায্য করে। তৃতীয় প্রমাণ হইতেছে রাজস্থানে প্রাপ্ত একটী টেরাকোটা মৃন্ময়গৃহ। ইহা চারচালা এবং দরোওয়াজা, জানালা এবং জালি সমন্বিত—৺রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহানী বাহ্মান রাজধানী শাকম্ভরী খননে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাঁকুড়ার মন্দির' নামক গ্রন্থে ত্রিভুজাকৃতি মহাবলীপুরমের দ্রৌপদীর রথের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন না যে পল্লবসাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার বহু শতাব্দী পরেও চালা মন্দির কেরল হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত নির্মিত হইয়াছিল। সময় সময় ইহাদের 'বস্তী' বলা হয়। যথা ভাত্খলে-পেটকী-নারায়ণের মন্দির, কেরলের ত্রিবান্দ্রাম নগরীর নিকটে তিরুবল্লম নামক স্থানে অবস্থিত পরশুরামেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে শৈব মন্দির, বনিশালী মহাদেব এবং তেরুবল্লমের মড়াত্তিল মন্দির, প্রভৃতি।[১]

পূর্ব্ব ভারতের মুঙ্গের জেলার খঙ্গপুর উপত্যকায় রাজা-রানী নামক দুইটী মন্দির চালা শৈলীতে নির্মিত। প্রাচীন অঙ্গ, মগধ, কজঙ্গলে বোধহয় এইরূপ মন্দির আরো অনেক ছিল। বঙ্গদেশে একথা সর্বজনবিদিত। মহাস্থানগড়ের মন্দিরের ভিত্গুলি দেখিয়া মনে হয় ইহারা শিখর দেউল ছিল। কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত "অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা"র একটী পুঁথিতে আমরা অনেক রকমের চালা মন্দিরের চিত্র পাই। সুতরাং মুসলমান বিজয়ের পূর্বে এইরূপ মন্দির অবিভক্ত বাংলায় নির্মিত হইত একথা অস্বীকার করা যায় না। তাহার পরেও দক্ষিণবঙ্গে, উত্তরবঙ্গে এবং কামরূপে অহমরাজবংশের সময় চালা শৈলী বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এখানে আমাদের আর একটী বিস্ময়ের সম্মুখীন হইতে হয়। অহমরাজগণ একটী মিশ্র শৈলী আরম্ভ করেন—যথা, দেউল এবং চালার সংমিশ্রণ। শিবসাগরে "শিবতোল দেউলের" পিছনে চারচালা মন্দির আছে;

১ K. V. Sunderaan, Indian Temple Style, 1970. PLs. XLVI—XLVIII

জয়সাগরের "দেবীডোল" টী সম্পূর্ণ দোচালা। কিন্তু গৌরীসাগরের "দেবীডোল" মন্দিরটী দেউল শ্রেণীর, কিন্তু মণ্ডপটী দোচালা। একথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে কামরূপের চালা মন্দির বাংলাদেশ ও বিহারের চালা হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইহারা আকারে অত্যন্ত ভারী, কূর্ম্মাকৃতি নয় এবং ইহাদের কিনারাগুলি চাঁচিয়া-ছুলিয়া সরলরেখায় পরিণত করা হইয়াছে। আমাদের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এত সামান্য যে সঠিক করিয়া কোন মত প্রচলন করানো মূর্খতা। তবে আমার মনে হয় যে প্রেরণা বাংলা দেশ হইতে যাইলেও ইহা বোধহয় কামরূপের "কুমার ও কুমারী" গৃহের অনুকরণে নির্মিত। গৌরীসাগরের "দেবী ডোল" মন্দিরের বৃহদাকার মণ্ডপ এই ধারণার কারণ। [২]

একটি কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। জলপাইগুড়ি জেলার ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিয়া অনুমিত হয় যে ইহারা শিখর দেউল ছিল। জটিলেশ্বর মন্দিরও শিখরমন্দির। কুচবিহার জেলার বিশ্বসিংহের বংশধরেরা যে-সব দেবালয় নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন সেগুলি রাঢ়ের একচূড়া মন্দির। ইহাদের শ্রীপঞ্চানন রায় "আলগোছটুঙ্গি" বলিয়াছেন। ইহারা পঞ্চরত্ন মন্দির নহে।

এখন সমীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রথম সমস্যা যে চালাশৈলী বিভিন্ন প্রকারের—যথা দোচালা, চারচালা, আটচালা। প্রাচীনতম কোনটী? খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের ত্রিশত বৎসর পূর্ব্বে আমরা প্রথম আটচালা মন্দির বা গৃহ দেখিতে পাই সমৌরা ফলকের উপর। খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বারাণসীতে জোড়বাংলা পরিচিত ছিল। খৃঃ পূর্ব্বাব্দের কিছু পরে বা পূর্ব্বে শাকম্ভরী টেরাকোটা খেলনা গৃহটী। তাহার পরেই সপ্তম শতাব্দীতে মহাবলীপুরমের দ্রৌপদীর রথ! সুতরাং ইহা পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হয় যে প্রমাণগুলি বিভিন্ন শতাব্দীতে ইহাদের ব্যবহারের পরিচায়ক। তবে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে তাহাদের নির্মাণ পূর্ব্বসূরীদের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাদের আরম্ভ মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার পতনের পর এবং মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বের মধ্যকালে অতীতের কোন বিস্মৃত মুহূর্তে প্রাচীন ভারতীয় মনীষা, কোন বিদেশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত না হইয়া সৃষ্টি হইয়াছিল। অনাদি অনন্তকালে তাহাদের অতীত হারাইয়া গিয়াছে। অতীত মূক, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায় না, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ অনুসন্ধানকারীদের দিক্‌ভ্রান্ত করে। তবে একথা স্বীকার্য্য যে ইহা ভারতীয় সূত্রধারদের নিজস্ব কীর্ত্তি। যে সকল দেশে আবহাওয়া, বৃষ্টি, ঝড় বা ঝঞ্ঝা উপস্থিত সেই সব দেশেই চালা স্থাপত্যের উদ্ভব। এইসব দেশের অধিবাসীগণ নিজস্ব প্রকরণ ও প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ শৈলীকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন।

২ লেখকের Gaudiya Temples & their diffusion, Bulletins Indian Museum, Vol. V No. 1 pp. 115 ff. & Plates.

বেদান্তের বৈষ্ণব ভাষ্য এবং শাক্ত বৈষ্ণব ভাবধারার সমন্বয়

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধেয় মূল সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও সারস্বত ভাই ভগিনীগণ,

এই মহাসম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ ক'রে কর্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। হুগলী জেলার এই স্থানটি স্বনামধন্য, বাংলার ঐতিহ্যের এই উর্বর ক্ষেত্রে বহু প্রতিভার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমি শুধু ভারত-পথিক রামমোহনের কথাই উল্লেখ করব। এই মহাজীবনে, দুই শত বৎসর পূর্বে, শাক্ত বৈষ্ণব ভাবধারার সংঘর্ষ ঘটে। পিতৃকুল বৈষ্ণব, মাতৃকুল তন্ত্র-সাধক, শাক্ত। একদিকে শ্বেতচন্দন, তুলসীপত্র ও শ্বেত পুষ্প ; অন্যদিকে রক্তচন্দন, জবা, বিল্বদল। এই সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় রামমোহন উভয় দিকের সাকার সাকৃতি দেব-দেবীর অর্চনা, প্রতিমা-বিগ্রহাদি বর্জন ক'রে সগুণ-কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করলেন।

এক শতাব্দী যেতে না যেতে রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির শ্রদ্ধালু সমন্বয় সাধনার ফলে বাংলায় পুনরায় ভক্তির বন্যা বইল, তার মূল সূত্রটি সমন্বয়। শ্রীজীব গোস্বামীর সমন্বয় ভাষ্যটি যুক্তিবাদী শাক্ত বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ই যেন গ্রহণ করলেন। ভাষ্যটি এই—

"শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া, যঃ কৃষ্ণঃ
স বৈ দুর্গা স্যাৎ, যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।"

অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নেই—অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি এবং দুগ্ধ ও তার ধবলতার মত এই সমন্বয় সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

"যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা।"

দেবী ভাগবতে দেবী বলেছেন,—

সদৈকত্বং নভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ
যোঽসৌ সাহমহং যা সৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ।

এই অভেদ বা ভেদাভেদের কথা দর্শন প্রসঙ্গে বলা হবে এখন, ক্রমিক বিকাশ বিবর্তনের কথা কিছু বলি।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচার করেন শিশিরকুমারের অমৃতবাজার-গোষ্ঠী, পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ, প্রভু জগদ্বন্ধু, পণ্ডিত রসিকমোহন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেশাঁস বা সংস্কৃতির নব জন্ম বা নব জাগরণের ফলে দেশে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনের প্রচার প্রসার ও অগ্রগতি বশতঃ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী উদারতর ও প্রশস্ত-তর হ'ল। আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর, প্রথা-প্রীতি ও প্রচলিত রীতি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হতে লাগলো। ফলে যেমন ব্রাহ্ম পরিবেশ থেকে নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) প্রমুখ রামকৃষ্ণ-শিষ্যদল বেরিয়ে এসে—বিশ্বমানবের জন্য উদার সনাতন ধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন, তেমনি বিজয়কৃষ্ণও,—অরূপ থেকে রূপে এবং রূপ থেকে অপরূপ পরানুরাগের রূপক-প্রতীক রাধাকৃষ্ণের প্রেমধর্ম ও নাম-লীলা রসসঙ্কীর্তনে ব্রতী হলেন। এইদলের উল্লেখযোগ্য উজ্জ্বল নাম যথা—অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, 'ডন'-সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দ ও পদাবলী সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভানুসিংহের পদাবলী লিখলেন এবং বৈষ্ণব Mysticism বা মরমিয়াবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রেমাভিসার-মূলক গীতাঞ্জলি ও তদ্ভাবভাবিত গীতি-কবিতাগুলি রচনা ক'রে, 'রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন' লাভ করলেন এবং অপরূপকে দেখে গেলেন দুটি নয়ন মেলে। তিনি মধ্যপন্থী রয়ে গেলেন।

শুরু হল বিশ্ব-বৈষ্ণবতার প্রচার যার ফলে কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের শিষ্য-শাখা-ভুক্ত শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্তস্বামী মহারাজ ঘরে বাইরে, ভারতে এবং আমেরিকায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। স্থাপিত হ'ল—New York, Massachusetts, Boston, Washington, Canada, England France, West Germany, Australia, Japan, Rhode Island, Hawai Island প্রভৃতি স্থানে Iskon Center বা International Society for Krishna Consciousness, বিভিন্ন ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রেমধর্ম প্রচার এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে খোলকরতালসহ শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম নাম সঙ্কীর্তন প্রবর্তিত হ'ল। এ যেন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুরই ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য-প্রতিপাদক—'দেশে বা বিদেশে যত নগর পত্তন সর্বত্র হইবে হরিনাম সংকীর্তন'

রবীন্দ্রনাথও হরিনাম গানে সোচ্চার এবং উদাত্তকণ্ঠ—"বাঁচান বাঁচি মারেন মরি বলো ভাই ধন্য হরি।" তিনি ভবের নাটে—রাজ্য পাটে, শ্মশান ঘাটে ধন্য। যখন সুধা দিয়ে মাতান এবং ব্যথা দিয়ে কাঁদান তখনো তিনি ধন্য। "ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে, ধন্য হৃদয়-পদ্মদলে চরণ আলোয় ধন্য করি।" তাঁর বর্ণনায় তিনি বলেছেন—

তুমি সুন্দর যৌবন-ঘন রসময় তব মূর্তি,
নৃত্য-গীত কাব্য-ছন্দ, কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ,
অপচয়হীন চিরনবীন তব মহিমা স্ফূর্তি।

নানা ছলে কবি তাঁরই নামগান করেছেন,—

তোমারি নাম বলব নানা ছলে
বলব বিনা আশায়, বলব বিনা ভাষায়, বলব চোখের জলে
শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে।

ইহা ভাগবতের 'অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ" অপত্য-মাতৃক প্রগাঢ় আকর্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবি তাঁর গীতি-কবিতায় বলেন,

—সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল, হতভাগিনী।
—ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার !
—শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে, গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে,—**
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপনসম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে—

তখন কবির এই প্রিয়তমের 'সুন্দর যৌবন-ঘন রসময় মূর্তি'—এবং নৃত্য-গীত-কাব্য-ছন্দ-- চির-নবীন-লাবণ্য-স্ফূর্তির বর্ণনায় কোনো পাঠকের সন্দেহ থাকে না যে, তিনি যদি 'ব্রহ্ম' হন তাহলে তিনি সেই ভাগবতের "পীতাম্বরধর স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথ" নবঘনশ্যাম ব্রহ্ম, যাঁর বাঁশী শুনে সচকিত হয়ে কবি প্রশ্ন করেন, "সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে বনমাঝে কি মন মাঝে",—বিমূঢ় মন বুঝতে পারে না—সেই নয়ন-ভুলানোর উদয়নের পথে,—"কোথায় সোনার নূপুর বাজে—বুঝি আমার হৃদয় মাঝে, সকল সুরে সকল কাজে পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে"।

এই ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনে আনুষ্ঠানিক সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতার প্রাকার প্রাচীর ভেঙে পড়লো, মহাপ্রভুর উদার বৈষ্ণবতার সংজ্ঞাই জনগণের 'মনের মতো' হতে থাকলো।

"যাহারে দেখিলে মুখে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম, তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।" অর্থাৎ যাঁরা পাটোয়ারী বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে জটিল বিষয়-চিন্তা বর্জন ক'রে ভগবৎ প্রসঙ্গে নিমগ্ন থাকেন তাঁরাই প্রকৃত বৈষ্ণব ঃ

"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্,
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ"।।

অবশ্য শ্রী, নিম্বার্ক, বল্লভ, মধ্বাচার্য্য, এবং দ্রাবিড়ের আড়বার সম্প্রদায় আপন আপন পন্থায় ও পদ্ধতিতে ব্রতী রইলেন বটে কিন্তু বিশ্ব-বৈষ্ণবতার প্রসার সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করলো। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের জনপ্রিয়তা হেতু সমগ্র ভারতে তামিল তেলেগু কন্নড় হিন্দী বাংলা ওড়িয়া অসমীয়া ও মারাঠী সাহিত্য বৈষ্ণব ভাবধারায় বৈষ্ণব লেখকদের দ্বারা পুষ্টি লাভ করতে থাকলো। ফলে স্ত্রী-জতি ও তথাকথিত নীচবর্ণের জাতিরাও উত্তরোত্তর উন্নততর সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে লাগলো। স্থাপত্যে ভাস্কর্যে এবং চিত্র-শিল্পেও বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব অসামান্য।

আমি মহীশূর রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারের প্যানেলে উৎকীর্ণ দেখে এসেছি একটি বটপত্রে শয়ান বাল-গোপাল মূর্তি, যাতে শিল্পী এই শ্লোকটিকেই রূপায়িত করেছেন—"করারবিন্দেন পদারবিন্দং মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তং, বটস্য পত্রস্য পুটে শয়ানং" ইত্যাদি।

তান্ত্রিক সাধনাতেও এই ক্রম-বিকাশ সুস্পষ্ট। প্রাক্তন পঞ্চ-মকারাদির সাধনা ক্রমশঃ হিংসা ও আড়ম্বর বর্জিত এবং বিচার-বিশুদ্ধ হতে থাকলো এবং শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধ ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের সময় হতেই ক্রমশঃ কম হতে থাকলো। রামপ্রসাদ কমলাকান্ত উভয়েই সমন্বয়বাদী। রামপ্রসাদ গাইলেন—

নটবর বেশে বৃন্দাবনে কালী হলি মা রাসবিহারী
পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে একথা বিষম ভারী,
নিজ তনু আধা গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী
ছিল বিবসন কটি এবে পীত ধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী।

কমলাকান্ত গাইলেন—

জানোনা রে মন পরম কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়,—
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনো কখনো পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া কভু বাঁধে চূড়া ময়ূর-পুচ্ছে শোভিত হয় ***
কখনো পার্বতী কখনো শ্রীমতী, কখনো রামের জানকী হয়॥

উদার ভাবে একমেবাদ্বৈতম্ তত্ত্ব প্রচার ক'রে ভক্ত গাইলেন,—

অভেদে ভাবো রে মন কালা আর কালী
শৈব গাণপত্য শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণুভক্ত
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ বৃথা দলাদলি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব রাম, দুর্গা কালী, রাধাশ্যাম
সবে এক একে সব (তাই) একমেবাদ্বৈত বলি॥

শ্রীভাগবত বলেছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

একই তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান বলা হয় ভিন্নভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

শ্রীভাগবত তাই বলেছেন "কৃষ্ণমেনং অবেহি ত্বমাত্মানং অখিলাত্মনাম্", চরিতামৃতও তাই বলেছেন "অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন"।

প্রসিদ্ধ সাধক কৈলাসপতি, তান্ত্রিক মোক্ষদানন্দ, প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক বামা ক্ষ্যাপা প্রভৃতি কারণ বা মদ্য ব্যবহার করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভৈরবী মাতার প্রদর্শিত পন্থায় বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনা করলেও মদ্য বা কারণ ব্যবহার করেননি। তাঁর আকুমার ব্রহ্মচর্য্যের কথাও সকলেই জানেন।

মাতৃসাধক সাধু তারাচরণ পরমহংসও শ্রীরামকৃষ্ণের মতই আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, এমন কি তিনি বিবাহের পর আর পত্নীর মুখ দর্শনও করেননি। তা ছাড়া, তিনি কোনো গুরুর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন নি, শুধু শিশু সন্তানের মতো আকুল ভাবে মা মা বলে নিরন্তর ডেকেই মাতৃচরণ লাভ করেছিলেন এবং পরমহংস পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তন্ত্র সাধনার প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, বিচারপতি উডরফ্ এবং স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর 'জপসূত্রম্' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চিন্তাধারার ক্রম বিকাশ সাধন করবে।

শক্তি এবং ভক্তি—উভয়ই শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার সূত্র। "শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।"

শক্তি যখন patent বা প্রকট তখনই শক্তিমান পরমেশ্বরকে আমরা ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান রূপে পাই এবং তাঁকে শিবশক্তি লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি রূপে আমরা বরণ করি। শক্তি যখন latent অর্থাৎ গুপ্ত অব্যক্ত সুপ্ত বা অপ্রকট,—তখন তিনি নির্বিশেষ নির্বিকল্প ব্রহ্ম, তিনি তখন 'অবাঙ্মনসগোচরং' 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'; তাঁর প্রসঙ্গে, পূজা উপাসনা ধ্যান ধারণার কোনো সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তিনি তখন সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত এবং অগম্য।

ভক্তি—কথাটির ব্যুৎপত্তি ভজ্ ধাতু থেকে। একদিকে ভজ্ ধাতুর অর্থে ভাগ বিভাগ বা বিভক্তি করা অপর দিকে ভজ্ ধাতু থেকেই হয় ভজনা করা। সহজেই বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম থেকে জীবের, বিভক্ত-প্রতীতি অর্থাৎ পৃথক সত্তা উপলব্ধি না হলে ভক্তির প্রয়োগ-স্থান কল্পনা করা যায় না। কারণ 'যদা সর্বং ব্রহ্মৈবাভূৎ তদা কেন বা কং পশ্যেৎ' যখন সর্ব ব্রহ্ম রূপ অবিভক্ত একাত্ম প্রতীতি হয় তখন,—দৃগ্ দৃশ্য দর্শন এই ত্রিপুটীর লয় হয়। তাই ভক্ত বলেন, 'চিনি হওয়া ভালো নয় মন চিনি খেতে ভালোবাসি!' তাই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এই ভক্তির ব্যবধানটুকুই ব্রহ্মানন্দ থেকে সান্দ্রানন্দকে মধুরতর করে। তাই ভক্ত মুক্তি চান না—ঋষিরা বলেন, "যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দ-সান্দ্রা বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীঃ"—এই ব্যবধানটুকুর মোচনরূপ মুক্তি—শ্রীভগবান দিতে চাইলেও ভক্ত নিতে চান না—'দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ'।

ঈশ্বর-ঈশ্বরী অর্ধনারীশ্বর শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্ট—অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বরকে শুধু পিতা ভগবান Lord God বা God the Father রূপে দেখা হয়েছে।

ভারতের ঋষিরা তাঁর এই পিতৃরূপেই পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। উপনিষদে তাই তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে—'স একাকী ন রেমে', 'জায়া মে স্যাৎ', —একা একা খেলা হয় না,—আনন্দ হয় না,—তাই মানুষের মতই বেদান্ত দর্শনের সূত্র করলেন, 'লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্',—অর্থাৎ লৌকিক লীলা স্বীকার করেই তিনি পতি-পত্নী ঈশ্বর-ঈশ্বরীরূপে প্রকাশিত হলেন, মানুষ তাঁকে অর্ধনারীশ্বররূপে সহজেই বরণ করে নিলে।

পিতার প্রকৃতি 'বজ্রাদপি কঠোর' কিন্তু মাতার প্রকৃতি,—কুসুমাদপি মৃদু বা কোমল। তাই পিতার কাছে অপরাধী হলে আমরা মায়ের মাধ্যমে, মায়ের আশ্রয়ে এবং প্রশ্রয়ে পিতার কাছে অপরাধ ভঞ্জনের উপায় খুঁজে পাই।

ঈশ্বরকে পিতারূপে সকলেই ভয় করেন, শ্রুতি বলেন 'ভীষাস্য বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ ভীষা অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ।'

ঈশ্বরকে শক্তির প্রতীক (সর্ব-শক্তিমান) প্রতাপঘন
,, জ্ঞানের ,, (জ্ঞানস্বরূপ) প্রজ্ঞানঘন
,, প্রেমের ,, (পরম-করুণাময়) আনন্দঘন

এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে আমরা চিন্তা করি,—শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়বিধ সাধনাতেই।

পিতারূপে রুদ্ররূপে ভয় করি,—যেন তিনি সুপ্রিম কোর্টের জজ দণ্ডমুণ্ডের মালিক—বলি "রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"। কিন্তু মাতা রূপে আমাদের সাহসের অন্ত নাই, দাবীর ও অন্ত নাই। তাঁকে ভক্তি করি, ভালবাসি, প্রাণ খুলে নির্ভয়ে বলি—

অপরাধো ভবত্যেব তনয়স্য পদে পদে ;

কোঽপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা ?

অর্থাৎ অপরাধ সে তো হয়ে থাকে মাগো! সন্তান, সে তো স্বভাবে করে, তা বলে ছেলের যত দোষই হোক, কোন্ মা ছেলেরে ক্ষমা না করে? বলতে পারি,—

অসীমং মম পাপঞ্চ অসীমা করুণা তব।

সভয়ং ত্বাং প্রপশ্যামি কং কো বা পরিলঙ্ঘয়েৎ।

আমার পাপেরও যেমন সীমা নাই, তোমার করুণার-ও তেমনি সীমা নাই, তাই জীবনের চরম মুহূর্তে ভয়ে বিস্ময়ে আশা আশঙ্কায় চেয়ে দেখি, জননি! আমার পাপই বড় হয়, না তোমার করুণাই বড় হয়। সংশয়ের অবকাশ মাত্র নাই—শ্রীভাগবত বলেন—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥

জ্বলন্ত অগ্নি যেমন সহজে জ্বালানি কাঠ ভস্ম করে তেমনি,—হে উদ্ধব! আমার প্রতি ভক্তি সমস্ত পাপ এবং দুষ্কৃতি ভস্মসাৎ করে। আমরা মায়ের কাছে শিশুর মতো অতি সহজ সরল ভাবে প্রার্থনা করি—

"কোলের ছেলে ধূলা ঝেড়ে তুলে নে কোলে,

ফেলিস্‌নে মা! ধূলো কাদা মেখেছি ব'লে।

যখন দুর্বলতা অনুভব করি তখন 'বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি',—ব'লে তাঁকে বোধন করি, বরণ করি।

সাধনার বীজ : বীজ বা Symbol—শাক্তের বীজ-মন্ত্র ক্রীং এবং বৈষ্ণবের বীজমন্ত্র ক্লীং ইহাও 'বলয়োরভেদঃ' হিসাবে মূলতঃ একই। ক = শক্তিমান ঈশ্বর, ঈ = শক্তি-স্বরূপিণী ঈশ্বরী। র বা ল উভয়ের মধ্যে পরমাকর্ষণী শক্তি; যাকে যোগ-শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "কুল-কুণ্ডলিনীশক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্"। ইহাই তান্ত্রিক ম-কারের আধ্যাত্মিক ভাষ্য।

এই সব বীজমন্ত্র ও অর্ধনারীশ্বরের প্রতীক বিভিন্ন প্রকার। পাশ্চাত্য গণিত-বিজ্ঞানের ভাষায় x এবং y অথবা জৈব-বিজ্ঞানের ভাষায় ঊর্ধমুখী তীর ↑ ও অধো মুখী ↓ তীর অথবা আমাদের প্রাচীন শিবলিঙ্গ গৌরীপট্টরূপে সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সবই ভাব থেকে রূপে এবং রূপ থেকে ভাবে যাতায়াতের আধ্যাত্মিক পথ বা মার্গ।

এই 'কৃষ্ণ-রাম-শিবাত্মক' পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি গোকুলে, অযোধ্যায় বা কৈলাসেই শেষ হয়ে যায়নি, এইসব পার্থিব প্রতীক থেকে আমরা অসীমের yard stick বা মাপ-কাঠি খুঁজে পেয়েছি,

তা না হলে আমরা সমুদ্রের অগাধ নীলিমায় বা আকাশের অনন্ত অসীমতায় তলিয়ে গিয়ে হাবুডুবু খাই, হাঁপিয়ে উঠি,—চোখ বুজলেই অন্ধকার দেখি। কিছুই ধরতে ছুঁতে পাইনে। এই পদ্ধতি আস্তিক দার্শনিকগণ 'প্রত্যক্ষাবগমং' এবং 'সুসুখং কর্তুমব্যয়ং' বলেই সমর্থন করেন। কারণ তিনি ছাড়া যখন 'অস্তি'-'ভাতি'-'প্রিয়'-'নাম' বা 'রূপ' পৃথক কিছুই নাই তখন 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা',—ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরাই তো ক'রে দিয়েছেন।

যাঁরা উত্তম অধিকারী তাঁরা কেউ কেউ বিনারূপে বিনা প্রতীকেও সেই অপরূপকে ধরতে পারেন, তাঁরা প্রজ্ঞাবান শক্তিশালী, তাঁরা অরূপ অব্যক্তের সাধক। গীতা বলেছেন,—

ক্লেশোঽধিকরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং, অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে। অরূপ, অব্যক্তের ধ্যান ক্লেশকর এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই x y ধরলে যেমন আমরা বীজগণিতের অঙ্ক সহজে ক'ষতে পারি তেমনি আমরা রূপকে ধরে রূপাতীতকে সহজে ধরতে পারি।

বিজ্ঞান ও প্রতিমা পূজা—

শ্রীভাগবত বলেছেন, "যো মাং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ হিত্বার্হর্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্‌ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ"। অর্থাৎ সর্বভূতে অবস্থিত আমি বিশ্বাত্মা পরমাত্মা বা পরমেশ্বর, আমার এই সর্বব্যাপী স্বরূপ ভুলে গিয়ে যে শুধু প্রতিমা পূজা করে, তার পূজা ভস্মে ঘি ঢেলে হোম করার চেষ্টার মতই ব্যর্থ হয়। স্বামীজির ভাষায় 'বহু রূপে সম্মুখে তোমার' যে ঈশ্বর, তাঁকে ভুলে শুধু প্রতিমা পূজা করলে তা প্রকৃতই পৌত্তলিকতা হবে।

প্রতিমা পূজার প্রয়োজনীয়তা কেবল সাধকানাং হিতার্থায়, "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ, সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" প্রত্যেকটি রূপই রূপক (Symbolical) এবং তার পিছনে আছেন অনির্বচনীয় অপরূপ, যিনি সীমার মাঝে অসীম, তাই সাধক রূপ-সাগরে ডুব দেন, অরূপরতন লাভের আশা ক'রে।

স্বভাবতঃ আমরা চোখ বুজলেই দেখি অন্ধকার, আমাদের মানসিক শক্তি সীমিত এবং সঙ্কীর্ণ তাই ভক্ত সব সময়েই মনে রাখেন, 'ন তস্য প্রতিমা লোকে যস্য নাম মহদ্ যশঃ'—"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা, মন্দির তব কি গড়িব মা গো মন্দির যার অনন্ত নীলিমা।" (দ্বিজেন্দ্রলাল)

যুগল উপাসনা ও অদ্বৈতবাদ ঃ

একটা দর্শন শাস্ত্রের কথা হয়তো কারও কারও মনে সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। বেদে যাঁকে বারংবার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলা হয়েছে তাঁকে যুগপৎ ঈশ্বর-ঈশ্বরী, অর্ধনারীশ্বররূপে কল্পনা করলে কি অদ্বৈতবাদের বিরোধাচরণ করা হবে? উত্তরে বলা যায়, না, তাতে অদ্বৈতবাদে কোনো দোষ স্পর্শ করবে না। পুরুষ এবং প্রকৃতি দুইয়ে মিলে এক। "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চাপি বিদ্ধ্যানাদী উভাবপি, বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।" গীতা (১৩।১৯) শ্রুতিও বলেন 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্'।

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রকৃতিই শক্তি, পুরুষ শক্তিমান। অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি, দুধ ও তার ধবলতা, তুষার এবং তার শৈত্য,—যেমন অপৃথক্ তেমনি শক্তি ও শক্তিমান দুইয়ে সম্মিলিতভাবে এবং অবিচ্ছেদ্য ভাবে এক।

গণিতের ভাষায় যেমন ১ × ১ = ১—এটা ১ + ১ = ২ নয় এটা গুণের কথা, শক্তির কথা। দ্রব্য ও গুণ, matter ও energy; গুণী ও গুণ যেমন ওতপ্রোত ভাবে একত্র থাকে অধ্যাত্মজগতে ঐশী ধ্যান-ধারণাতেও এইরূপ উপলব্ধি করা যায়। তবে এই এক কি প্রকারে দুই রূপে এবং অসীম অসংখ্যরূপে প্রতিভাত হয়ে লীলা করেন তা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হবে।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব—বিষ্ণু যাঁর দেবতা তিনিই বৈষ্ণব। এই বিষ্ণু শব্দটি ব্রহ্মেরই বাচক শব্দ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আছে "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে স ত্রিধা নিদধে পদম্"। এর ব্যুৎপত্তি নানাবিধ। বিশ্ ধাতু প্রবেশার্থে,—তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ—তিনি বিশ্বসৃষ্টি করে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হলেন—ওতপ্রোতরূপে পরিব্যাপ্ত হলেন, তাই তিনি বিষ্ণু। আকাশ তাঁর পরমপদ,—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। এবং "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদোঽস্যামৃতং দিবি" তাঁর এক চতুর্থ ভাগমাত্র সৃষ্টিতে ব্যক্ত বা প্রকাশিত, অপর বৃহত্তর অংশ অব্যক্ত—"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।"

অপর অর্থে বিষ্ ধাতু সেচনার্থক অর্থাৎ বেষতি—সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বম্। এখানে এই অর্থেই কাব্যের সঙ্গে দর্শনের মিলন। আলঙ্কারিক বলেন, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ এবং সে 'রস'—'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।" ঐ অর্থে বিষ্ণুই রসস্বরূপ, তিনি বিশ্বকে রসে রসায়িত অভিসিঞ্চিত করেন—

রসঃ সারোঽমৃতং ব্রহ্ম আনন্দোহ্লাদ উচ্যতে
নিঃসারং তেন সারেণ সারবৎ লক্ষ্যতে জগৎ।

জগৎটা যেন নিঃসার আখের ছিবড়ের মতো,—আর বিষ্ণু বা মধু ব্রহ্মই সেই নিঃসার জগতের মধ্যে রস সঞ্চার ক'রে আখের মতই রসিয়ে তুলেছেন।

অপর অর্থে বেবেষ্টি বা ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ অর্থাৎ যিনি বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম বা বাসুদেব হয়ে আছেন—তাই তিনি "বিশ্বমূর্ধা বিশ্বভুজঃ বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ"—অপর অর্থে বিষ্ণাতি (ক্র্যাদি-গণীয় ধাতু) (যার অর্থ 'বিযুনক্তি' পৃথক্করণ) বিযুনক্তি ভক্তান্ মায়াপসারণেন সংসারাদিতি বা, অর্থাৎ ভক্ত-চিত্তের মায়া অপসারণ ক'রে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করেন,—"তাই মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

তারক ব্রহ্ম নাম—এই মহামন্ত্রে তিনি 'হরে কৃষ্ণ রাম' নামে সম্বোধিত। তিনি 'হরি' যেহেতু তিনি সকল পাপ, সকল মলিনতা হরণ ক'রে ভক্তের মন হরণ করেন। তিনি 'কৃষ্ণ' যেহেতু তিনি ভক্ত চিত্ত আকর্ষণ করেন, বাঁশীর গানে—যে ডাক শুনে ভক্ত সাড়া দেন—'যাইগো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে,'—বলেন 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে?' তিনি 'রাম' যেহেতু তিনি আত্মারাম, আত্মায় রমণ করেন,—তাই মনোঽভিরামং বচোঽভিরাম, সদাভিরামং সততাভিরামং রূপে তিনি বর্ণিত।

'হরে' শব্দের আর একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। হরি শব্দের সম্বোধনে যে 'হরে' তার অর্থ বলা হয়েছে। কিন্তু 'হরের্মনোহরা রাধা' এই অর্থে 'হরা' অর্থে শ্রীরাধা এবং 'হরে' অর্থে 'রাধে'। কাজেই

'হরে কৃষ্ণ' অর্থে 'রাধে কৃষ্ণ' এবং রাম তাঁদের মিলিত যুগল মূর্তি। তাই ভাগবত বলেন, "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ।' যাঁরা ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা আত্মারাম মুনি তাঁরাও এই মিলিত যুগলের অনির্বচনীয় গুণে আকৃষ্ট হন,—অহৈতুকী ভক্তির আকর্ষণে। নাম ও নামী—

দেহ-দেহী নাম-নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ
জীবের ধর্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ।

কারণ,— নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধোনিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

—পদ্ম পুরাণ

শ্রীভাগবত বলেন

শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনু। ভা ৬।১৬।৫১

অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয়ই আমার নিত্য শরীর। প্রণব বীজ মন্ত্র, হরে কৃষ্ণ রামাদি নাম প্রভৃতি শব্দ সংকেত ব্রহ্মবাচক নাম—শব্দ ব্রহ্ম এবং তা পরব্রহ্মেরই স্বরূপ।

বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত ভাষ্য বা শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ এবং শঙ্কর দর্শন ঃ

এ বিষয়ে দু'চারটি কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁর বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ স্থাপন করতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে বলেছেন, "শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ, ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ ।।" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎটা মিথ্যা স্বপ্ন,—বস্তুতঃ নাই, আছে মনে হচ্ছে মাত্র। যেমন দড়ি দেখে সাপ ভ্রম হয় অথবা শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, মরু-মরীচিকায় জল ভ্রম হয়। এই জগৎ মিথ্যাবাদ শ্রীরামানুজ খণ্ডন করেছেন, মহাপ্রভু একে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলেছেন এবং এর পরিবর্তে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্থাপন করেছেন।

এই স্বপ্নবাদ বা বিবর্তবাদ—ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ কেহই গ্রহণ করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ শাঁস, বীচি, আঠা খোলা সহ সমগ্র বেলটিকেই জগৎ-এর প্রতিভূ স্বীকার ক'রে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদই গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বয়ং জগতের উপাদান, কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দুইই—তিনিই মৃত্তিকা তিনিই কুম্ভকার। "হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো ন হি ভিন্নতনুঃ।"

রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে, (১৩০২ অগ্রহায়ণ, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪০ দ্রষ্টব্য) দ্বৈতাদ্বৈত মতকে বৈষ্ণব ধর্মমত বলে প্রকাশ করেন (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৮)।

এ বিষয়ে আমার 'বৈষ্ণব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৬৩) আমি বিস্তারিত ভাবে লিখেছি। এখানে কবির 'আত্মপরিচয়' থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—

"আমার রচনার মধ্যে যদি কোনও ধর্মতত্ত্ব থাকে ত সে হচ্ছে এই যে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই সে ধর্ম্মবোধ।

যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর একদিকে অদ্বৈত একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন—একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে।

যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য ভাবে গ্রহণ করে। যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে মানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।"

কবির উদ্ধৃত বাক্য থেকে দেখা যাবে এ যেন শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের আক্ষরিক অনুবাদ। "ভেদং চিন্তয়িতুং অশক্যত্বাদভেদঃ, অভেদং চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদঃ।" এই তত্ত্ব অচিন্ত্য এবং অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয়তা শঙ্করও স্বীকার করেছেন—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ—তবু তাঁর কল্পনার ঘুড়ির এক কানাচে ঝোঁক থাকায় একদিকেই অর্থাৎ বিবর্তবাদ-সমন্বিত নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের দিকেই ঢলে পড়েছে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রামাণ্য সম্বন্ধে শঙ্কর নিজেই বলেছেন—'নহি শ্রুতি শতমপি অগ্নিরনুষ্ণ ইতি ব্রুবন্ প্রামাণ্যমুপৈতি।' অথচ নিজেই সেই প্রত্যক্ষ জগৎকে—"মায়াকল্পিত দেশ-কাল-কল্পনা বৈচিত্র্য-চিত্রীকৃতং" বলে বলেছেন—"ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্ন-বিকারম্।" এই অলীক স্বপ্নবাদের জন্য শঙ্কর-ভাষ্য-সমন্বিত বেদান্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বর্জন করেছিলেন।

উভয়লিঙ্গ ব্রহ্ম—ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ যুগপৎ সবিশেষ-নির্বিশেষাত্মক। বেদান্ত দর্শনে (৩।২।১১) সূত্র আছে 'ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্বত্রহি'। শঙ্কর স্বীকার করেছেন—

সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ।

শ্রুতি বলেন,—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চ অমূর্তঞ্চ"

(১) সর্ব-কর্মা সর্বকামঃ সর্ব-গন্ধঃ সর্ব-রসঃ (ছাঃ ২।১০।২) এবং ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ এবং (২) অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং (বৃহঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদ্যাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ।

কিন্তু শঙ্কর গায়ের জোরে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, নির্বিশেষ স্বরূপই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ; *উপাধি যোগে তাঁহাকে সবিশেষ বলে ভ্রম হয়। পরবর্তী বৈদান্তিকগণ ভ্রমটা শঙ্করেরই বলেছেন,* কারণ শ্রুতি-সিদ্ধান্ত যে উভয়লিঙ্গ ব্রহ্ম তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

রামানুজ আর একদিক থেকে ব্রহ্মকে উভয়লিঙ্গ প্রতিপাদন করেছেন—ব্রহ্ম একদিকে সর্ববিধ দোষ পাপ মলিনতা হতে মুক্ত,—অপহত পাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকো-বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ (ছা-৮।১।৫) অন্যদিকে ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণ গুণের আকর,—'সমস্ত কল্যাণ-গুণাত্মকোঽসৌ'। (বিষ্ণুপুরাণ)

নারীশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন, ১। ত্বংস্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ২। স একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ, সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ, এবং অতঃপর ৩। স এতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। (বৃহঃ ১।৪।৩)

রাধা-তত্ত্ব সম্বন্ধে পুরাণ বলেন, মমার্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।

*বৈষ্ণবের প্রেম—বিশ্বমানবতার প্রেম, ভূমার প্রেম—*One world spiritually aware and psychologically integrated. শ্রীভাগবতও উত্তম ভক্তের লক্ষণে বলেছেন ঠিক এই কথাই,

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন, তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ এবং অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।
(বৃহঃ ৪।৩।২০-২১)

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি
"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ
মনোবৃত্তিলুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি তথা।"

এবং গীতগোবিন্দে 'মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা' অথবা "না সো রমণ না হাম রমণী দু'হুমন মনোভব পেষল জানি" (চৈতন্য-চরিতামৃত)—এ সমস্তই মধুর জীবাত্মপরমাত্মা মিলনের বা অধ্যাত্ম শৃঙ্গারের পরমানুভূতির পরাকাষ্ঠা।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর Theosophical Gleanings-এ 'God as Love' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, শ্রীরাধাই মহাভাবের অতিঘ্নী বা acme, তিনি মহাভাবময়ী—

Radha is the prototype of all lovers of God, male or female, only Her love is human love raised to the nth, power.

বৈষ্ণব সাধনায় পাঁচ রকম ভাবের সাধনা বা সাধন-ভক্তি প্রচলিত,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

শান্ত সাধনায় সেই অদ্বয়-তত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপ, পরমাত্ম-স্বরূপ। যাঁহার সাধনা হয় ভজন-ধ্যান-যোগাদি সাধনায় অর্থাৎ অভ্যাস-যোগে। যাঁকে 'বদন্তি তং তত্ত্ববিদঃ',—যিনি 'তৎ' শব্দের বাচ্য। বাকী চার মার্গেই তিনি ঐশ্বর্য-মাধুর্যময় ভগবৎ-স্বরূপ পুরুষোত্তম। কিন্তু এই চার মার্গেই তাঁর ঐশ্বর্যগুণ ভক্তের নিকট গৌণ, তিনি প্রাণাৎ প্রিয়তরঃ বলেই মুখ্যতঃ গণ্য। তিনি মধুর হতেও সুমধুর, তিনি স্নেহময়, করুণাময়, প্রেমময়। Dulce Amore বা Sweetest Love. ভক্ত যখন রাগমার্গে প্রবেশ করেন,—ব্রজভূমিতে প্রবিষ্ট হন,—তখন তাঁর ভক্তি বা devotion প্রেম (love) রূপে পরিণত হয়। এ বিষয়ে চরিতামৃতের উদ্ধৃতি দিয়েই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত, ঐশ্বর্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন, তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি, এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি।
আপনারে বড় মানে আমারে-সম হীন, সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন, অতিহীন জ্ঞানে করে লালন-পালন,
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ, তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন, বেদস্তুতি হৈতে তায় হরে মোর মন ॥

এ প্রবন্ধের শুরু আছে শেষ নাই, তাই অলমতি বিস্তরেণ বলে আমার ভাষণ এখানেই শেষ করি —সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

রাজহাটী বন্দরে বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে প্রবন্ধ-শাখার সভাপতির ভাষণ

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

(১৮০৯—১৮৩১)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ডিরোজিওর জন্ম হয়েছিল কলকাতায় মৌলালির দরগার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত এক অবস্থাপন্ন পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে। বঙ্গে তথা ভারতে নবযুগ আনয়নে তাঁর দান অপরিসীম, তাই আমরা তাঁকে এখনও ভুলতে পারিনি। জনশিক্ষা সমিতির একটি বিবরণে কার সাহেব বলেছেন—"The master spirit of this new era was Mr. Derozio." [১]

তাঁর জন্মতারিখ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত থাকলেও উপরোক্ত তারিখটি সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ এবং সঠিক। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে হার্বার্ট এ ষ্টার্ক ও ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সুপারিনটেন্ডেন্ট) "East Indian Worthies" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাতে H. L. V. Derozio ("Bengal's Bard") শীর্ষক একটি ছোট্ট রচনা আছে; ডিরোজিও সম্বন্ধে ম্যাজের পরবর্তী লেখা বই—"Henry Derozio, the Eurasian poet and reformer" (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ) পড়ে মনে হয় উল্লিখিত ছোট্ট রচনাটি এই পুস্তকের পূর্ব-প্রস্তুতিরূপে রচিত হয়েছিল। এতে ডিরোজিওর জন্ম তারিখ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ ১৮ই এপ্রিল লেখার নীচে একটি পাদটীকায় তিনি লিখেছেন—"Vide Bengal Directory for 1810 (list of births during previous year)" [২] ইহা ডিরোজিওর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। ম্যাজ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বেঙ্গল ডাইরেক্টরি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। আমি এখন এই লাইব্রেরিতে (যা এখন ন্যাশনাল লাইব্রেরি নামে অভিহিত) এই বহু পুরাতন বেঙ্গল ডাইরেক্টরিটির অস্তিত্ব দেখতে পেলাম না। এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও আমি এর অস্তিত্বের খোঁজ পেলাম না। তবে ম্যাজের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর (সোমবার) অর্থাৎ ডিরোজিওর মৃত্যুর তারিখে সন্ধ্যায় কলকাতা গেজেটে নিম্নরূপ প্রকাশিত হয়েছিল—

"Deaths

* * * * *

"At Calcutta, on the 26th December, Henry Louis Vivian Derozio, Esq., aged 23 years 8 months and 8 days" [৩]

ডিরোজিওর মৃত্যু সম্বন্ধে উপরিউক্ত তারিখ সবচেয়ে প্রামাণ্য ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু মৃত্যুকালে যদি তাঁর বয়স ২৩ বৎসর ৮ মাস ৮ দিন হয় তবে তাঁর জন্ম তারিখ হয় ১৮০৮

খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল। কিন্তু ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ডাইরেক্টরিতে প্রদত্ত তারিখটিই অধিকতর প্রামাণ্য এবং সেটি গ্রহণ না করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। কলকাতা গেজেটে ডিরোজিওর জন্ম বছর ও তারিখের কোন উল্লেখ নেই, কাজেই কিভাবে ঠিক করা হল মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ২৩ বছর ৮ মাস ৮ দিন তাও বোঝা যায় না। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ডিরোজিওর জন্ম হয়েছিল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত "Henry Louis Vivian Derozio" শীর্ষক[৪] একটি রচনাতে ডিরোজিওর জন্ম ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল উল্লিখিত হবার পরে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের Bengal Obituary-তে এই তারিখই গ্রহণ করেছে,[৫] কিন্তু তারিখটি যে ঠিক নয় তা বোঝা যাচ্ছে। ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ড'ও এই জন্ম-তারিখ গ্রহণ করে ভুল করেছেন।[৮]

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট সেণ্ট জন্‌স্ (ওল্ড্) ক্যাথিড্রাল-এ ডিরোজিওকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

ছয় বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষারম্ভ হয় ধর্মতলা স্ট্রীট-এ অবস্থিত ডেভিড ড্রামণ্ড-এর ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে। এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির—ইউরোপীয়, ইউরেসিয়ান এবং এ-দেশীয়—ছেলেদের একত্রে পড়াশুনা ও মেলামেশার সুযোগ ও উন্নতমানের শিক্ষাদান প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষায় বিশেষ অনুরাগী ও উদারভাবাপন্ন অভিভাবকগণ তাঁদের ছেলেদের এখানে ভর্তি করতেন। ড্রামণ্ড ছিলেন একদিকে সুশিক্ষিত, কবি ও লেখক এবং অপর দিকে সত্যসন্ধানী ও যুক্তিবাদী। এডওয়ার্ডস্ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "He would believe nothing, accept nothing, unless it could be made as evident and reasonable as a mathematical axiom. Tradition and antiquity were to him no authority,......"[৮] কাব্য, ইতিহাস ও দর্শন ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। স্কটলণ্ডের জাতীয় কবি রবার্ট বার্নস্-এর কাব্যে এবং ডেভিড হিউমের দর্শনে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর মন ছিল সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এবং ছাত্রদের তিনি মনে-প্রাণে ভালবাসতেন ও তাদের প্রকৃত শিক্ষাদানের জন্য সতত সচেষ্ট থাকতেন। বলা বাহুল্য, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। আমরা ডিরোজিওর কথা ভাবলে দেখতে পাই এই গুরুর শিক্ষায় তিনি কি রকম প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাব্য, ইতিহাস ও দর্শনে তিনি সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন, এবং স্বদেশ-প্রেমও তাঁর মধ্যে প্রচুর সঞ্চারিত হয়েছিল। হিউমের মানবতাবাদের প্রভাব তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল এবং তিনিও গড়ে উঠলেন সত্যসন্ধানী ও যুক্তিবাদী রূপে। বাল্যকাল থেকেই তাঁর খ্যাতি ছিল অসাধারণ মেধার জন্য, পাঠ ও আবৃত্তিতে কৃতিত্বের জন্য তিনি যথাযথভাবে পুরস্কৃতও হয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি যে নব্যবঙ্গের নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন তার ভিত্তি সুন্দরভাবে এখানে অনেকটা তৈরী হয়েছিল সন্দেহ নেই।

বিদ্যালয়ে তাঁর আচরণ ছিল মধুর ও চিত্তাকর্ষক, ফলে ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন। খেলাধূলা ও সন্তরণেও তিনি ছিলেন পারদর্শী এবং ডি-সুজা, চার্লস পোর্ট ও উইলিয়াম কার্কপেট্রিক প্রভৃতি সঙ্গীর সঙ্গে তিনি শরৎকালে ময়দানে ক্রিকেট খেলতে ও বামন

বস্তির বড় পুষ্করিণীতে গ্রীষ্মকালে সন্তরণ করতে যেতেন। ৯ তাঁদের সঙ্গে তিনি আবার বিদ্যালয়ে থিয়েটারে অভিনয় করেছেন এবং চৌদ্দ বছর বয়সে একটি অভিনয় আরম্ভের পূর্বে প্রস্তাবনা (prologue) সুন্দর স্বরচিত কবিতায় পাঠ করে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। ১০

উপরোক্ত বয়সে ধর্মতলা অ্যাকাডেমির শেষ পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জে স্কট এণ্ড কোম্পানী নামে একটি সওদাগরি আফিসে করণিকের কাজে প্রবৃত্ত হন। ১১ এখানে তাঁর পিতা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এ কাজ তার মনঃপূত হয়নি এবং কিছুদিন পরে এ কাজ পরিত্যাগ করে তিনি যান ভাগলপুরে আর্থার জনসনের তারাপুর নীলকুঠীতে। ইনি আত্মীয়তায় একদিকে ডিরোজিওর মাতুল ও অন্য দিকে পিসাও ছিলেন। তিনি (ডিরোজিও) এখানে জনসনের অধীনে কাজ করতে আরম্ভ করেন। এতদিন তিনি কাটিয়েছিলেন কলকাতা শহরে, এবার তিনি ভাগলপুরে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন পল্লীজীবনের। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও সৌন্দর্যের আস্বাদ তিনি পেলেন এখানে। শ্যামল শস্যক্ষেত্র, ফলেফুলে সুশোভিত তরুশ্রেণী, পাখীর সুমিষ্ট গান, নদীর কুলকুল রব ও গ্রাম্য লোকজনের সহজ ও সরল জীবন এবং আনাগোনা তাঁর কিশোর মনকে অনুপ্রাণিত করে কাব্য রচনায়। Edwards বলেছেন, "It was here at Bhaugulpore that Derozio realized what is to love and to be loved." শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "ভাগলপুর থাকার সময়ে তিনি একাকী গঙ্গার তীরে বেড়াতেন এবং কবিতা রচনা করতেন। তা ছাড়া "তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা এমনই প্রবল ছিল যে, সেই অল্প বয়সে ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমুদয় গ্রন্থাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।"১৩

ভাগলপুর থেকে তিনি ডঃ জন গ্রাণ্ট সম্পাদিত "ইণ্ডিয়া গেজেট" পত্রিকায় Juvenis ছদ্মনামে তাঁর রচিত ইংরেজী কবিতা প্রকাশের জন্য পাঠাতে লাগলেন এবং ডঃ গ্রাণ্ট গুণগত বিচারে এগুলি তাঁর পত্রিকায় ছাপাতে থাকেন। পূর্বেই গ্রাণ্ট তাঁর আবৃত্তি শুনে ও অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবার তাঁর এরূপ কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে আরও খুসী হলেন। তিনি ডিরোজিওকে খুব ভালবাসতেন। তাঁদের মধ্যে সময়ে সময়ে মতদ্বৈধতা হলেও একে অপরকে সম্মান করে চলতেন। Oriental Magazine এ লিখেছে, "He (Grant) rocked the cradle of his (Derozio's) genius and followed his heart to the grave."১৪ এমনকি ডিরোজিওর শেষ রোগশয্যায়ও তিনি অনবরত উপস্থিত থাকতেন।

ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদকের নিকট হতে উৎসাহ পেয়ে ডিরোজিও তাঁর কবিতাগুলি সঙ্কলন করে "Poems" নাম দিয়ে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করলেন এবং সেটি কেবল এদেশে নয় লণ্ডনেও কোন কোন মহলে প্রশংসা লাভ করেছিল। এই কাব্যগ্রন্থটিতে ছিল ৪৭টি কবিতা এবং এটি ডঃ গ্রাণ্টের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮২৮ সনে। এটির নাম দেওয়া হয়েছিল—"The Fakeer of Jungheera, A metrical Tale and other Poems",—এটি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল ডঃ হোরেস হেমান উইলসনের নামে।১৫

ডিরোজিও কতদিন ভাগলপুরে ছিলেন তা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও এডওয়ার্ডস তাঁর একটি মূল্যবান কথার উল্লেখ করছেন, এই,—"Although I once lived nearly three

years in the vicinity of Jungheera, I had but one opportunity of seeing that beautiful and truly romantic spot."[১৬] কাজেই প্রায় তিন বৎসর তিনি (ডিরোজিও) এখানে ছিলেন এবং কাব্যশক্তির বিকাশ তাঁর এখানেই হয়েছিল। তাঁর কাব্যে বায়রণ, মুর ও এল্, ই, ল্যাণ্ডরের প্রভাব খুব বেশী ; ম্যাজ বলেছেন, "The brilliant hues of the Byronic sunset flung their glow over Derozio's sky. His style has been termed the echo of Byron, Moore and L.E. Landor. But these were the literary idols oft he day,......"[১৭]। টমাস মূরের স্বদেশপ্রেমের কবিতাএবং স্বাধীনতা-পূজারী বায়রণের স্বাধীন চিন্তা-ধারা ডিরোজিওকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকতেও পারে। তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এ দেশকেই মাতৃভূমিরূপে জ্ঞান করেছেন। নবযুগের প্রথম দিকে পরাধীন ভারতে তিনিই প্রথম স্বাধীনতার সুর তাঁর কাব্য-বীণায় ঝংকৃত করেছেন এবং স্বদেশের জন্য দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যের একটা প্রধান সুর "অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে।" এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কবিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়—"The Harp of India," "To India, my native land", "Freedom to the Slave", "On the abolition of Suttee" প্রভৃতি।

তাঁর রচিত "ফকির অফ্ জাঙ্গিরা" কাব্যের প্রথমে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতাটিতে দেশের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালবাসা কি সুন্দরভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা কয়েক পঙক্তি পাঠেই বোঝা যায়—

"My country ! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory, where that reverence now ?"

সতীদাহ প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ হবার পরে তিনি যে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন তাতে নিম্নের কয়েকটি পঙক্তিতে বিধবাদের প্রতি তাঁর সমবেদনা ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা বেশ ফুটে উঠেছে—

"Hark ! heard ye not ? the widow's wail is over :
No more the flames from impious pyres ascend,

Back to its cavern ebbs the tide of crime,
There fettered, locked, and powerless, it sleeps."[১৮].

"The Fakir of Jungheera" তাঁর সবচেয়ে বড় কাব্য। তিনি বলেছেন যে নদীর অপর তীর থেকে তিনি জাঙ্গিরা পাহাড় দেখেছিলেন এবং সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কিছু পরিচয় পেয়ে এবং ফকিরের চরিত্রের দ্বৈত-ভূমিকার কথা শুনে তিনি এই কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। ঐ স্থানটি যে প্রেম ও অস্ত্রসজ্জা দুইয়েরই উপযোগী তাও তাঁর মনে উদিত হয়েছিল।[১৯] সামান্য বিষয়বস্তু অবলম্বন করে ভাষার মাধুর্যে, প্রকৃতির মনোরম বর্ণনায় ও গভীর সহানুভূতি ও মানবতা-বোধের দ্বারা তিনি নিখুঁত চিত্র কাব্যে অঙ্কিত করেছেন ; সতীদাহের করুণ বর্ণনাও এখানে আছে।

বিষয়বস্তু এরূপ—নলিনী নামে একজন অল্প-বয়স্কা বিধবাকে সহমরণ হতে উদ্ধার করে তার পূর্ব-প্রণয়ী জাঙ্গিরার ফকির, কিন্তু সে দস্যুদলের নেতা, দস্যু-জীবন শেষবারের মত পরিত্যাগ করার পূর্বে সে একটি ঘটনায় আহত ও নিহত হয় এবং দেখা গেল মৃত দস্যুর বাহুপাশে আবদ্ধ অবস্থায় মৃতা নলিনীও।

ডিরোজিওর কবি-প্রতিভা রোমান্টিক হলেও তা অসংযত নয়। কেউ কেউ তাঁর কবিতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনা করলেও তাঁর যে নিজস্ব কবিত্ব-শক্তি ছিল এবং পরিণত বয়সে তা আরও বিকশিত হত সেকথা অনেকে স্বীকার করেন।

ডিরোজিওর মৃত্যুর কয়েক দিন পরে কলকাতা গেজেটে তাঁর কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে—
"They evinced a vigour of thought, an originality of conception, a play of fancy, and a delicacy of tone,······the Fakeer of Jungheera······gave still further proofs of genius, and evinced an extraordinary command of language, and an acute perception of the beauties of Nature······"[২০]

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন ১ মে, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে। এ সংবাদ আমরা পাই ১৩ মে ১৮২৬, ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩-এর সমাচার দর্পণে। সেখানে আছে—"২০ বৈশাখ সোমবার (১ মে) সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দু কলেজ বিদ্যালয় ঐ বাটিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।······ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুইজন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন······"[২১]। ঐ দিনই হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ নূতন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়।

ডিরোজিও নিযুক্ত হন চতুর্থ শিক্ষক পদে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের জন্য। ম্যাজ লিখেছেন তিনি এই বছর (১৮২৬) ডঃ গ্রান্টের প্রভাবে ইণ্ডিয়া গেজেটের সহকারী সম্পাদক ও নভেম্বরে (ঐ বছরই) হিন্দু কলেজে চতুর্থ শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। আবার এডওয়ার্ডস লিখেছেন ১৮২৮-এর মার্চ মাসে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে উপরি উক্ত পদ পেয়েছেন। কিন্তু ম্যাজ ভুল করেছেন মাস সম্বন্ধে এবং এডওয়ার্ডস বছর ও মাস সম্বন্ধেও।[২২] তা আমরা উপরি উক্ত সমাচার দর্পণের সংবাদে বুঝতে পারি।

শিবনাথ শাস্ত্রী ডিরোজিও সম্বন্ধে লিখেছেন, "বঙ্গের নবযুগ প্রবর্ত্তক······অসাধারণ প্রতিভাশালী শিক্ষক।"[২৩] যেমন কবি ও সাহিত্যিকরূপে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন শিক্ষকরূপেও তিনি তেমনি সাফল্য-মণ্ডিত হন। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ও অমায়িক ব্যবহার ছাত্রদের আকৃষ্ট করে এবং তারা তাঁকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্যও কম ছিল। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তিনিও তেমনি ছাত্রদের আকৃষ্ট করলেন এবং তিনি যে শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতেন তা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর অনেক ছাত্রও তাঁর নিকটে এসে তাঁর পাঠনা শুনতে ভালবাসত। দার্শনিকের মন নিয়ে তিনি ইতিহাস পড়াতেন, অধিকন্তু যে কোন বিষয়ে চিত্তাকর্ষকভাবে তাঁর পড়াবার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় জ্ঞানদানের তিনি ছিলেন মহান গুরু। দর্শন শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ; হিউম, বেকন, লক, রীড এবং স্টুয়ার্ট প্রভৃতির রচনার সঙ্গে তিনি ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিতেন অতি সুন্দরভাবে। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী এবং সত্যসন্ধানী। ছাত্রদের

মধ্যে নীতিবোধ জাগাবার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করতেন। এডওয়ার্ডস্-এর মতে ঃ "The moral teaching of Derozio was as high and pure as his own life was blameless."[২৪] তাঁর নিজের নীতিবোধ, আদর্শ চরিত্র ও সত্যের প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠায় ছেলেরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কলেজের তৎকালীন অশিক্ষক কর্মচারী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "The College boy was a synonym for truth,"[২৫] ছেলেরা কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারেনা, কারণ তারা যে কলেজের ছাত্র।

তাঁর শিক্ষা পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নিবদ্ধ থাকত না, যাতে ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা-শক্তির বিকাশ হয় সে দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন "স্কুলের ছুটী হইয়া গেলেও তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিতেন ; এবং নানা বিষয়ে তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে, তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে অপর পক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন, এবং স্বাধীনভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে দিতেন।"[২৬] ডিরোজিও-র ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্রের মতে শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই—সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয়—সমস্ত বিষয়ে অবাধ আলোচনার প্রেরণা দিতেন। হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল ছাত্রেরা প্রায়ই মধ্যাহ্ন বিরামের সময়ে, কলেজের ছুটির পর এবং তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গলাভের জন্য উৎসুক হত।[২৭] এডওয়ার্ড বলেছেন, "তাঁর পূর্বে বা পরে কোন শিক্ষক ভারতের কোন বিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্রদের উপরে তাঁর মত এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।[২৮] ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপ আশান্বিত ছিলেন তা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন একটি চতুর্দশপদী কবিতাতে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ফুলের পাপড়ির মত তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি প্রস্ফুটিত হবে, তখন তিনি অনুভব করবেন তাঁর জীবন বৃথা হয়নি।

ডেভিড হেয়ার ও ডঃ উইলসনের তাঁর শিক্ষাদান সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা ছিল এবং উভয়েই তাঁকে অত্যন্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষকরূপে পরিগণিত করতেন। ডিরোজিওর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। জার্মানীর বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্টের "A critique of pure reason" নামক গ্রন্থের তিনি যে বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা বের করেন তাতে অনেকেই বিস্মিত হন তাঁর "প্রখর ধীশক্তি ও স্বাধীন চিন্তার" পরিচয়ে, এমনকি বিশপস্ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল-ও এর জন্য তাঁর যথেষ্ট প্রসংশা করেছেন।

ছেলেদের স্বাধীন আলোচনা ও জ্ঞানস্পৃহায় উদগ্রীব থাকার ফলে সৃষ্টি হল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ১৮২৮ সনে। ডিরোজিও ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি। এখানে অদৃষ্টবাদ, প্রত্যয়, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, মানবসেবা, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, স্বদেশপ্রেম ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ছেলেরা তর্ক-বিতর্ক ও স্বাধীনভাবে আলোচনা করত। এর আদর্শে কলকাতার "ছাত্রসমাজে আরও সাতটি বিতর্কসভা স্থাপিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে ডিরোজিও যুক্ত হইয়া পড়েন।"[২৯] অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে রাজনৈতিক আলোচনাও হত। নব্য বঙ্গের ছাত্ররা টমাস পেইনের রচনা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করত এবং এমন কি তাঁর রচিত Age of Reason এক টাকা মূল্যের জায়গায় পাঁচ টাকা বা তার অতিরিক্ত মূল্য দিয়েও ক্রয় করেছে।

ডেভিড হেয়ারের অনুরোধে তাঁর পটলভাঙা স্কুলে ডিরোজিও কতকগুলি বক্তৃতা দেন। অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রভৃতি ত্যাগ করে যুক্তিনিষ্ঠ বিচার দ্বারা প্রত্যেকের জীবন পরিচালিত করতে তিনি উৎসাহিত করতেন। ফলে ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কারো কারো মদ্যপান, নিষিদ্ধ খাদ্য আহার ও সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ প্রাচীনপন্থীদের চিন্তিত করে তুলল। ডিরোজিওর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় ১৮৩০ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁর ছাত্ররা "পার্থেনন" নামে একটি ইংরেজী সমাচার-পত্র প্রকাশ করে কিন্তু সরকারের ও হিন্দু সমাজের কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকাতে এর দ্বিতীয় সংখ্যা বের হবার পূর্বে হিন্দু-কলেজের সহ-সভাপতি ডঃ উইলসনের আদেশে এটি বন্ধ হয়।

১৮৩০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি আদেশে হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের হিন্দুধর্মের ও সামাজিক রীতিনীতির আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয় এবং এই বৎসর সেপ্টেম্বরে ছাত্রদের উপরে আদেশ হয় তারা যেন কোন "রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সভা-সমিতিতে" যোগদান না করে।

ডিরোজিওর স্বদেশ-প্রেমের চেতনা ছেলেদের মধ্যে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তারা অবহিত ছিল, ১৮৩০ সনের ১০ই ডিসেম্বর দু'শত ব্যক্তি টাউন হলে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেয় এবং এই বৎসর বড়দিনে (Christmas Dayতে) কোন অজানা ব্যক্তি অক্টরলোনি মনুমেণ্টের উপরে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন করে।

ডিরোজিও ও ডিরোজিয়নদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসিত অপবাদও প্রচারিত হতে লাগল এবং প্রাচীনপন্থী নেতারা এসব শুনে শঙ্কিত হলেন। পুরাতন রীতিনীতি ভেঙ্গে ছেলেরা দ্রুত নূতন ব্যবস্থা গড়তে চেষ্টা করাতেও বিপদের ঝুঁকি তাদের বেশী নিতে হয়। সমস্ত বিষয়ে দায়ী করা হল শিক্ষক ডিরোজিওকে, কারণ তাঁর শিক্ষাতেই নাকি ছেলেরা এমন হয়েছে, অভিভাবকরা কেউ কেউ তাঁদের পুত্রদের কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে নিতে লাগলেন।

উপরোক্ত অবস্থায় ১৮৩১ সনের ২৩শে এপ্রিল অধ্যক্ষ-সভার একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ডিরোজিওকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উইলসন তাঁকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানালে তিনি উইলসনের মারফৎ অধ্যক্ষ-সভার কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন, এতে অন্যান্য কথার মধ্যে আছে, "You resolved to dismiss me unaccused, unexamined and unheard, without even the mockery of a trial." ৩০ এ চিঠির পরে ডিরোজিওকে লেখা উইলসনের চিঠি হতে বোঝা যায় কলেজের দেশীয় কর্মাধ্যক্ষগণ জনসাধারণের দাবির নিকট নতি স্বীকার করেছেন এবং কোন বিচারের ব্যবস্থা হয়নি।

ডিরোজিওর নৈতিক শিক্ষার ফলস্বরূপ যে কথার উল্লেখ রাজনারায়ণ বসু করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, তিনি লিখেছেন, "ডিরোজিওর শিষ্যদিগকে একটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহারা রাজকার্য্যে উৎকোচ গ্রহণ না করার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ৩১

এরপর ডিরোজিও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন থেকেও দূরে সরে গেলেন এবং ডেভিড হেয়ার এ-সভার সভাপতি হলেন কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এখন তাঁর প্রধান কাজ হল সংবাদপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনা। "হেস্‌পারাস" নামক একটি সান্ধ্য পত্রিকা

একদিন অন্তর একদিন তিনি প্রকাশ করেছিলেন এবং The East India নামে আর একটি দৈনিক পত্রিকা তিনি বের করলেন ১৮৩১ সনের ১ জুন থেকে। কার্যতঃ এটি কেবল ইউরেসীয় সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল না, এটি সমস্ত প্রগতিমূলক ও উন্নতিমূলক প্রচেষ্টার মুখপত্রও ছিল। এই পত্রিকাতে তাঁর শেষ লেখা বের হয় ১৭ই ডিসেম্বর, ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে ঐ দিনই প্রদত্ত বক্তৃতাটি। এই বিদ্যালয়ে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্ররা যে একত্র শিক্ষা পায় এবং এইরূপ শিক্ষা যে ভারতের পক্ষে সংহতি ও ঐক্যবোধ আনয়নে কিরূপ প্রয়োজন তা সুন্দরভাবে বিবৃত করা হয়েছে।[৩২]

হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েকদিন ভুগে ১৮৩১ সনের ২৬শে ডিসেম্বর সোমবার তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্যগণ, যেমন কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল ও মহেশচন্দ্র প্রভৃতি তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন, ডঃ গ্রান্টও তাঁর দেখাশুনা করতেন।[৩৩] ম্যাজের মতে ডিরোজিও-র সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন ডঃ জন গ্রান্ট, ডঃ উইলসন, ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায়।[৩৪] ডিরোজিও এবং রামমোহনের কর্মপন্থার পার্থক্য থাকলেও কতকগুলি বিষয়ে তাঁদের আদর্শগত মিল ছিল, যেমন মানবতাবাদ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমদৃষ্টি ও সতীদাহের জন্য দুঃখ-বেদনা প্রভৃতি। ডিরোজিও রামমোহনের মত সামাজিক সংস্কারে অগ্রসর হন নি, কিন্তু উভয়েই ছিলেন মানব-দরদী। "On the abolition of Suttee" শীর্ষক কবিতায় বেণ্টিঙ্ককে প্রশংসা করার পরে তিনি যাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সতীদাহের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল আন্দোলনের জন্য তাঁর নাম না দিলেও তিনি যে রামমোহন তা বোঝা যায়। এই কবিতার জন্য সতীদাহের পক্ষপাতী হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভার সভ্যদের মধ্যে রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেব তাঁর প্রতি বিরূপ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

নব্যবঙ্গ গঠনে বা এ-দেশে নবজাগরণ সৃষ্টিতে ডিরোজিওর কৃতিত্ব অসাধারণ। কার (Kerr) এক রিপোর্টে তাঁকে নব্য বঙ্গের 'oracle' আখ্যা দিয়েছেন।[৩৫] তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরে খ্যাতি অর্জন করেছেন, যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য চর্চ্চা ও সাংবাদিকতা প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্নভাবে অনেকে দেশ-সেবা করেছেন। হরচন্দ্র ও রসিককৃষ্ণের সততা, রামতনুর ধর্মনিষ্ঠা, রাধানাথের নির্ভীক তেজস্বিতা ও শিবচন্দ্রের নিঃস্বার্থভাবে প্রতিবেশীদের সেবা—এসব কেউ ভুলতে পারেনা। এ-সমস্ত ডিরোজিওর সুশিক্ষার অমূল্য দানেই সম্ভব হয়েছে। যেরূপ ভীষণ তৎপরতা প্রথম পর্যায়ে ডিরোজিয়ানদের ছিল তা পরে নানাকারণে মন্দীভূত হলেও অক্লান্ত পরিশ্রমে ও শুভ কামনায় শিক্ষার যে দীপশিখা ডিরোজিও প্রজ্বলিত করেছিলেন তার ছটা এখনও নিঃশেষ হয় নি, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পাদটীকা

১। Calcutta Review, Vol. XVII (1852), পৃঃ ৩৫২।
২। East Indian Worthies, Herbert A. Stark and E. Walter Madge, p. 16

৩। Selections from Calcutta Gazette, 1824-1832, p. 700, published by the Government of West Bengal.
৪। Article reprinted from the Oriental Magazine, Vol 1, No. 10, October, 1843, in "Henry Derozio", Madge, pp. 35-42.
৫। The Bengal Obituary (1848), p. 103
৬। Henry Derozio, Thomas Edwards, p. 2
৭। ম্যাজ, পৃঃ ৩।
৮। Henry Derozio, Thomas Edwards (1884), p. 19
৯। Ibid, p. 9
১০। বিদ্রোহী ডিরোজিও—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১৩৩-৩৪ ; Derozio—Edwards, p. 9
১১। Derozio—Edwards, p. 22.
১২। Ibid, p. 26.
১৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৮৪।
১৪। Oriental Magazine, Vol I. No. 10, October, 1843.
১৫। Selections from Calcutta Gazette, 1824-1832, p. 701, Henry Derozio—Edwards, pp. 27-28 ; Madge, p. 6, ডিরোজিও—যোগেশ চন্দ্র বাগল, পৃঃ ৪৮।
১৬। Derozio—Edwards, p. 23.
১৭। Derozio—Madge, p. 23
১৮। Selections from Calcutta Gazette, p. 430
১৯। Derozio—Edwards, pp. 23-24
২০। Selections from Calcutta Gazette pp. 700-701
২১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড,—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃঃ ২৮।
২২। Derozio—Edwards, p. 30, Madge, p. 6.
২৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৮৩।
২৪। Derozio—Edwards, p. 36
২৫। Ibid, p. 67
২৬। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৮৫।
২৭। David Hare—Peary Chand Mittra, p. 15
২৮। Derozio—Edwards, p, 30
২৯। ডিরোজিও—যোগেশ চন্দ্র বাগল, ভারতকোষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৬১।
৩০। Derozio—Edwards, pp. 72-80, ডিরোজিও, যোগেশ চন্দ্র বাগল, পৃঃ ৮৪-৮৮।
৩১। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ৩৫।
৩২। Derozio—Edwards, pp. 162-163.
৩৩। Ibid, p. 167
৩৪। East Indian Worthies—H. A. Stark and E. W Madge, p. 18
৩৫। Calcutta Review, Vol. XVII (1852), p 353

বসন্তরঞ্জন

শ্রীমদনমোহন কুমার

বসন্তরঞ্জনকে প্রণাম। বসন্তরঞ্জনের জন্মভূমি, তাঁর বাল্যকৈশোরের খেলাঘর, তাঁর যৌবনের উপবন, তাঁর বার্ধক্যের বারাণসী বেলিয়াতোড়কে প্রণাম। বেলিয়াতোড়ের সজ্জন ও সুধীবৃন্দকে প্রণাম।

আপনারা আজ অপরাহ্নে আমাকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন, যে গৌরব দিয়েছেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত। বাঙ্গলাদেশের প্রাচীনতম সারস্বত প্রতিষ্ঠান—বাঙ্গলার সকল সারস্বত সাধকের তীর্থভূমি—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপ এই সম্মান ও গৌরব আমি নতমস্তকে শিরোধার্য করলাম। আপনারা সকলে আমার বিনম্র নমস্কার গ্রহণ করুন।

তীর্থযাত্রীর মনোভাব নিয়ে আমি বেলিয়াতোড়ে এসেছি। অতি প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রাম এই বেলিয়াতোড়। এখানের লোকসংস্কৃতিতে, গ্রামদেবতার প্রাচীন বিগ্রহে, আষাঢ়ী পূর্ণিমার গাজনে, ধর্মের 'জাতে' প্রাচীন বাঙ্গলার অসংখ্য স্মৃতি। সেই সংস্কৃতিকে, সেই লোকজীবনের ঐতিহ্যকে আমি বঙ্গভাষা-প্রেমীরূপে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি।

এসিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় 'দেশাবলিবিবৃতি' নামে একখানি পুরাতন সংস্কৃত পুথি আছে। পুথিখানি অন্তত ৪০০ বছরের পুরানো। সেই পুথিতে আজ থেকে ৪০০ বছর আগের বাঙ্গলা দেশের নানা জনপদের নাম ও বর্ণনা আছে। বাঙ্গলাদেশের ভূগোল ও ইতিহাসের প্রাচীন তথ্য ঐ পুথিখানিতে ছড়িয়ে আছে। ঐ পুথিতে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের যে বর্ণনা আছে সেই প্রসঙ্গে ও'দা, গামিদ্যা, ছাতনা, সোনামুখী, বেলিয়াতোড় গ্রামের উল্লেখ রয়েছে। বেলিয়াতোড়ে বহু কায়স্থজাতির বাস এবং রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব এখানে বাস করেন বলে 'দেশাবলি-বিবৃতি'তে উল্লেখ আছে। গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব ছিলেন যশোহরের প্রতাপাদিত্যের বংশ-সম্ভূত। আকবরের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটলে যশোহর-রাজবংশের এক শাখা বিষ্ণুপুরে আশ্রয় নেন—পরে বিষ্ণুপুরের রাজার দেওয়ান হন। এই বংশের অনেকেই পুরুষানুক্রমে বিষ্ণুপুররাজের দেওয়ান হয়ে বিষ্ণুপুরের শাসনব্যবস্থায় ও উন্নতিতে অংশগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরে মন্দির তৈরি করে এঁরা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের একটি শাখা বেলিয়াতোড় গ্রাম জায়গীরস্বরূপ লাভ করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। বংশের গৃহদেবতা বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁরা দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমার পূর্ণ মূর্তি নির্মাণ না করে যশোরেশ্বরীর আদর্শে প্রতিমার মুখখানি মাত্র নির্মাণ করে অর্চনা করেন। এখনও এই গুহরায় বংশের 'বড়মেলা'য় প্রতিমার মুখমাত্র অর্চনা হয়। বসন্তরঞ্জন এই রাজবংশের—বিখ্যাত গুহরায় বংশের—সন্তান। বসন্তরঞ্জনের বাল্যকালে নাম ছিল প্রিয়বসন্ত।

বসন্তরঞ্জনের পিতামহ গোপালচরণ ছিলেন সুকণ্ঠ, কথকতায় তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ছিল। পিতামহের কাছ থেকে বসন্তরঞ্জন উত্তরাধিকারসূত্রে সংগীতপ্রিয়তা, পাঠানুরাগ এবং পুরাণ-কথকতার প্রতি আকর্ষণ লাভ করেন। গোপালচরণের পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যগ্রন্থের সংগ্রহ বসন্তরঞ্জনকে বাল্যকৈশোরেই প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভে সাহায্য করে।

গোপালচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ ছিলেন বসন্তরঞ্জনের পিতা, কনিষ্ঠ পুত্র রামতারণ ছিলেন শিল্পী যামিনীরঞ্জনের পিতা। গুহরায় বংশে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, প্রতিভাবান্ বহু পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন—তাঁদের মধ্যে দুটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হলেন দুটি ভাই বসন্তরঞ্জন ও যামিনীরঞ্জন। বাঙ্গলার প্রাচীন শিল্পকলার রূপ ও রসের দিকে আমাদের চোখ ফিরিয়ে দেন—সারা বিশ্বের চোখ খুলে দেন যামিনীরঞ্জন, বাঙ্গলার প্রাচীন পট রঙে রসে নিখিল বিশ্বের শিল্পকলায় আজ গৌরবময় আসন লাভ করেছে শিল্পী যামিনী রায়ের সাধনায়। আর বসন্তরঞ্জন বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য, আমাদের সর্বৈশ্বর্যময়ী বাঙ্গলা ভাষার হারিয়ে-যাওয়া রূপের পুনরুদ্ধার করে মাতৃভাষা-পূজায় যে অঞ্জলি দিয়েছেন তা বাঙ্গলাভাষা যতদিন থাকবে ততদিন বাঙ্গালী নতমস্তকে স্মরণ করবে ; তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি দান করবে।

জাতির সব চেয়ে বড় সম্পদ তার ভাষা। বাঙ্গলা ভাষার হাজার বছরের পুরানো ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া দুখানি ছিন্ন পাতা চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এই দুখানি বিলুপ্ত খণ্ডিত পুথি আবিষ্কার করে বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের সীমানা ৫০০ বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালী জাতি এই দুই মনীষী ও পণ্ডিতপ্রবরের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বসন্তরঞ্জনের জীবনকথা, বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁর বিচিত্র বহুমুখী সেবার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের কাছে অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত ছিল। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙ্গালী জাতির এই অবশ্যকরণীয় কর্তব্য সম্প্রতি পালন করেছেন, বসন্তরঞ্জনের জীবনের, সাহিত্যসেবার, ভাষাতত্ত্ব-আলোচনার বহু অজ্ঞাতপূর্ব কথা আবিষ্কার করে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—তাঁর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নূতন নবম সংস্করণে সংযোজিত ক'রেছেন। গত ১৯-এ ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বসন্তরঞ্জনের চিত্রপ্রতিষ্ঠা-উৎসবে, তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাদির, ব্যক্তিগত ব্যবহারের দ্রব্যসামগ্রীর, চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনী উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবম সংস্করণ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেছেন। আজ বেলিয়াতোড়-বাসীদের আয়োজিত বসন্তরঞ্জনের এই স্মরণসভায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি-স্বরূপ আমি পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবম সংস্করণের একখানি গ্রন্থ বসন্তরঞ্জন-সংস্কৃতি-পরিষদের সম্পাদকের হাতে বেলিয়াতোড়-বাসীদের উদ্দেশে অর্পণ করছি।

বসন্তরঞ্জনের নানা চিঠিপত্র, এবং তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি তাঁর স্বজন, পরিজন, আত্মীয় ও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাঁর জীবনী রচনার উপকরণ-স্বরূপ আমরা পেয়েছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের সকলকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করি।

আজ দ্বিপ্রহরে বেলিয়াতোড়ে পৌঁছে প্রথমেই বসন্তরঞ্জনের জন্মভিটা—রায়-পরিবারের এজমালি বাস্তুভিটা—দর্শন করতে গিয়েছিলাম। বসন্তরঞ্জনের প্রথম জীবন এই বাড়ীতে কাটলেও পরবর্তীকালে বেলিয়াতোড়ে তিনি নিজস্ব বাসগৃহ নির্মাণ করে সেখানে বাস করতেন। বসন্তরঞ্জনের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের বাসভূমি এই পুরাতন বাস্তুভিটা ঘুরে ঘুরে দেখার সময় তিনতলার চিলে-কোঠায় নানা অব্যবহার্য্য দ্রব্য, ঘুঁটে কাঠকয়লা গুলের ঝুড়ির অন্তরাল থেকে পুরাতন চিঠির দু'টি বাণ্ডিল ও জীর্ণ কাগজপত্র খুঁজে পেয়েছি। আজকের এই সভায় আসার পূর্বে অপরাহ্ণবেলায় সেই চিঠিগুলি পড়তে পড়তে বসন্তরঞ্জন সম্বন্ধে কিছু নোতুন তথ্য পেয়েছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালা'য় বসন্তরঞ্জন-চরিত এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি—বসন্তরঞ্জন-চরিত প্রকাশ করার সময় এই অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যগুলি কাজে লাগবে। বসন্তরঞ্জন সম্বন্ধে আপনাদের কারো কাছে কোনও কাগজপত্র, পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ থাকলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে সেগুলি দিয়ে সাহায্য করার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা জানিয়ে আজ চৈত্রপূর্ণিমার সন্ধ্যায়, এই জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে, বসন্তরঞ্জনকে ও তাঁর সুহাসিনী জন্মভূমিকে প্রণাম নিবেদন করি।

"নমঃ ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ
পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্‌ভ্যঃ।"

পূর্বজ ঋষিগণকে নমস্কার, পূর্বপথিকৃৎগণকে নমস্কার ।।

২৩শে চৈত্র ১৩৮০ (শনিবার ৬ই এপ্রিল ১৯৭৪) পুণ্যশ্লোক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে বসন্তরঞ্জন-সংস্কৃতি-পরিষদের আয়োজিত বসন্ত-উৎসবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদকের ভাষণ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক—লুই লিওটার্ড

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই (৮ই শ্রাবণ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ) কলিকাতার ২।২ সংখ্যাক রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্স্থ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের গৃহে ১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচর্' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চা, বিস্তার ও উন্নতি সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। সভার কার্যবিবরণাদি প্রথম হইতেই ইংরাজিতে লিখিত হইত। এই 'একাডেমি' প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে ইহার মুখপত্র রূপে পরবর্তী আগষ্ট মাস হইতে 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচর্' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পত্রিকাটিতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইলেও 'একাডেমি' সংক্রান্ত সংবাদগুলি শুধু ইংরাজিতেই মুদ্রিত হইত। মোট কথা 'একাডেমি' ও ইহার মুখপত্রে ইংরাজী ভাষারই প্রাধান্য ছিল। ১৮৯৩ খ্রীঃ আগষ্ট মাস হইতে ১৮৯৪ খ্রীঃ জুন মাস অবধি এই পত্রিকাটির ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিষদের সূচনার ইতিহাস জানিতে হইলে এই পত্রিকাটির সাহায্য অপরিহার্য। পরিষদ গ্রন্থাগারে এই পত্রিকাটির ৯টি সংখ্যা মাত্র পাওয়া যায়। এই দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা হইতে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য বর্তমান পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার তাঁহার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস প্রথম পর্ব' গ্রন্থটিতে সংকলিত করিয়া এইগুলি ভবিষ্যতে অবলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন—এজন্য তিনি ধন্যবাদভাজন।

একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হইলে কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব ইহার সভাপতি এবং মিঃ লিওটার্ড ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৭ জন সভ্য লইয়া গঠিত এই সভা প্রবর্ত্তনের দশ মাসের মধ্যেই ইহার সভ্য-সংখ্যা হয় ৫১, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই তদানীন্তন বঙ্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচর্' প্রতিষ্ঠায় মিঃ লিওটার্ড যে অগ্রণী ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার পরামর্শেই যে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইত তাহার বহু প্রমাণ আছে। 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচর্' পত্রিকায় (আগষ্ট ১৮৯৩) লিওটার্ড 'A few words about the origin of Academies' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৩ই আগস্ট (১৮৯৩) একাডেমির চতুর্থ অধিবেশনে লিওটার্ড একাডেমির ভবিষৎ কর্মসূচি (Plan of work) কি হইবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘ এক ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে তিনি বলেন যে একাডেমি সদ্য প্রকাশিত বাঙ্গলা পুস্তক গুলির সমালোচনা করিয়া উহা প্রকাশ করিবে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির চর্চা করিবে,

সভ্যদের রচিত নিবন্ধাদি সভায় আলোচিত হইবে এবং সম্ভবস্থলে এইগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সভ্য নিম্নলিখিত কোন বিষয় লইয়া বিশেষ ভাবে চর্চা করিবেন এবং এ বিষয়ে সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিবেন (ক) বাঙ্গলা কাব্য (খ) হিন্দুনাম সমূহের উৎপত্তি (গ) বাঙ্গলা উপন্যাস (ঘ) বাঙ্গলা নাটক (ঙ) হিন্দু সাহিত্যে বাঙ্গালীর সমাজ ও নৈতিক অবস্থার প্রতি-ফলন (চ) বাঙ্গলা ভাষার দার্শনিক ও ধর্মীয় সাহিত্য (ছ) বাঙ্গলা ভাষার বৈজ্ঞানিক সাহিত্য (জ) সাহিত্যের বিচার পদ্ধতি (ঝ) গদ্য ও পদ্য রচনায় বিষয় বস্তু নির্বাচনের প্রকৃতি, ইত্যাদি। এই ভাষণটিতে লিওটার্ড একাডেমির উদ্যোগে বাঙ্গলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সঙ্কলন ও প্রকাশেরও প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শেষোক্ত এই দুরূহ কার্যটি কি উপায়ে সাধিত হইবে তাহার একটি নির্দেশও তিনি দান করেন। এই ভাষণে তিনি আরও বলেন যে ভবিষ্যতে সভার বার্ষিক অধিবেশনে বাঙ্গলা মুদ্রিত বই, পাণ্ডুলিপি এবং প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী লেখকদের প্রতিকৃতির একটি প্রদর্শনী আয়োজন করা উচিত। লিওটার্ডের উত্থাপিত এই প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয় (দ্রঃ Bengal Academy of Literature Vol 1 no : 2)। বলা বাহুল্য যে লিওটার্ড কর্তৃক উত্থাপিত বহু প্রস্তাব পরবর্তী কালে কার্যে পরিণত হইয়াছিল।

পরবর্তী ১০ই সেপ্টেম্বর একাডেমির অষ্টম অধিবেশনে ভাষণ দান প্রসঙ্গে লিওটার্ড বলেন যে একটি বিশেষ বিদ্যার উন্নত ধরণের চর্চার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান একটি সাধারণ সাহিত্য সভা বা পাঠাগার মাত্র নহে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠেই পর্যবসিত নহে, ইহার লক্ষ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্যক অনুশীলন এবং এই অনুশীলন-প্রসূত চিন্তার প্রকাশ ও প্রচার। এই ভাবেই বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি হইবে। তিনি আরও বলেন যে বাঙ্গালী সমাজ বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, এই কথা মনে রাখিয়াই এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে (অক্টোবর ১৮৯৩, বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচর্)।

১৮৯৪ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী একাডেমির ২২ তম অধিবেশনে লিওটার্ড একাডেমির কর্মসূচি এবং এইগুলি কি ভাবে কার্যকরী করা যাইতে পারে সেই বিষয়ে একটি দীর্ঘ ভাষণ দান করেন (Academy and the Plan of Work—Bengal Academy of Literature, no. 8 1894)। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সাহিত্য-সৃষ্টির সম পরিমাণ ও সমগুণোপেত সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে বাঙ্গালী জাতিকে একাডেমি পরিকল্পিত কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে।

একাডেমির ২৫ তম অধিবেশনে লিওটার্ড একাডেমির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর একটি দীর্ঘ ভাষণ দান করেন (Bengal Academy of Literature, April 1894)। এই সময়ে পরিষদের সভ্যবৃন্দের মধ্যে একাডেমিতে ইংরাজী ভাষা বর্জনের দাবী প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। লিওটার্ড তাঁহার ভাষণে এই প্রসঙ্গে বলেন যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করাইতে হইবে এবং এই ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করাইতে হইবে। বাঙ্গলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ করার পূর্বে একাডেমি কর্তৃক ইংরাজী ভাষা বর্জন যে হঠকারিতার কার্য হইবে এ সম্বন্ধে তিনি সদস্যদের অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। এ যাবৎকাল পরিষদের

কার্যবিবরণী ইংরাজীতে লিখিত হইবার কারণ বর্ণনা করিয়া লিওটার্ড বলেন যে এই কাজটি এযাবৎ তিনিই করিয়া আসিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাব করেন যে অতঃপর একাডেমির দুই সহ-সভাপতিই বাঙ্গালী হইবেন এবং ইঁহাদেরই একজনের উপর বাঙ্গলায় কার্য-বিবরণী লিখিবার ভার অর্পিত হইবে।

লিওটার্ডের অনেকগুলি পরিকল্পনা যথা সমসাময়িক বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা, একাডেমির সদস্যগণের রচনা প্রকাশ, কৃতী বাঙ্গালী লেখকদের চিত্র ও জীবনী সংগ্রহ, বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন ইত্যাদি প্রস্তাব একাডেমি ও ইহার উত্তরাধিকারী পরিষদ কর্তৃক বহুলাংশে গৃহীত ও অনুসৃত হইয়াছিল। Bengal Academy of Literature পত্রিকা পাঠ করিলে ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে 'বেঙ্গল একাডেমি' প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় পরিকল্পনা ও কর্মোদ্যমের মূল উৎস ছিলেন মিঃ লিওটার্ড। একাডেমি প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরে ভারতী পত্রিকার একটি সংখ্যায় (পৌষ ১৩০০ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত একাডেমি অব্ লিটারেচর্ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত মন্তব্যটিতে উপরোক্ত মতটি সমর্থিত হইতেছে, "মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণের শোভাবাজারস্থ ভবনে গত ২৩শে জুলাই ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। যে সকল সভ্য লইয়া এই সাহিত্য সভা গঠিত হইয়াছে তাঁহারা কেহই সাহিত্য জগতে সুপরিচিত নহেন। ...ইঁহাদের মধ্যে একজন সভ্য আছেন তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য—মিঃ লিওটার্ড। যতদূর দেখা যাইতেছে এই বিদেশীয় সভ্য উক্ত সভার মস্তিষ্ক, দেশীয়েরা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মিঃ লিওটার্ড সম্ভবতঃ বাঙ্গালা জানেন না, কিন্তু বাঙ্গালা একাডেমি কিরূপে ফলোপধারী হইতে পারে সে বিষয়ে তাঁহার ইউরোপীয় সহজবুদ্ধি তাঁহাকে ঠিক উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। তিনি যে কয়েকটি প্র্যাকৃটিক্যাল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা শুধু বাঙ্গলা একাডেমির সভ্যগণের নহে, সাহিত্যজীবী বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রণিধান যোগ্য।"

বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচর প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই একাডেমির কর্মধারায় ইংরাজী ভাষার আধিপত্যে একাধিক সদস্য বিশেষ বিরূপতা প্রকাশ করেন ইতিপূর্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। মনীষী রাজনারায়ণ বসু ইঁহাদের অন্যতম। তিনি 'একাডেমি'—এই বিজাতীয় নামের পরিবর্তে 'বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ'—নামটি গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিছুদিন পর একাডেমির একজন বিশিষ্ট সদস্য ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় সভাপতি মহারাজকুমার বিনয়-কৃষ্ণ দেবের নিকট একটি পত্র যোগে প্রস্তাব করেন যে একাডেমির নূতন নামকরণ হওয়া উচিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'। সভ্যগণ আলোচনান্তে এই নূতন নাম গ্রহণে সম্মত হওয়ার পর ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস হইতে এই পরিবর্তন কার্যকরী হয়। একাডেমির মুখপত্রটি অবশ্য ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন অর্থাৎ শেষ সংখ্যা পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ Bengal Academy of Literature এই যুগ্ম নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যে ইংরাজী বর্জনের স্বপক্ষে বহু সদস্য মত প্রকাশ করায় পরিষদের নিয়মাবলী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মিঃ লিওটার্ড এই দুই সহকারী সভাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ পরিষদের প্রস্তাবিত নূতন নিয়মাবলীর 'খসড়া' সহ একটি পত্র পরিষদের সকল সদস্য ও এতৎ অতিরিক্ত বঙ্গভাষানুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

নিকট প্রেরণ করেন। এই পত্রে বলা হয় যে পরিষদের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, যাহাতে ইহা জাতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে সংগঠিত হইতে পারে তজ্জন্য আগামী বৎসরের জন্য (অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দ) ইহার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক নূতন ভাবে নির্বাচন করিতে হইবে। এই পত্রে সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ ইহাও জ্ঞাপন করেন যে তিনি এবং তাঁহার দুইজন সহকারী (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও লিওটার্ড) কেহই আর এই পদে থাকিতে ইচ্ছুক নহেন। দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই পদগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করুন ইহাই তাঁহাদের মনোগত ইচ্ছা। বিনয়কৃষ্ণের এই পত্র বা আবেদন অনুসারে ২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৪ (১৭ই বৈশাখ, ১৩০১) পরিষদের একটি সভা আহূত হয়। এই সভায় পরিবর্তিত নিয়মাবলী আলোচিত হয় নাই, তবে সভ্যগণ মিলিত হইয়া ১৩০১ বঙ্গাব্দের জন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনকে যথাক্রমে পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করেন। মিঃ লিওটার্ড ও শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সাধারণ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস এই দুইজন যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। অন্যতম সাধারণ সম্পাদক মিঃ লিওটার্ড নবগঠিত পরিষদের ধনাধ্যক্ষ পদেও নির্বাচিত হন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১ম ভাগ প্রথম সংখ্যায় পরিষদের এই অধিবেশনটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম অধিবেশন রূপে বর্ণিত হইলেও Bengal Academy of Literature পত্রিকায় এই অধিবেশনটি Twenty-eighth Meeting রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

১৩০১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় (১৭ই জুন, ১৮৯৪) পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে পরিষদের সংশোধিত নিয়মাবলী গৃহীত হয়। এই সভায় পূর্ববর্তী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সংশোধন করিয়া পরিষদের কার্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত রূপে পুনর্গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সহকারী সভাপতি (১) শ্রীযুক্ত নবীন্দ্রচন্দ্র সেন (২) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত এল লিওটার্ড ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; পত্রিকা সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, গ্রন্থরক্ষক—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তালুকদার, ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড। কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী অপর ৩ জন সহ কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন।

দেখা যাইতেছে যে Bengal Academy of Literature বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত হওয়ার পর মিঃ লিওটার্ড তাঁহার প্রাণপণ সেবায় পরিপুষ্ট এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই। ইংরাজী বর্জনে অতি উৎসাহী পরিষদ সদস্যবৃন্দও এই ইউরোপীয় ব্যক্তিকে এই 'পুরোপুরি' স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সম্পাদক ও ধনরক্ষক রূপে নির্বাচিত করিতে আদৌ কুণ্ঠিত বোধ করেন নাই। লিওটার্ড তাঁহার বঙ্গভাষানুরাগ ও বাঙ্গালী প্রীতির জন্য কলিকাতার বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের যে বিশেষ আস্থা ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এই ঘটনা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অসুস্থতার জন্য মিঃ লিওটার্ড নবগঠিত পরিষদের ধনাধ্যক্ষের পদ হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। তদনুসারে কার্য নির্বাহক সমিতির চতুর্থ অধিবেশনে লিওটার্ডকে এই পদ হইতে অব্যাহতি দিয়া তাঁহার স্থলে শ্রীচন্দ্রকান্ত তালুকদারকে 'ধনরক্ষক' পদে নিযুক্ত করা হয়।

১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৯শে কার্তিক লিওটার্ডের পরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ-পত্র কার্য নির্বাহক সমিতি কর্তৃক গৃহীত হয়। পরিষদের জন্য তিনি এযাবৎ যে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন

তজ্জন্য তাঁহাকে পরিষদ হইতে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠার দিন হইতে ১৫ মাস কাল লিওটার্ড একাডেমি তথা পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন; এতদিন পর লিওটার্ডের এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছেদনের কারণটি রহস্যাবৃত। সম্ভবতঃ পরিবর্তিত অবস্থায় পরিষদের অন্যতম সম্পাদকরূপে কার্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছিল না। পরিষদের পঞ্চদশ সাংবাৎসরিক কার্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে "লিওটার্ড সাহেব বাঙ্গালা জানিতেন না। সভার সমুদয় কার্য বাঙ্গালাভাষায় নির্বাহিত হইবে স্থির হওয়ায় তিনি অল্পদিন পরে সভার সম্পর্ক ত্যাগ করেন।" শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার এই উক্তিটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস—প্রথম পর্ব, পাদ-টীকা পৃঃ ১৫৯)।

নূতন নামকরণের পর পরিষদের পঞ্চবিংশ অধিবেশনে (২৫ মে মার্চ, ১৮৯৪) সভাপতির নিকট লিখিত পরিষদ সদস্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্র পঠিত হয় (Beng. Academy of Lit. পত্রিকার এপ্রিল, ১৮৯৪ সংখ্যায় মুদ্রিত)। এই পত্রে দেবেন্দ্রনাথ বৈদেশিক Academy শব্দের পরিবর্তে ইহার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নাম গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পরিষদের আলোচনাগুলি বাঙ্গালায় হওয়া উচিত এবং আলোচনার ক্ষেত্রও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও চর্চাতেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত এইরূপ মত প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন যে, "উদ্যমশীল লিওটার্ড সাহেব যখন ইংরাজ হইয়াও বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেছেন, তখন তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণ করা কি আমাদের পক্ষে কর্তব্য নহে?" শ্রীযুক্ত কুমার সম্ভবতঃ দেবেন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্য হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মিঃ লিওটার্ড জাতিতে ইংরাজ ছিলেন, তিনি বাঙ্গালা জানিতেন এবং বাঙ্গালাভাষা না জানা তাঁহার পদত্যাগের কারণ নহে।

মার্চ মাসে যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে 'বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিতেছেন' পরবর্তী অক্টোবর মাসের মধ্যে বাঙ্গালাভাষায় কাজকর্ম চালাইবার মত বা বাঙ্গালায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার মত শক্তি লিওটার্ড সাহেব সম্ভবতঃ অর্জন করিতে পারেন নাই। সুতরাং "বাঙ্গালা জানিতেন না" ইহাই লিওটার্ডের পদত্যাগের কারণ হওয়া সম্ভব। ইতিপূর্বে ধনাধক্ষ্যের পদত্যাগ কালে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্যভঙ্গও তাঁহার সভ্যপদ ত্যাগের কারণ হইতে পারে। পরিষদের কর্মক্ষেত্রে বহু কৃতী ব্যক্তির সমাবেশ লক্ষ্য করিয়া লিওটার্ড সম্ভবতঃ নিজেকে আর পরিষদের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে কার্য নির্বাহক সমিতির পরবর্তী অধিবেশনে লিওটার্ডের স্থলে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পরিষদের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

পরিষদের জন্মলগ্নে ও ইহার শৈশবাবস্থায় এই বিদেশী বন্ধুর নিরলস ও নিঃস্বার্থ সেবার কথা পরিষদের পরবর্তী কর্ণধারগণ কর্তৃক উপেক্ষিত বা অস্বীকৃত হয় নাই। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ নবনির্মিত পরিষদ ভবনের গৃহ প্রবেশ উৎসব উপলক্ষ্যে তদানীন্তন পরিষৎ সভাপতি বিচারপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহারা ভাষণে উল্লেখ করেন যে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ লিওটার্ড নামক ফরাসী ভদ্রলোকের যত্নে মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেবের প্রাসাদে 'বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই মূল হইতেই ১৩০১ বঙ্গাব্দের

১৭ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৪) পরিষৎ অঙ্কুরিত হইয়াছিল (পরিষৎ পঞ্জিকা ১৩১৬. পৃঃ ১৮৩)।

পরিষদ্ নবনির্মিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ার পরই পরিষৎ কর্তৃপক্ষ লিওটার্ডের একটি চিত্র পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল পরে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন, ১৯১৯) পরিষদ্ মন্দিরে মিঃ লিওটার্ড ও পরিষদের অপর এক অক্লান্ত সেবক মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রতিকৃতি দুইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পরিষৎ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সভাপতির অনুরোধে সহ-সভাপতি ডাঃ চুনীলাল বসু লিওটার্ডের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেন যে, "বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচর্ ১৩০০ বঙ্গাব্দে স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেবের চেষ্টাতেই প্রথমতঃ এই সভার সূচনা হয়। তখন সভার কাজকর্ম ইংরাজীতেই চলিত। তৎপর বৎসর ঐ সভাই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ রূপে পরিণত হয়। তখন হইতে সমস্ত কাজ বাঙ্গালা ভাষাতেই আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেব যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা এই সভার সূচনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু (তৎকালীন পরিষদ্ সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) তাঁহার চিত্র পরিষদ্‌কে উপহার দিয়া পরিষদের অন্যতম আশু কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করিলেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের কৃতজ্ঞতা ভাজন" (পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ)।

এইরূপ এক বিদেশী পরিষদ্-বন্ধুর জীবনী ভাবীকালের জন্য রক্ষিত হওয়া অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা মিঃ লিওটার্ডের জীবনী অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সুদীর্ঘকালের পরিশ্রমের ফলে যে তথ্যগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা নিবেদন করা হইতেছে। বলাবাহুল্য ইহা মিঃ লিওটার্ডের জীবনীর রেখাচিত্র মাত্র, ইহাকে পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলিলে সত্যের অপলাপ ঘটিবে।

ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতাংশে মিঃ লিওটার্ডের জাতির উল্লেখ নাই। শুধু তিনি 'সাহেব' রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোল্লিখিত পত্রে তিনি ইংরাজ রূপে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র তাঁহাকে বলিয়াছেন ফরাসী ভদ্রলোক। বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচর প্রতিষ্ঠায় লিওটার্ডের অন্যতম সহকর্মী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহাকে "একজন আধা ইংরাজ, আধা ফরাসী, সহৃদয় ভারতভক্ত সাহেব" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন (নারায়ণ ১ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা)। আমাদের বিশ্বাস এই যে মিঃ লিওটার্ড সম্বন্ধে মনীষী হীরেন্দ্রনাথের উক্তিটিই যথাযথ। মিঃ লিওটার্ড ছিলেন জন্মসূত্রে ফরাসী। তিনি ইংরাজ সরকারের কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। লিওটার্ডের ইংরাজী ভাষায় সহজ দক্ষতার জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত নহেন এমন ব্যক্তির পক্ষে তাঁহাকে ইংরাজ বলিয়া ভুল করা স্বাভাবিক ছিল। লিওটার্ডের ফরাসী জাতিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াও আমরা মসিঁয়ে লিওতার্-এর পরিবর্তে বহু প্রচলিত লিওটার্ড উচ্চারণটি গ্রহণ করিয়াছি।

চন্দননগর গীর্জার অতিজীর্ণ কাগজপত্র হইতে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট লুই ভিক্টর ইউজিন লিওটার্ড (Louis Victor Eugene Liotard)

নামে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী চন্দননগর গীর্জায় তাহাকে খ্রীষ্ট ধর্মে অভিষিক্ত করা হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে এই শিশুর পিতামাতা চন্দননগরবাসীই ছিলেন, পাঁচ মাস বয়স্ক এই শিশুকে বাহির হইতে চন্দননগর গীর্জায় অভিষেকোদ্দেশ্যে আনা হয় নাই, চন্দননগরেই এই শিশুর জন্ম হইয়াছিল।

গীর্জার নথিতে (Baptism Record) এই শিশুর পরিচয় নিম্নলিখিত রূপ প্রদত্ত হইয়াছে :

পিতা—পিয়ের চার্লস লিওটার্ড (Pierre Charles Liotard)

মাতা—এইচ্. এলিজাবেথ ফ্রাঙ্কোইস লিওটার্ড (H. Elizabeth Francoise Liotard nee Durup de dombal)

এই তথ্যটি যীশুসমাজভুক্ত ধর্মযাজক রেভাঃ পিয়ের ফাঁলো মহাশয়ের সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়ান লিওটার্ড নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক ভারতে আসিয়া চন্দন-নগরে বাস করিতেন। যশোহর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে ইনি নীল চাষের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। জুলিয়ান লিওটার্ড উপাধিধারী আর এক ব্যক্তিও নীলচাষী ছিলেন। ইনি কাগজপত্রে জুনিয়র বলিয়া উল্লিখিত আছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (১৮৩১-৪০) বর্ধমানের 'জাল প্রতাপচাঁদ' খ্যাত মামলায় সরকারী সাক্ষীরূপে চন্দননগরবাসী এক লিওটার্ডের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ লুই লিওটার্ডের পিতা চার্লস পূর্বোক্ত লিওটার্ড পরিবারেরই সন্তান ছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ উইলিয়ম কেরী প্রতিষ্ঠিত এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির সভ্য-তালিকায় লুই দুরুপ ডি ডুম্বাল ও মাইকেল দুরুপ ডি দুম্বাল নামে দুইজন চন্দননগরবাসী ভদ্রলোকের নাম পাওয়া যায়। ১৮৩৯ খ্রীঃ অে, দুরুপ ডি দুম্বাল নামে এক ভদ্রলোক চন্দননগরে পরলোক গমন করেন। লুই লিওটার্ডের মাতা হেলেন অথবা হেনরিয়েটা ফ্রাঙ্কোইস্ সম্ভবতঃ এই দুম্বাল পরিবারেরই দুহিতা ছিলেন।

শিশু লুই ভিক্টর ইউজেন লিওটার্ড কোথায় ও কতটুকু শিক্ষালাভ করিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে লিওটার্ড যে সংগঠনী শক্তি ও মনীষার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় তিনি বাল্য ও কৈশোরে উপযুক্ত শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ২৩ বৎসর বয়সে লিওটার্ড ভারত সরকারের অধীনে কৃষি রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে (৫০৲—১০০৲ বেতন ক্রমে) চতুর্থ পর্যায়ের করণিকের পদে নিযুক্ত হন। তদানীন্তনকালে এই অফিস সমগ্র ভারতের রাজধানী কলিকাতায় অবস্থিত ছিল। কলিকাতার উচ্চপদস্থ ইংরাজ সমাজের সহিত চন্দননগরবাসী দুম্বাল পরিবারের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মাতৃকুলের সহায়তাতেই লুই লিওটার্ড কলিকাতায় এই চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিওটার্ড চতুর্থ পর্যায় হইতে তৃতীয় পর্যায়ের করণিক পদে উন্নীত হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লিওটার্ডকে সিমলায় নবগঠিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় তদন্ত অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ পদে নিযুক্ত করা হয় (Superintendent to the Famine Commission)। এই কমিশনের সেক্রেটারী ছিলেন সার চার্লস ইলিয়ট (Sir Charles

Elliot), ইনি পরে বঙ্গপ্রদেশের লেঃ গভর্নর নিযুক্ত হন। সরকারী কাগজ-পত্র হইতে জানা যায় যে চাকুরী প্রাপ্তির প্রথম হইতে ১৮৭৯-এ সিমলা যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত লিওটার্ড চন্দননগরেই বাস করিতেন। এক বৎসর সিমলায় বাসের পর লিওটার্ড পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগে মাসিক ১৫০৲ বেতনে (১৫০৲—২০০৲বেতনক্রমে) করণিকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ লিওটার্ড ৩২০৲ বেতনে (৩৫০৲—৪০০৲ বেতনক্রমে) রাজস্ব ও কৃষিবিভাগে প্রথম শ্রেণীর সরকারীপদে উন্নীত হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই সময়ে বঙ্গসাহিত্যে স্বনামধন্য ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বিভাগেই করণিকরূপে লিওটার্ডের সহকর্মী ছিলেন। পরে ত্রৈলোক্যনাথ অন্য বিভাগে বদলী হইয়া যান। ১৮৮৯ খ্রীঃ লিওটার্ড ৪০০৲—৬০০৲ বেতনক্রমে মাসিক ৪০০৲ বেতনে অর্থ ও বাণিজ্য বিভাগের পরিসংখ্যান (Statistics) শাখার প্রথম সহকারী পদে উন্নীত হন, এই 'অফিস' তখন বর্তমান কালে 'ট্রেজারী বিল্ডিং' নামে পরিচিত বাটিতে অবস্থিত ছিল। সিমলা হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পরও এই নয় বৎসর কাল লিওটার্ড চন্দননগর হইতে যাতায়াত করিতেন। চাকুরী জীবনের ষোল বৎসরকাল চন্দননগর হইতে নিত্য যাতায়াত হইতে মনে হয়, চন্দননগরে লিওটার্ডের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব গৃহ ছিল এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও সম্ভবতঃ চন্দননগরে বাস করিতেন। লিওটার্ডের পত্নীর নামটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাঁহার নাম ছিল বিয়েত্রিচ্ (Beatrice)। আমরা এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছি যে শ্রীযুক্তা বিয়েত্রিচ্ লিওটার্ড ইংরাজ ললনা ছিলেন। ইঁহার এক স্বসৃ-দুহিতার নাম ছিল মিস ব্রাউন। ইঁহার এক ভ্রাতা Mr. K. C. Brown, Worthing, Sussex (England)-এ বাস করিতেন এবং কিছুদিন পূর্বেও জীবিত বলিয়া জানা গিয়াছে। লিওটার্ডের পরিচয় প্রসঙ্গে মনস্বী হীরেন্দ্রনাথের 'আধা-ইংরেজ আধা ফরাসী' উক্তিটির মধ্যে সম্ভবতঃ লিওটার্ডের ইংরেজ কন্যার পাণিগ্রহণের ইঙ্গিতটি নিহিত রহিয়াছে।

কিঞ্চিৎ পদোন্নতির পর লিওটার্ড ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ সংখ্যক পার্ক লেনে অর্থাৎ কলিকাতার সাহেব পাড়ায় বাসস্থাপন করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ লিওটার্ড অর্থ ও বাণিজ্য বিভাগের পরিসংখ্যান শাখার সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্ পদে নিযুক্ত হন (Supd. Statistical Branch, Finance and Commerce Deptt.)।

১৮৯৩ খ্রীঃ ২৩ শে জুলাই, বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য পরিষদের সংস্রব ত্যাগ কাল পর্যন্ত লিওটার্ড পূর্বোক্ত পদে বা বাসস্থানে আসীন ছিলেন। পরিষদের কাগজপত্রেও তাঁহার ঠিকানা ছিল ১৯ সংখ্যক পার্ক লেন। ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৭ পর্যন্ত লিওটার্ড এণ্টালী পল্লীস্থ ৭ সংখ্যক ক্যানেল ইস্ট লেনে বাস করিয়া অতঃপর দুই বৎসর ১৮ নং পার্ক লেনে বাস করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ লিওটার্ড মাসিক ৬০০ টাকা বেতনে পরিসংখ্যান শাখার 'সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্' পদ লাভ করেন (Supd. Statistical Bureau under Director General or Statistics)। ১৯০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই পদে থাকিয়া এই বৎসরই লিওটার্ড প্রাগ্ অবসর অবকাশ (J. P. R.) গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট এই ছুটির কাল পূর্ণ হইলে তিনি পূর্ণ অবসর প্রাপ্ত হন। অবসর গ্রহণের কালে তিনি ৪০ সংখ্যক ম্যাকলিরড

স্ট্রীটে বাস করিতেন। লুই লিওটার্ডের চন্দননগর বাসকালে লিওটার্ড উপাধিধারী জনৈক J. Leotard-এর নাম পাওয়া যায়। ইনি উত্তরকালে কলিকাতা জেনারেল পোস্টাপিসের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্‌ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি ১৯১০ খ্রীঃ পর্যন্ত কলিকাতায় বাস করেন। আমাদের বিশ্বাস এই ভদ্রলোক লুই লিওটার্ডের ভ্রাতা অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় লিওটার্ড উপাধিধারী কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় ভাষা সমূহে লিখিত বিশ্ব-কোষ বা জীবনী-কোষ জাতীয় গ্রন্থে লিওটার্ড উপাধিধারী স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই ফরাসী দেশ অথবা বেলজিয়মের ফরাসী ভাষী অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পর লুই লিওটার্ডের কোন সন্ধান দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের অজ্ঞাত ছিল। পরিষদ্‌ মন্দিরে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে (১৯১৯ খ্রীঃ) লিওটার্ডের একটি চিত্র প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ জীবিত ব্যক্তির চিত্র প্রতিষ্ঠার রীতি নাই। পরিষদও এই রীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন—একমাত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। এই কারণে আমাদের ধারণা জন্মে যে ১৯০৫ হইতে ১৯১৯ খ্রীঃ মধ্যে কোন সময় মিঃ লিওটার্ড কলিকাতা অথবা চন্দননগরে পরলোক গমন করেন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া দীর্ঘকাল আমরা কলিকাতা ও চন্দননগরের সমাধিক্ষেত্রগুলিতে লিওটার্ডের সমাধি খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি। লিওটার্ডের জন্ম-তারিখ ও পিতৃপরিচয় পাওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু তারিখ জানা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। সরকারী কর্মচারী রূপে লিওটার্ড পেন্সন পাইতেন, কতদিন পর্যন্ত তিনি পেন্সন পাইলেন জানিতে পারিলেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। কলিকাতায় এই সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আমরা এ বিষয়ে দিল্লীস্থ মহাফেজখানার শরণাপন্ন হই। তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, তাঁহারা লেখেন যে ঐ সময়ের কাগজপত্র লণ্ডনের Indian office-এ (বর্তমান Common Wealth Relations) স্থানান্তরিত হইত।

সমাধিক্ষেত্রে লিওটার্ডের সমাধি অন্বেষণের ফাঁকে ফাঁকে ১৯০৫ খ্রীঃ এর পরবর্তী সময়ের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের 'ফাইল' দেখার কাজেও আমরা ক্ষান্ত হই নাই। এই সময়ে পরিষদ পাঠগৃহে সাহিত্য সভার (কলিকাতা) মুখপত্র 'সাহিত্য সংহিতায়' মুদ্রিত সাহিত্য সভার পঞ্চদশ অধিবেশনের (২৭ শে বৈশাখ, ১৩২১) কার্যবিবরণের একস্থানে ভাগ্যক্রমে আমাদের বিস্মিত দৃষ্টি পতিত হয়। এই কার্যবিবরণীতে আমাদের হিসাবে নিরুদিষ্ট মিঃ লিওটার্ডের একটি পত্র মুদ্রিত ছিল। নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইল :

Dehradun
4, Lytton Road,
May 6, 1914.

To
The President,
Sahitya Sabha, Calcutta.

Dear Sir,

I am much obliged to you for your great kindness in sending me so regularly, a copy of the Sahitya Samhita. I always readit with

interest, and the life like portrait on the cover of it raises an emotion which I cannot describe. Your country (I mean my country, for it is land of my adoption) lost a very dear friend by his death.

I am sending under separate cover a little story I wrote some years ago to amuse myself. It has just been republished in book form. The characters are all from life, but the story has of course been sprung from imagination.

Thacker Spink & Co., Calcutta, have I believe received copies for sale from the publishers, since they are advertising the book as you will see from the notice I have enclosed in the separate cover.

Wishing you and the Sabha long years of prosperity and usefulness.

I remain,
Sincerely Yours
L. Liotard.

লিওটার্ডের উপরি-উদ্ধৃত পত্রটি হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে তিনি অবসর গ্রহণের পর বর্তমান উত্তর প্রদেশের দেরাদুনে বাস করিতেন, সাহিত্য সভার মুখপত্র সাহিত্য সংহিতা তাঁহাকে নিয়মিত পাঠান হইত এবং তিনি উহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইতেন। লিওটার্ড যে বাঙ্গলা শিখিতেছিলেন এ সংবাদ আমরা পূর্বেই পাইয়াছিলাম। এতদিনে তিনি বাংলা লিখিতে পারিতেন কিনা ইহা জানা গেল না, তবে সাহিত্য সংহিতার ন্যায় উচ্চাঙ্গের বাঙ্গলা সাময়িক পত্র পাঠের মত বাংলা জ্ঞান যে তিনি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা জানা গেল। বিনয়কৃষ্ণের মৃত্যুর পর সাহিত্য সংহিতার প্রচ্ছদে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইত, এই প্রতিকৃতিটি দর্শন করিয়াই লিওটার্ড বর্ণনাতীত ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া পড়িতেন বলিয়া লিখিয়াছেন। বিনয়কৃষ্ণের নাম অনুল্লিখিত রাখিয়াই তিনি সাহিত্য সভার সভাপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে এব্যক্তির মৃত্যুতে আপনাদের দেশ একজন প্রিয় সুহৃৎ অর্থাৎ দেশপ্রেমিককে হারাইয়াছেন। সাহিত্য সভার সভাপতির উদ্দেশ্যে তোমাদের দেশ (Your country) লিখিতে গিয়াই সঙ্গে সঙ্গে লিওটার্ড লিখিয়াছেন যে আমি বলিতে চাই যে ইহা আমারও দেশ, আমি এই দেশকেই জন্মভূমি রূপে গ্রহণ করিয়াছি। অবচেতন অবস্থায় একজন বাঙ্গালী ভারতীয়কে 'তোমার দেশ' লিখিতে লিখিতে ফরাসী কুলোদ্ভব লিওটার্ড সজ্ঞানে ভারতবর্ষ বা বাঙ্গালীকে তাঁহার ধাত্রী-মাতা রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লিওটার্ড দেরাদুনে বাস করিতেছিলেন জানিয়া আমরা অতঃপর কলিকাতায় তাঁহার সমাধি অনুসন্ধানের নিষ্ফল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে দেরাদুনে অনুসন্ধান করিতে থাকি। দেরাদুনের ৪ নং লিটন রোডের বর্তমান অধিবাসিবৃন্দ কেহ লিওটার্ডের নামও শুনেন নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের অনুরোধে দেরাদুনের এক ধর্মযাজক ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ পর্যন্ত নথিপত্র দেখিয়া জানান যে তিনি লিওটার্ড নামীয় কোন ভদ্রলোকের মৃত্যু বা সমাধি সংক্রান্ত

কোন তথ্য এই সময়ের রেকর্ডে খুঁজিয়া পান নাই। সম্ভবতঃ বিস্তৃত সমাধি ক্ষেত্রটি তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে পারেন নাই, শুধু কিছুকাল অবধি Burial Records খুঁজিয়াছেন। ১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত দেখিলেই চলিবে, আমরা তাঁহাকে অবশ্য এইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলাম কারণ তখনও পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে ১৯১৯ খ্রীঃ পরিষদ মন্দিরে চিত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই লিওটার্ড পরলোক গমন করিয়াছেন। আমাদের এই ধারণা ভ্রান্তও হইতে পারে মনে করিয়া অতঃপর আমরা দুন পাব্লিক স্কুলের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিঃ জে. এ কে. মার্টিন [Mr. J. A K. Martyn M.A (Cantab) O.B.E.] মহোদয়ের শরণাপন্ন হই। কোন সাহিত্যিক বন্ধু বিদ্যোৎসাহী এই ভদ্রলোকের ঠিকানাটি আমাদের জানাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মার্টিন স্থানীয় সমাধি ক্ষেত্র কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আর্থার ঘোষ মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ করিয়া সমাধি ক্ষেত্রের নথিপত্র হইতে (burial records) নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের প্রেরণ করেন :

Mr. Louis Liotard, 86 years of Secretariat Deptt. (Retired), Died—23 February 1937, Plot No. C1, Grave No. 48, Cemetry Dehradun.

Mrs. Beatrice Liotard wife of Mr. Liotard of Secretariat Deptt. (Retired) Died 3 June 1936, Plot No. C1. Cemetry Dehradun.

Living time address 9, Cross Road, Dehradun.

মৃত্যুকালে লিওটার্ডের যে বয়স লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহার সহিত চন্দননগর গীর্জার নথিতে লিখিত জন্মকালের কোন পার্থক্য নাই। লক্ষ্য করা যায় যে লিওটার্ড গৃহিণী মিঃ লিওটার্ডের সাত মাস পূর্বে পরলোক গমন করেন। সম্ভবতঃ লিওটার্ড দম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। অন্ততঃ মৃত্যুকালে তাঁহাদের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। শ্রীমতী লিওটার্ডের এক স্বসৃ-কন্যা মিস্ ভেরা ব্রাউন দেরাদুনে লিওটার্ড পরিবারেই বাস করিতেন।

পূর্বোক্ত মিঃ মার্টিন মহোদয়ের সহায়তায় মিঃ লিওটার্ডের সমাধির একটি ফটোও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সমাধি-ফলকে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি খোদিত আছে :

Sacred to the Memory
of
LOUIS LIOTARD
BELOVED HUSBAND OF
BEATRICE LIOTARD
BORN 13. 8. 1850
DIED 23. 2. 1937
BLESSED ARE THE PURE OF HEART
FOR THEY SHALL SEE GOD
P.I.P.

মিঃ লিওটার্ড লিখিত "What the Sea Divided" গ্রন্থটি কলিকাতায় প্রসিদ্ধ পাঠাগার এবং ইউরোপীয় ক্লাবসমূহের পাঠাগারগুলি সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়মের

ক্যাটালগে এই বইটি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ঃ

L. Liotard—"What the Sea Divided"—A tale. pp.180. Murray and Evenden Ltd. London, July, 1913.

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে (রেফারেন্স ডিভিসন, গ্রেট রাসেল স্ট্রীট, লণ্ডন) এই পুস্তকের একখণ্ড রক্ষিত আছে। ইহার একটি ফটো কপি যাহাতে কলিকাতার জাতীয় পাঠাগারে রক্ষিত হয়, তাহার জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টিত আছি।

মিঃ লিওটার্ড রচিত নিম্নলিখিত আরও কয়েকটি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তক (পুস্তিকা) গুলি ভারত সরকারের কৃষি, বাণিজ্য, রাজস্ব প্রভৃতি বিভাগের কর্মচারীরূপে লিওটার্ড কর্তৃক লিখিত হয়। এইগুলিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিওটার্ডের জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য লিওটার্ডের আন্তরিকতাও এই পুস্তিকাগুলিতে লক্ষণীয়। লিওটার্ড ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন না। মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনের করণিক রূপে কর্মজীবন সুরু করিয়া মাসিক ৬০০৲ বেতনে একজন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট বা বড়বাবুরূপে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ফরাসী বংশোদ্ভূত হওয়ার জন্যই তিনি 'অফিসর'-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন নাই। এই পদে নিযুক্ত বা উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা যে তাঁহার ছিল, তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায় ঃ

(1) Memorandum on Materials in India for the manufacture of paper—Calcutta, 1880.

(2) Memorandum on Silk in India, Part I, Calcutta, 1883.

(3) Memorandum regarding the introduction of Carolina rice into India, Calcutta, 1880.

(4) Note on Nankin Cotton in India, Simla, 1883.

(5) Note Preliminary on Hop Culture in India, Simla, 1883.

(6) Note regarding paper making industry in India, Simla, 1883.

(7) Note regarding Tea Industry in N. W. Provinces and Punjab, Simla, 1882.

(8) Note (Supplementary) on sea trade with Thibet, Simla, 1883.

[১-৪ সংখ্যক পুস্তকগুলি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস (অধুনা কমনওয়েল্‌থ রিলেসন্স) ও ৫-৮ সংখ্যক পুস্তকগুলি কলিকাতার জাতীয় পাঠাগারে প্রাপ্তব্য ; ১ সংখ্যক পুস্তকটি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ও কমার্শিয়াল লাইব্রেরীতেও প্রাপ্তব্য]। মিঃ লিওটার্ডের সাহিত্য-প্রতিভা ও লিপিকুশলতার পরিচয় Bengal Academy of Literature-এ মুদ্রিত তাঁহার ভাষণগুলি হইতেও পাওয়া যায়। লিওটার্ড বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও লিখিতেন। Calcutta University Magazine-এ তাঁহার লিখিত "What is a Star" নামক একটি নিবন্ধ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গজননীর শ্যামল ক্রোড়ে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে লিওটার্ড জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যৌবন ও পৌঢ়ত্বের কর্মমুখর দিনগুলি তদানীন্তন ভারতের রাজধানী কলিকাতা নগরীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি যে বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালীর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই। কর্মজীবন অন্তে পরিণত বার্ধক্যে ৮৬ বৎসর বয়সে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদমূলে দেরাদুনের উপল-বন্ধুর প্রান্তরে তাঁহার চিরবিশ্রাম গ্রহণের সংবাদ সুদূর বঙ্গভূমিতে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা ও উত্তর ভারতের সংবাদ-পত্রগুলিতে লিওটার্ডের মৃত্যু সংবাদের কোন উল্লেখও আমরা পাই নাই। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার ৪৪ বৎসর পরে পরিষদ মন্দিরে ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠকের মৃত্যু সংবাদটি পৌঁছিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য তাঁহার জন্য কোন শোকসভার আয়োজন করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আমরা অদ্য এই পরিষদ-বন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি। *

* পরিষদের দ্ব্যশীতিতম বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে (৫ই মাঘ, ১৩৮১) লেখক কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ (পরিবর্ধিত)।

শ্রীমদনমোহন কুমার, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, ৭২/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

ত্র্যশীতিতম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা
কার্ত্তিক-চৈত্র
১৩৮৩

পত্রিকাধ্যক্ষ

ডক্টর শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

ত্র্যশীতিতম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা

কার্ত্তিক-চৈত্র

১৩৮৩

পত্রিকাধ্যক্ষ

ডক্টর শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮৩-তম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা

কার্ত্তিক-চৈত্র

১৩৮৩

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৮৩, সংখ্যা : ৩-৪
মাঘ—চৈত্র, ১৩৮৩

সিয়ান গ্রামের শিলালেখ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

১। উপক্রমণিকা

১৯৭১ সালের শেষ দিকে বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকটবর্তী আলবাঁধা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় আমাকে দুইটি লেখসংবলিত শিলাফলকের সন্ধান জানান। ফলক দুটি অদূরবর্তী সিয়ান গ্রামের শাহজাপুর অঞ্চলস্থিত মখদুম শাহ্ জালানের জীর্ণ দরগায় আবিষ্কৃত হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিলেন যে, শিলাফলকদ্বয়ের সম্মুখভাগে ৩৫ পংক্তি করিয়া লেখ উৎকীর্ণ আছে; কিন্তু দ্বিতীয় ফলকের অক্ষর অত্যন্ত অস্পষ্ট বলিয়া কেবল প্রথম ফলকের একখানি আলোকচিত্র পরীক্ষার জন্য আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট আরও জানা গেল যে, ফলকদ্বয়ের পশ্চাদ্‌ভাগে আরবী অক্ষরে লেখ উৎকীর্ণ আছে। যাহা হউক, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরিত আলোকচিত্র হইতে লেখের পাঠোদ্ধার সম্ভব ছিল না; কিন্তু দেখা গেল, উহাতে একাদশ শতাব্দীর গৌড়ীয় লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং একস্থলে 'চেদিনৃপতেঃ কর্ণস্য জিত্বা ভটান্' (অর্থাৎ 'চেদিরাজ কর্ণের সেনাদল ধ্বংস করিয়া') পাঠ করা যায়। বুঝা গেল যে, লেখটি পালবংশীয় নয়পাল (আ° ১০২৭-৪৩ খ্রী:) কিংবা তৎপুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের (আ° ১০৪৩-৭০ খ্রী:) রাজত্বকালীন; কারণ তাঁহারাই চেদিরাজ কর্ণের (১০৪১-৭১ খ্রী:) সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সিয়ান শিলালেখের ঐতিহাসিক মূল্য বুঝিয়া পাঠোদ্ধারের জন্য আমি উহার ছাপ সংগ্রহের চেষ্টা করিলাম। অনেক চেষ্টার পর যে বস্তু জুটিল তাহাতে প্রথম শিলাফলকের একটা মোটামুটি পাঠ প্রস্তুত করা সম্ভব হইল এবং উহার ভিত্তিতে আমি 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা' (১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮০, পৃষ্ঠা ১০০-০২) এবং Journal of Ancient Indian History (Vol. VI, 1972-73, pp. 39-47, 177-78) পত্রিকায় দুইটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম।[১]

১৯৭৫ সালে আমি ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের লেখবিদ্যা শাখা হইতে সিয়ান শিলাফলকদ্বয়ে উৎকীর্ণ লেখদুটির ছাপ পাই এবং সরকারী Epigraphia Indica পত্রিকায় উহা সম্পাদন করিতে অনুরুদ্ধ হই। ছাপ পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইলাম যে,

মূলে একটিমাত্র শিলাফলকে একটি বৃহৎ শিলালেখ উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। পরে ফলকটি মাঝখানে ভাঙিয়া দুইখণ্ড হইয়া যায় এবং উভয় খণ্ডের ভাঙা দিক কাটিয়া সমান করিতে লেখের কিয়দংশ বিনষ্ট হয়। প্রথম খণ্ডটিতে কোন কোন স্থানের অক্ষর পড়া যায় না। আর দ্বিতীয় খণ্ডের মাঝামাঝি অংশে কোনরূপ ঘষাঘষির ফলে অক্ষরসমূহ প্রায় বিলুপ্ত। আমাদের প্রথমে ধারণা হইয়াছিল যে, যাঁহারা ফলকদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগে আরবীলেখ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, তাঁহারাই হয়ত মূল ফলকটি ভাঙিয়া দুই খণ্ড করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। কারণ, সংস্কৃত লেখের ন্যায় পশ্চাদ্ভাগের আরবী লেখেরও মধ্যাংশ বিলুপ্ত।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, অসম্পূর্ণ ও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত সিয়ানলেখের পাঠোদ্ধার এবং ব্যাখ্যা উভয়ই অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আমরা প্রথমে লেখটির পাঠ উদ্ধৃত করিয়া পরে উহার ব্যাখ্যা বিষয়ে আলোচনা করিব। লেখটির প্রত্যেক পংক্তি তিন ভাগে ভাগ করা হইবে; প্রথম অংশের পাঠ 'ক', বিলুপ্ত মধ্যাংশের আনুমানিক পাঠ 'খ' এবং শেষাংশের পাঠ 'গ' বলিয়া চিহ্নিত হইবে।

মূল লেখের ৩৫ পংক্তিতে বিভিন্ন ছন্দের ৬৫টি শ্লোক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আমাদের দেশে এত বৃহৎ শিলা-প্রশস্তির সংখ্যা খুব কম। লেখটির পাঠ উদ্ধৃত করার পূর্বে উহাতে কোন্ কোন্ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।—(১) অনুষ্টুভ্—১, ৩, ১০ ২৭, ৩৪-৩৬, ৩৮, ৪০-৪১, ৪৩, ৪৯-৫০, ৫৫ ও ৫৯; (২) স্রগ্ধরা—২, ১২ ও ২২; (৩) পুষ্পিতাগ্রা—৪; (৪) শার্দূলবিক্রীড়িত—৫, ১৩, ১৫-১৭, ২১, ২৩, ৪৪, ৪৮, ৬১ ও ৬৫; (৫) উপেন্দ্রবজ্রা—৬, ৮ ও ৪৭; (৬) মালিনী—৭; (৭) শিখরিণী—৯; (৮) আর্যা—১১, ৩২ ৩৭, ৬৩ ও ৬৪; (৯) রথোদ্ধতা—১৪; (১০) শালিনী—১৪, ২৮, ৪২ ও ৬০; (১১) বসন্ততিলকা—১৯ ও ৫৭; (১২) দ্রুতবিলম্বিত—২০; (১৩) ইন্দ্রবজ্রা—২৬, ২৯, ৩০, ৫৮ ও ৬২; (১৪) উপজাতি—২৪, ২৫ ও ৪৫; (১৫) স্বাগতা—৩১ ও ৩৩; (১৬) প্রহর্ষিণী—৩৯; (১৭) পৃথ্বী—৪৬, এবং (১৮) মন্দাক্রান্তা—৫৬। ক্রমান্বয়ে পংক্তি সমূহের পাঠ উদ্ধৃত করিতে গিয়া শ্লোকগুলির অন্তে আমরা উহাদের সংখ্যা বসাইয়া দিয়াছি।

২। লেখের পাঠ

১। (ক) [সিদ্ধম্। নমো ভগ *]বতে বাসুদেবায় ॥

প্রবোধনিদ্রে জগতাং যদ্যোন্মীলন-মীলনে।

ছন্দঃ প্রমেয়ো × × × × × × × × ×

(খ) × × [॥ *]১

(গ) –যো যতো ('*) ভূ-

দ্ভান্ন - –⏑– – –⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – – ⏑– –

– – – – ⏑ লানাং

২। (ক) ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ - তরারির-নির্ভিন্ন-গর্ব্ব-

স্নাসাদদ্যাপি চাঙ্গাং বহতি সমতটে দ্বাদশাব্দৈকপূরঃ ॥ ২

× ×

(খ) × × × × × × × × × × × × × × [*]

× × × × ×

(গ) নাশয়ন্নপি যাতি মহীং ততঃ ॥৩

নরপতিরভবত্ স্ব – ⏑ – –

⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – বৈরি-বী-

৩। (ক) র-বৃন্দঃ।

ক্ষিতিপুরপরিঘায়মানবাহু-

র্নিরুপরি(ধি -ধর্ম-ধনো'থ ধর্ম্মপালঃ ॥৪

তত্ পুত্রো 'জনি দেবপা

(খ) [ল-নৃপতিঃ*] – – ⏑ – – – –

– – – ⏑ ⏑ – ⏑ –

(গ) ভিরখিলামিষ্জিত্য পৃথ্বীং ভুজৈঃ (?)

– – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – – – ⏑ – – ⏑ –

– – রোধ-

৪। (ক) সি কেনিপাতশিখরীকৃত্যাপরস্যাদধে ॥ ৫

অথান্বয়ে 'স্মিন্নয়শক্তিশালী

জয়দ্বিপালান-বিশাল-

(খ) [বাহুঃ ।*]

⏑ – – – – ⏑ ⏑ – ⏑ – –

⏑ – ⏑ – [বিগ্র *]-

(গ) হপাল আসীৎ ॥ ৬

জয় ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – – – ⏑ – – ⏑ – –

⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – – – ⏑ নস্তস্য রা-

৫। (ক) জ্জঃ।
ভৃগুপতিরিব কীর্ত্তিন্ধাম ধর্ম্মাদ্ভুতানাং
জগতি বিজয়িবীর্য্যো 'মুদ্রয়দ্ভুভুষং(জাং) যঃ ॥ ৭
বৃহদ্গৃহ—

(খ) ⏑ ⏑ – ⏑ – –
⏑ – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – – [।*]
⏑ –

(গ) ⏑ নী ধর্ম্মরতে('*)ত্র নব্যং
⏑ – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – – [॥ *] ৮
⏑ – – – – – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – তেন জ-

৬। (ক) নয়া-
স্বভুবে 'স্যাং শ্রীমান্ স খলু নয়পালো নয়নিধিঃ।
চিরান্নান্দ্যাং স্কন্দে গতবতি জগত্রাতুমপরঃ
⏑

(খ) – – – – – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ ⏑ ⏑ – [॥ *] ৯
× ×

(গ) মা বিনয়েনেব ন × × × × × × × (।*]
× × × × × × × × × × × × × × × × × × [॥ *] ১০
× × ব তদতি-

৭। (ক) প্রসারিপদ্মং কুবলয়ভূষণমুজ্জ্বলং যঃ।
অরুণমৃদুপদো'বদাতপক্ষশ্চিরমুপশোভয়তি স্ম [॥ *]১১

(খ) – – – – ⏑ – – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ – – ⏑ – –

(গ) স্ফীতে*] কীর্ত্তিপ্রবাহে ম ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – – – – – ⏑ – – [।*]
– – – – [সহেলং*] রিপু-

৮। (ক) বলবিজয়োজ্জৃম্ভিতে শৌর্য্যরাশা-
বুজ্জ্বালে 'ট্টালমালানল ইব কলশঃ কাঞ্চনো'ভূদলক্ষ্যঃ ॥ ১২
সেনা প্রী

(খ) ⏑ ⏑ – ⏑ – – ⏑ ⏑ ⏑ – – – ⏑ – – ⏑

(গ) ⏑ পাথসাং স্থগিত – – – ⏑ – – – ⏑ – [।*]
– – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – – – – ⏑ – রান্ ব[ভৌ]

৯। (ক) চ দ্বৈতং রজসামুপৈতি মহিমা 'ত্রাচ্চৈরহো পার্থিবঃ(বম্) ॥ ১৩
আত্তদিগ্বিজয়ায় নতা যতো
রক্ষতিস্ম নৃপ

(খ) – ⏑ – – ⏑ – [।*]

(গ) – ব নৃপ-লাঞ্ছনস্য বা ॥ ১৪
– – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ – – ⏑ –
– – চারি-মহী-

১০। (ক) ভুজামুপনয়ন্ যস্য প্রতাপো রুজং(জম্)।
একো 'প্যুল্লসতি স্ম পঙ্কজসুতা-প্রাপ্তো'থ চ প্রাপয়-
ত্তান্ পঙ্কত্ব

(খ) ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – – – ⏑ – – – ⏑ – [॥ *] ১৫
– – –

(গ) ⏑ তরাদ্ভু বো লঘুতয়া – – ⏑ – – – –
– – – ⏑ ⏑ – – ⏑ – ⏑ ⏑ – – – – ⏑ – প্রাপিতাঃ।

১১। (ক) – – – যুধি যেন চেদিনৃপতেঃ কর্ণস্য হত্বা ভটান্
কোটীকৃত্কটবিক্রমেণ বিদধে লোকত্রয়স্য

(খ) [প্রিয়ম্ ॥ *] ১৬
– – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – – – – ⏑ – [তে *]-

(গ) জসা
ব্যাসো 'পার-পরাক্রমেণ ⏑ – – – ⏑ – – ⏑ [।*]
– – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ মতিনা কী

১২। (ক) – ⏑ জায়াঃ ক্ষণং
বিশ্রামার্থমিবৈষঃ জঙ্গম-জয়স্তম্ভো বভৌ যো'র্পিতঃ ॥ ১৭
পৃথ্বীনাথং স্কন্দদেশস্য জিষ্ণুং
পৃথ্বী

(খ) . – – – ⏑ – – ⏑ – – [।*]

– – – – – ⏑ – – ⏑ – – –

(গ) – স্ত্যা সার্দ্ধন্তত্র তেনে নিজা – ॥ ১৮

ন – ⏑ – ⏑ ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – –

– – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ মহো মহি-

১৩। (ক) ম্নঃ।

লীনো বলদ্গিরিগণো 'দ্রি-দরীষু নক্ত-

মুল্লাসি কৌশিক কুলস্বহুমন্যতে স্ম ॥ ১৯

বিবিধ-সৌধ-সুরালয়-গো-

(খ) [পুর *

⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – – ⏑ – [।*]

⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ –

(গ) শ্রস্বিণী শ্রিয়াঃ

প্রমদভুবনকাপি – ⏑ – [।*] ২০

– – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ – – – ত্করে রোহণো

মুর্চ্ছি-

১৪। (ক) ন্মে রথবর্ত্মে রোত্স্যতি [স*] [ই*] তার্ক্শ্চকম্পে স্ফুটং(টম্)।

অন্যত্ কল্পতরোস্তলে ফলভরন্যঞ্চল্লতাগাঃ সল-

চ্ছায়ে—

(খ) ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – – ⏑ – – ⏑ – [॥*] ২

– – – – ⏑

(গ) বিপ্রৈরধরি ন ধরণীভৃদ্ভির – ⏑ – –

– – – – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ – পার্থিবেন্দুঃ।

১৫। (ক) অন্তর্যত্রাম্বরালোন্নতিরিহ নৃপতি – ⏑ ধর্ম্মেচ নাভূ-

ন্না যো 'নেনেত্যুদগ্রাঙ্গুলিরিব ধরয়োদ্ধারিতা ভাতি

(খ) – – [॥*] ২২

– – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – – – ⏑ – – [সু*]-

(গ) ধা-

শুভ্রং কাঞ্চন-সিংহ-কুম্ভ-শিরসং শ্বেত ⏑ – – ⏑ – [।*]

– – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ তায় স্বাহু শৈল্যা(ত্যা)-

১৬। (ক) ততে

পাদৈঃ সার্দ্ধমিবাশ্রিতো হিমগিরিঃ স্বর্ন্ন - বম্ ॥ ২৩

তদ্দক্ষিণেনায়তনং পুরারে-

র্যেনোন্নতঃ শৈ-

(খ) [ল*] ⏑ – ⏑ – – [।*]

– – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – –

[তপস্বি*]-

(গ) বাসায় মঠো স্বিভূমঃ ॥ ২৪

শিরোলসত্কুম্ভ ⏑ – ⏑ – –

পৃথিব্যথ গ্রাব-

১৭। (ক) গৃহান্ বিধায়

রুদ্রানিহৈকাদশ চ ন্যধত্ত ॥ ২৫

মাতুঃ কৃতে ’ত্রৈব সু[বর্ন্ন কু*] স্ত-

ভাজিষ্ণুমূর্দ্ধাং বলভীং শিলাভিঃ [।*]

(খ) – – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – –

– – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑

(গ) দেবী ॥ ২৬

শৈলানি মন্দিরাণ্যত্র মন্দরাঙ্কানি যানি চ [।*]

× × × × × × × × × তা যা নব-চণ্ডিকাঃ ॥ ২৭

১৮। (ক) দেবীকোটে হেতুকেশস্য শম্ভো-

র্যঃ প্রাসাদং শৈলমুচ্চৈরকার্ষীৎ।

কালেনাসৌ ভূয়সা কুন্তজাজ্ঞাং

বিস্মৃত্যেব--

(খ) ⏑ – – ⏑ – – [।।*] ২৮

(গ) ঞ্চ ব্যবৃতাথ শৈলী

বিদ্যা

– – ॥ ২৯

[ক্ষেমে*]শ্বরস্যায়তনং

১৯। (ক) প্রজানাং

ক্ষেমঙ্করো গ্রাবময়ং মপরেঃ (চকার)।

যো মূর্দ্ধি দীপ্তায়ত-শাতকুম্ভ-

কুম্ভং ব্যধাত্তত্র মহাসরশ্চ ॥ ৩০

দক্ষিণে[ন]

(খ) ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – –

– ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – – [।*]

– ⏑ –

(গ) ঙ্গমকৃতোর্দ্ধ-বিসপ্ত-

রুক্ম-কুম্ভ-রুচিরোচিত – – [।।*] ৩১

× × × × × × × × × × × × × যয়া মঠশ্চ সর

২০। (ক) সীশ্চ।

ধাম বরাক্ষেশ্বর ইতি শম্ভোরপি শৈলমুত্তালং(লম্) ॥ ৩২

উচ্চদেব ইতি যো ভুবি সাক্ষা-

দ্রুক্মিণীং প্রণয়তো'স্তি

(খ) ⏑ – – [।*]

– ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – –

– ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑

(গ) নাশ্চং(শ্চম্) ॥ ৩৩

আরোগ্য-শালামারোগ্য-হেতৌ রোগবতাং নৃণাং(ণাম্)।

তথা বৈদ্যবাসঃ [কৃতো মন্দি*] রস্যাস্তিকে 'বারা-

২১। (ক) ৎ ॥ ৩৪

ঘণ্টীশং যঃ স্বনগরে ন্যধাৎ ক্ষেমায় দেহিনাং(নাম্)।

চতুঃষষ্ঠ্যা চ মাতৄণাং পরীতস্তত্র ভৈরবং(বম্) ॥ ৩৫

স্বনাম-ল× ×

(খ) × × × × × × × × × × [।*]

× × × × × × × × × × × × [মৌ*]-

(গ) ধ-সন্নিভং(ভম্) ॥ ৩৬

নীহারগিরি-বিশাল × × × × × × × × × × × × [।*]

× × ভয়-পাণিগ্র

২২। (ক) × সর্ব্বত্র দর্শনে মাতাং(মতাম্) ॥ ৩৭

বটেশ্বরস্য বিকটশ্চম্পায়ামালয়ো 'শ্মভিঃ ।

যেন ব্যধায়ি নবমঃ কুলাচল ইবো[চ্ছ্রি*]-

(খ) [তঃ ॥ *] ৩৮

(গ) মকরোচ্ছিলাবলীভিঃ।

নিঃ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – –

⏑ ⏑ – – ⏑ – ন্নরাণাং(ণাম্) ॥ ৩৯

২৩। (ক) মহে-

[ন্দ্র]পাল-চর্চ্চায়া মহেন্দ্র-সদৃশোদয়ঃ।

যঃ শৈলীং বড়ভীং শৈলে সোপানেন সহাকরোৎ ॥ ৪০

সোমতীর্থে 'করোৎ কুণ্ডং

(খ) × × × × × × × × [।*]

× × × × × × × × × × × × × ×

(গ) পি চ ॥ ৪১

শৈলাদূৰ্দ্ধং যঃ প্রহাসা ⏑ – –

– – – – – ⏑ – – ⏑ – – [।*]

– – – – – ⏑ – – সুধাম্ন

২৪। (ক) নিন্দত্যুত্থত্ পূষণং পূর্ব্বশৈলং(লম্) ॥ ৪২

ধর্ম্মারণ্যে মতঙ্গস্য বাপী যেন পুনর্ন্নবা।

চক্রে শিলাভিরুত্তুঙ্গং মতঙ্গেশ্বর-

(খ) [মন্দিরম্ ॥*] ৪৩

(গ) – রং

গম্ভীরে মধুরা ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – – – ⏑ – – – [।*]

– – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ত্তরী – যা

২৫। (ক) পরং মা পিতু-

র্দ্দস্তা বিরহশ্চিরং প্রিয় ইতি চ্ছন্দস্তজন্তাম্যতি ॥৪৪

যঃ সাগরে ভূপতিরত্র হৈম-

ত্রিশূল

(খ) – – ⌣ – ⌣ – – [।*]

(গ) ত্ পাণিরুদস্থিতেব ॥ ৪৫

ন চায়ত ⌣ – ⌣ – ⌣ ⌣ ⌣ – ⌣ – – ⌣ –

⌣ – ⌣ ⌣ ⌣ – নয়ে স্বপুর-

২৬। (ক) সন্নিভো ভাস্বতঃ।

যদীয়-রুচি-লোভিতঃ স ভগবান্নভঃ-পান্থতাং

ত্যজেদিতি বিচিন্তয়ন্নিয়তমাহি

(খ) – – ⌣ – [॥*] ৪৬

(গ) রশ্চকার।

তয়োর্বন – ⌣ ⌣ – ⌣ – –

⌣ – ⌣ – – ⌣ ⌣ – ⌣ – – [॥*] ৪৭

– – – ⌣ ⌣ – ⌣ ভিঃ

২৭। (ক) ক্ষিতিভুজাং বিক্রান্তি-বীজৈরিব

স্ফীতং খোলমকারি রুক্ম-রচিতং শ্রীবৈদ্যনাথস্য তৎ।

স্থাণুঃ পল্লবিতো বভূব

(খ) ⌣ ⌣ – – – ⌣ – – ⌣

(গ) — হৈমশ্চ যেনার্পিতঃ [॥*] ৪৮

× × × × × × × × × × × × × × × × [।*]

× × × × × × × × তত্র নি-

২৮। (ক) র্বাহ-সিদ্ধয়ে ॥ ৪৯

যো 'ট্টহাসস্য কলশং প্রাসাদে কাঞ্চনং ন্যধাৎ।

দ্যৌর্দ্বিসূর্যায়তে যেন দূরালোকোচ্ছল-ত্বিষা ॥ ৫০

×

(খ) × × × × × × × × × × × × × × × [।*]
× × × ×

(গ) × সর্প্পা যতো(’*)পি × × × × × [।।*] ৫১
× × × × × × × × × × × × × × × [।*]
× × × × × × × × × × সাগ-
রসঙ্গমে ॥ ৫২

২৯। (ক) রৌপ্যঃ সদাশিবো হৈমৌ চণ্ডিকা-বিঘ্ননায়কৌ [।*]
কারিতৌ কারিতং যেন তয়োর্হৈমঞ্চ পীঠকং(কম্) ॥ ৫২
চণ্ডাংশু ×

(খ) × × × × × × × × × × × × [।*]
× × × × × × × × × × ×

(গ) × দিকস্তথা ॥ ৫৪
শশি × × × × × × × × × × × × × × [।*]
[রাজ*]তং রবিং

৩০। (ক) চক্রে যো হৈমং নবগ্রহাম্ভোজং (জম্) ॥ ৫৫
হৈমীং প্রাতস্ফুটমণিমহঃ-শ্রেণি-স্পষ্টেন্দ্রচাপ-
চ্ছায়াং শম্ভোঃ স্বয়মহরহঃ পূজ্যতে

(খ) – ‿ – — [।*]

– – [চ*]-

(গ) পোত্করমরপ – – ‿ – – – [॥ *] ৫৬
– – ‿ – ‿ ‿ ‿ – ‿ ‿ – ‿
– – ‿ – [প্র*]

৩১। (ক) ভূতি দানবরং দ্বিজেভ্যঃ
প্রাদত্ত যঃ সবিধি তন্ত্রিপুবর্গ্গহর্গ্গং
তদ্দুর্গ্গতিঃ সপদি ভীতিবতীব ভেজে ॥ ৫৭
সো

(খ)
– – [।*]

(গ) নাদনয়োঃ সদৈব

– – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – – [॥ *] ৫৮

× × × × × × × × × × × × ×

৩২। (ক) নির্ম্মমে।

মঠঞ্চ তাপসস্থিত্যৈ নিজে তু নগরে সরঃ ॥ ৫৯

ইষ্টাপূর্ত্তং নির্ম্মমে'ন্যৎ স্বয়ং ষ-

দ্দেবী যচ্চাকারয়ন্ত-

(খ-গ) [ত্ কুমারঃ ।*]

– – – – – ⏑ – – ⏑ – –

– – – – – ⏑ – – ⏑ – – [॥ *] ৬০

৩৩। (ক) তন্নস্তচ্চক্রবর্ত্তীহ সঃ।

কৃত্বামুং মঠমেতমত্র নিদধে বৈকুণ্ঠমস্মিন্নয়-

ন্দেবো রৈবতভূভৃতীব রুচিরে

(খ-গ) – – ⏑ – – ⏑ – [॥ *] ৬১

– – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – –

– – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – – [।*]

– – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – –

– – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – – [॥ *] ৬২

× × × × [বা*]-

৩৪। (ক) রিচরেণাবট ইব তেনায়মঘট্ট এষ কৃতঃ।

ইয়মপি বলভী গ্রাবভিরুত্তুঙ্গা পিঙ্গলার্য্যায়াঃ ॥ ৬৩

পর্য্যায়-পর

(খ-গ) × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × [।*]

× × × × × × × × × × × × × × × ×

× × [॥ *] ৬৪

৩৫। (ক) যো নির্ধাতঃ পৃথিবীতলৈক-তিলকো 'ভূৎপ্লক্ষপুঞ্জো(’*)গ্রতঃ
আসীত্তত্র মসাণদেব ইতি তত্‌পত্নী চ পদ্মেতি যা
তস্যাং ত্ব-

(খ-গ) [স্য সুতো 'ভবৎ*] ‿ ‿ ‿ – – – – ‿ – – · [।।*] ৬১

৩। ব্যাখ্যা

লেখটি ভগবান্ বাসুদেব অর্থাৎ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। পরে দেখা যাইবে যে, যিনি লেখটি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, তাঁহার ভক্তিপাত্র ছিলেন প্রধানতঃ শিব। তাই সূচনায় বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিজ্ঞাপন সম্ভবতঃ প্রশস্তি-রচয়িতা কবির বৈষ্ণবত্বের দ্যোতক।

উদ্ধৃত পাঠ হইতে দেখা যাইবে যে, সিয়ান শিলাপ্রশস্তির অধিকাংশ শ্লোকেরই অংশ-বিশেষ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ শ্লোক হইতেও কখনও কখনও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। নিম্নে আমরা শ্লোকগুলির ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করিয়া উহার মূল্য বিচারের চেষ্টা করিব।

১। খণ্ডিত। শ্লোকটিতে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ ইহাতে সূর্যকে বিষ্ণুর দক্ষিণ নয়নরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।[২]

২। খণ্ডিত। এই শ্লোকে সমতটদেশের অর্থাৎ আধুনিক কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলের একটি নদের উল্লেখ করা হইয়াছে। নদটি ব্রহ্মপুত্র হইতে পারে। কোন এক সময় জনৈক নরপতির নৌবহরের অরিত্র বা দাঁড়ের আঘাতে ঐ নদগর্ভ বিদীর্ণ হইয়াছিল; তখন হইতে নদটি ভয়ে সেই নরপতির আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া আসিতেছে এবং দ্বাদশ বৎসরে একবার মাত্র উহাতে বন্যা হইতেছে। এই ধরণের একটি কথা ইহাতে আছে বলিয়া বোধ হয়।[৩] এই রাজা কে ছিলেন, তাহা বলা যায় না। তবে চতুর্থ শ্লোকে ধর্মপালের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, ইনি তাঁহার পিতা গোপাল (আঃ ৭৫০-৭৫ খ্রীঃ) হইতে পারেন।

৩। খণ্ডিত। সম্ভবতঃ এ স্থানে পূর্বোক্ত নরপতি কর্তৃক শত্রুনাশ এবং তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ আছে।

৪। খণ্ডিত। এখানে পূর্বোক্ত নরপতির উত্তরাধিকারীর উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি মহাপরাক্রান্ত এবং ধার্মিক রাজা ধর্মপাল (আঃ ৭৭৫-৮১২ খ্রীঃ)।

৫। খণ্ডিত। শ্লোকটিতে ধর্মপালের পুত্র রাজা দেবপালের (আঃ ৮১২-৫০ খ্রীঃ)

নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি শত্রুর নৌবহর অধিকারপূর্বক কেনিপাত অর্থাৎ হালগুলি নৌকার উপরে রাখিয়া উহা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

৬। খণ্ডিত। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অতঃপর এই রাজবংশে অর্থাৎ পালবংশে বিগ্রহপাল নামক রাজা সিংহাসন লাভ করেন। আমরা জানি যে, দেবপালের পর তদীয় পুত্র শূরপাল (আঃ ৮৫০-৫৮ খ্রীঃ) এবং তাঁহার পর সম্ভবতঃ তাঁহাকে উৎখাত করিয়া দেবপালের জনৈক পিতৃব্যের পৌত্র প্রথম বিগ্রহপাল (আঃ ৮৫৮-৬০ খ্রীঃ) রাজা হন। বিগ্রহপালের উত্তরপুরুষদিগের তাম্রশাসনে শূরপালের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সিয়ান শিলালেখেও তাঁহার উল্লেখ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, নবম শ্লোকে রাজা নয়-পালের (আঃ ১০২৭-৪৩ খ্রীঃ) উল্লেখ হইতে মনে হয়, এই বিগ্রহপাল নয়পালের পিতামহ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (আঃ ৯৭২-৭৭ খ্রীঃ), প্রথম বিগ্রহপাল নহেন।

৭। খণ্ডিত। বর্তমান শ্লোকে পূর্বোল্লিখিত রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র এবং পরবর্তী শ্লোকের নয়পাল নামক নরপতির পিতা প্রথম মহীপালের (আঃ ৯৭৭-১০২৭ খ্রীঃ) নাম ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তিনি ভৃগুপতি অর্থাৎ পরশুরামের ন্যায় নৃপতিগণকে স্বীয় কীর্তি-চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন।

৮। বিশেষভাবে খণ্ডিত। পূর্ব শ্লোকে বর্ণিত নরপতির সম্পর্কে এস্থলে বৃহদ্‌গৃহ অর্থাৎ বিহারের অন্তর্গত বর্তমান শাহাবাদ ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অথবা কারূষ নামক ঐ দেশের রাজধানীর উল্লেখ আছে। মহীপালের সময়ে (আঃ ১০১৯ খ্রীঃ) বিহারের কোন কোন অংশে কলচুরি কর্ণের পিতা গাঙ্গেয়ের (আঃ ১০১৫-৪১ খ্রীঃ) অধিকার স্বীকৃত হইত। আবার ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ছাড়াও বারাণসীতে মহীপালের অধিকার প্রসারিত হয়। বোধ হয় বর্তমান শ্লোকে শাহাবাদ অঞ্চলে পাল-কলচুরি সংঘর্ষের দ্যোতক কোন বিষয়ের উল্লেখ ছিল।[৪]

৯। খণ্ডিত। বর্তমান শ্লোকে পূর্ববর্তী নরপতির ঔরসে এবং তদীয় মহিষীর গর্ভে রাজা নয়পালের জন্ম হয় বলিয়া বলা হইয়াছে। দীর্ঘকাল জগৎপালন করিয়া স্কন্দ-কার্তিকেয় ক্লান্ত হইয়া পড়ায় নয়পাল পৃথিবীর রক্ষায় নিযুক্ত হন, শ্লোকটিতে এইরূপ কোন কথা ছিল বলিয়া বোধ হয়। কার্তিকেয়ের জগৎপালনে নিযুক্ত হইবার পৌরাণিক কাহিনী তত জনপ্রিয় নহে।

১০। অত্যন্ত খণ্ডিত।

১১। খণ্ডিত। দশম ও একাদশ শ্লোকে রাজা নয়পালের বর্ণনাই অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

১২। খণ্ডিত। রাজার শৌর্যরাশির উজ্জ্বলতায় অট্টালিকাসমূহের শিখরস্থিত স্বর্ণকলশের ঔজ্জ্বল্য ডুবিয়া গিয়াছিল। এখানে এইরূপ একটি কথা আছে।

১৩। খণ্ডিত। এ শ্লোকে সেনাদল ও জলরাশির উল্লেখ এবং পার্থিব অর্থাৎ রাজার মহিমা দ্বারা মণ্ডিত হইবার কথা দেখা যায়।

১৪। খণ্ডিত। এখানে দিগ্বিজয়ী রাজা অবনত শত্রুগণকে রক্ষা করিতেন, এইরূপ একটি কথা আছে এবং রাজার লাঞ্ছনের (নৃপলাঞ্ছন বা royal crest) উল্লেখ দেখা যায়।

১৫। খণ্ডিত। রাজার প্রতাপে শত্রুনৃপতিগণের রোগ অর্থাৎ মানসিক অস্বাস্থ্য উপস্থিত হইয়াছিল ; তিনি একাই পাঁচজন হইয়া পরম উল্লাসে শত্রুবর্গের পঞ্চত্ব অর্থাৎ মৃত্যু ঘটাইতেছিলেন। শ্লোকটিতে এইরূপ কথা আছে।

১৬। খণ্ডিত। এ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, মহাপরাক্রমশালী রাজা চেদিরাজ কর্ণের কোটি কোটি সৈন্য ধ্বংস করিয়া ত্রিজগতের অর্থাৎ প্রজাগণের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে পশ্চিমদেশের রাজা কর্ণ্য (কর্ণ) নয়পালের রাজত্বকালে মগধ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন এবং বৌদ্ধ সাধু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় উভয় নরপতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই ঘটনা দীপঙ্করের তিব্বত গমনের অর্থাৎ ১০৪১ বা ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল।[৫] আবার সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত টীকা অনুসারে নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল ডাহল দেশের অর্থাৎ বর্তমান জব্বলপুর অঞ্চলের রাজা কর্ণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন।[৬] কিন্তু কর্ণ যে বাংলাদেশের বীরভূম জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, বীরভূমের পাইকোড় গ্রামে আবিষ্কৃত একটি শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ তাঁহার লেখ হইতে তাহা জানা যায়।[৭] সিয়ান লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, বীরভূম অঞ্চলের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াই কর্ণকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। বিগ্রহপালের সহিত কর্ণের যুদ্ধ রাজা নয়পালের রাজত্বকালীন ঘটনা হইতে পারে। বিগ্রহপাল হয়ত তখন তাঁহার পিতার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন।

১৭। খণ্ডিত। শ্লোকটির প্রথম ভাগে রাজাকে যাহাদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি কথা বোধ হয় এই যে, তিনি ব্যাসের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে কাহারও ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য একটি জঙ্গম অর্থাৎ চলিতে সমর্থ জয়স্তম্ভ অর্পিত হইয়াছিল, বলা আছে। উচ্চ স্তম্ভ বা মন্দিরের বর্ণনায় এমন বলা যায় যে, আকাশে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া সূর্যের রথের অশ্বগণ ক্ষণকালের জন্য উহার শিখরে বিশ্রাম করিতে পারিবে। কিন্তু এখানে একটি বস্তুকে রাজার সচল জয়স্তম্ভের ন্যায় বলা হইয়াছে সম্ভবতঃ নৃপতি কর্তৃক কোন সূর্য মন্দিরে একটি রথ প্রদত্ত হইয়াছিল।

১৮। খণ্ডিত। এই শ্লোকে সুহ্মদেশ অর্থাৎ রাঢ়ের জিহ্ম অর্থাৎ ক্রূর নরপতির উল্লেখ দেখা যায়। দেশটি এ সময় পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুহ্মরাজকে ক্রূর বলার কারণ হয়তো এই যে, তিনি পাল সম্রাটের সামন্ত হইয়াও কর্ণের পক্ষাবলম্বী হন এবং

তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কর্ণ বীরভূম পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন। বর্তমান শ্লোকে সুহ্মরাজের পরাজয় বা শাস্তিবিধানের উল্লেখ ছিল বলিয়া বোধ হয়।

১৯। খণ্ডিত। শ্লোকটিতে চলন্ত পর্বত অর্থাৎ হস্তিগণের রাত্রিকালে গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়া কৌশিক সমূহ অর্থাৎ পেঁচাদ্বারা অভ্যর্থিত হইবার কথা আছে। বোধ হয় ইহা কোন যুদ্ধযাত্রার দ্যোতক।

২০। খণ্ডিত। এ শ্লোকে নানাপ্রকারের অট্টালিকা, মন্দির, গোপুর প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। ইহা কোন নগরের বর্ণনা হইতে পারে।

২১। খণ্ডিত। এই শ্লোকের প্রথমার্ধে রোহণ গিরি এবং দ্বিতীয়ার্ধে কল্পতরুর উল্লেখ আছে। এ দুইটি প্রার্থীদিগকে সমস্ত কাম্যবস্তু দান করে বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণে বলা হইয়াছে যে, সূর্য সম্ভবতঃ কোন উচ্চ মন্দির দ্বারা আকাশে তাঁহার রথ-বর্ত্ম রুদ্ধ হইবে, এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার সহিত বিংশশ্লোকে উল্লিখিত মন্দিরাদির সম্পর্ক বুঝা যায়; কিন্তু রোহণ পর্বত ও কল্পবৃক্ষের সহিত ইহার সম্পর্ক তত স্পষ্ট নহে।

২২। খণ্ডিত। শ্লোকটিতে রাজা (পার্থিবেন্দু) এবং সম্ভবতঃ তাঁহার নির্মিত কোন অত্যুচ্চ মন্দিরের উলেখ আছে।

২৩। খণ্ডিত। ইহাতে মন্দিরের বর্ণনা অনুসৃত হইয়াছে এবং উহার সুধাশুভ্র বর্ণ ও শিখরস্থিত স্বর্ণময় সিংহ ও কলশের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহাতে মন্দির-সংলগ্ন কোন জলাশয়েরও উল্লেখ ছিল এবং মন্দিরটিকে হিমালয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছিল।

২৪। খণ্ডিত। এ শ্লোকে পূর্ববর্ণিত মন্দিরের দক্ষিণ দিকে নির্মিত পুরারি অর্থাৎ শিবের মন্দির এবং শৈবসাধুগণের বাসের জন্য উহার অন্তর্গত একটি দ্বিতল মঠের উল্লেখ দেখা যায়।

২৫। খণ্ডিত। এখানে শিবমন্দিরের শিখরস্থিত কলশ এবং শিলাগৃহসমূহে একাদশ রুদ্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে।

২৬। খণ্ডিত। এ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ঐ মন্দিরেই জগন্মাতার জন্য শিলাদ্বারা স্বর্ণকলশযুক্ত শিখরশোভিত একটি বলভী (ছাদের উপরের গৃহ বা চিলে কুঠরী) নির্মিত হইয়াছিল। শ্লোকের 'মাতুঃ [কৃতে]' এবং 'দেবী' শব্দগুলি আমরা জগন্মাতা অর্থে গ্রহণ করিয়াছি। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, ঐ বলভী রাজার মাতৃদেবীর অর্থে নির্মিত হইয়াছিল।

২৭। খণ্ডিত। শ্লোকটিতে শিলানির্মিত মন্দর পর্বতের ন্যায় কতকগুলি মন্দিরের কথা বলা হইয়াছে; সম্ভবতঃ ঐগুলিতে নয়টি চণ্ডিকামূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

২৮। খণ্ডিত। শ্লোকের প্রথমভাগে শিলা দ্বারা দেবীকোট অর্থাৎ উত্তরবাংলায় বালুরঘাটের নিকটবর্তী বাণগড়ে হেতুকেশ নামক শিবের উচ্চমন্দির নির্মাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। শেষাংশে সম্ভবতঃ বলা হইয়াছিল যে, মন্দিরের উচ্চতা দেখিয়া বোধ হয় যেন বিন্ধ্যপর্বত অগস্ত্যের আজ্ঞা ভুলিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। অগস্ত্য ও বিন্ধ্যপর্বতের পৌরাণিক কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। ভারতবর্ষের অন্যত্রও হেতুক বা হেতুকেশ সংজ্ঞক শিবের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮] শিবের একজন গণের নাম হেতুক; তাই নামটি শিবের নন্দীশ বা নন্দীশ্বর নামের অনুরূপ।

২৯। বিশেষরূপে খণ্ডিত। সম্ভবতঃ এখানে কোন শৈলময়ী প্রতিমা কিংবা বলভীর উল্লেখ ছিল।

৩০। এই শ্লোকটিকে অখণ্ডিত বলা যায়, যদিও ইহার প্রথম অক্ষরদ্বয় অস্পষ্ট। প্রজাগণের মঙ্গল-বিধানকারী রাজা ক্ষেমেশ্বরের শিলাময় এবং স্বর্ণকলশশোভিত শিখরযুক্ত মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের সন্নিকটে একটি বৃহৎ সরোবরও খনিত হয়।

৩১। খণ্ডিত। ইহাতে সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত মন্দির ও সরোবরের দক্ষিণে অপর একটি মন্দির নির্মাণের কথা ছিল। ইহার শিখরে স্বর্ণকলশ শোভা পাইত।

৩২। খণ্ডিত। এই শ্লোকে একটি মঠ, উহার নিকটবর্তী সরোবর এবং বরাক্ষেশ্বর নামক শিবের শিলানির্মিত মন্দিরের উল্লেখ দেখা যায়।

৩৩। খণ্ডিত। এ শ্লোকে সম্ভবতঃ উচ্চদেব সংজ্ঞক রুক্মিণী-প্রণয়ী অর্থাৎ বাসুদেব কৃষ্ণের প্রতিমার উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩৪। অখণ্ডিত। এখানে রোগীদের রোগশান্তির জন্য আরোগ্যশালা এবং মন্দিরের নিকটে বৈদ্যগণের আবাসস্থান নির্মাণের কথা দেখা যায়। সেকালে অনেক বড় বড় মন্দিরের সহিত আরোগ্যশালা (hospital) নির্মিত হইত। উহাতে স্থানীয় জনসাধারণেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয়। এখানে আরোগ্যশালাটিকে সাধারিণভাবে 'রোগীদের জন্য' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩৫। অখণ্ডিত। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, রাজা স্বনগরে মানুষের মঙ্গলের জন্য ঘন্টীশনামক ভৈরব এবং তাঁহার চতুর্দিকে চতুঃষষ্টি মাতৃকামূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এস্থলে 'স্বনগর' শব্দে মূর্তিপ্রতিষ্ঠাতা রাজার রাজধানী বুঝাইতে পারে। এও হইতে পারে যে, ঘন্টীশের নামানুসারে একটি ক্ষুদ্র নগর নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যস্থিত প্রধান মন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। এই মন্দিরটি অনেকটা ভেড়াঘাট (জব্বলপুর জেলা) ও অন্যান্য স্থানের চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরের অনুরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়।

৩৬। খণ্ডিত। এখানে রাজার স্বনামাঙ্কিত কোন দেবমূর্তি এবং রাজপ্রাসাদ-সদৃশ কোন মন্দিরের উল্লেখ ছিল বলিয়া বোধ হয়।

৩৭। খণ্ডিত। এখানে সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত মন্দিরটিকে হিমালয়ের ন্যায় বিশাল বলা হইয়াছিল। শেষাংশে জগন্মাতার উল্লেখ থাকা অসম্ভব নহে।

৩৮। মাত্র দুইটি বর্ণ খণ্ডিত। রাজা চম্পানগরীতে বটেশ্বরের শিলামন্দির নির্মাণ করেন; ইহা নবম কুলাচলের ন্যায় বিশাল ছিল। চম্পা বর্তমান ভাগলপুর শহরের একাংশে অবস্থিত ছিল। বটেশ্বর শিবের বর্তমান মন্দির ভাগলপুর শহরের ২৫।৩০ মাইল পূর্বে পাথর-ঘাটা নামক স্থানে অবস্থিত। কুলাচল প্রকৃতপক্ষে সাতটি, কিন্তু হিমালয় নামক বর্ষপর্বতকে ভ্রমবশতঃ কুলপর্বত মনে করিয়া কেহ কেহ কুলপর্বতের সংখ্যা আট গণনা করিতেন। আমাদের প্রশস্তি-রচয়িতা এই দলে।

৩৯। অত্যন্ত খণ্ডিত। এখানে শিলাসমূহদ্বারা মন্দিরাদি কোন বস্তু নির্মাণের উল্লেখ ছিল।

৪০। অখণ্ডিত। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রের ন্যায় নরপতি প্রাচীন রাজা মহেন্দ্র-পালের স্থাপিত চর্চা অর্থাৎ জগন্মাতার শৈলমন্দিরে সোপানের সহিত শিলানির্মিত বলভী তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। উল্লিখিত মহেন্দ্রপাল (আঃ ৮৮৫-৯০৮ খ্রীঃ) গুর্জর-প্রতীহারবংশের রাজা ছিলেন; বিহার ও বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল। তাম্রশাসনে দেখা যায়, মহেন্দ্রপাল এবং তাঁহার পিতা ভোজ উভয়ে 'পরমভগবতীভক্ত' ছিলেন।[৯]

৪১। অতিমাত্রায় খণ্ডিত। এ শ্লোকে রাজা সোমতীর্থের কোন মন্দিরে কলশ (সম্ভবতঃ স্বর্ণকলশ) নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ জানা যায়। সোমতীর্থের অবস্থান অনুমান করা কঠিন।

৪২। খণ্ডিত। সম্ভবতঃ কলশযুক্ত পূর্বোক্ত মন্দিরটিকে এখানে উদীয়মান সূর্য-শোভিত পূর্বশৈলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৪৩। মাত্র তিনটি বর্ণ খণ্ডিত। এ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, রাজা ধর্মারণ্যে মতঙ্গের সরোবর সুসংস্কৃত করিয়াছিলেন এবং শিলাদ্বারা মতঙ্গেশ্বর মন্দিরটি অনেক উচ্চ করিয়া দিয়া-ছিলেন। ধর্মারণ্য ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা বোধহয় গয়া অঞ্চলের কোন পবিত্রস্থান।

৪৪। খণ্ডিত। সম্ভবতঃ মতঙ্গেশ্বর শিবের মন্দিরে তাঁহার কন্যারূপে কল্পিতা শ্রী বা লক্ষ্মীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই বলা হইয়াছে যে শ্রী যেন তাঁহার পিতার নিকট হইতে দীর্ঘকাল দূরে না থাকেন।

৪৫। খণ্ডিত। সম্ভবতঃ এখানে বলা হইয়াছে যে, রাজা (ভূপতি) সাগরে অর্থাৎ গঙ্গাসাগরের মন্দিরে একটি সোনার ত্রিশূল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৪৬। খণ্ডিত। এই শ্লোকে একটি বৃহৎ সূর্য মন্দিরের উল্লেখ ছিল বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরটি ছিল সূর্যের নিজের পুরীর ন্যায়; তাই ভাবা হইয়াছিল যে, তিনি আর স্বর্গপথে যাতায়াত না করিয়া এই মন্দিরেই অবস্থান করিবেন।

৪৭। অত্যন্ত খণ্ডিত। এস্থলে কোন একটি বস্তু নির্মাণ করিবার কথা আছে।

৪৮। খণ্ডিত। এস্থলে বৈদ্যনাথের জন্য রাজা একটি স্বর্ণদ্বারা প্রস্তুত বৃহৎ খোল নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দেবতা সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের বৈদ্যনাথ বলিয়া বোধ হয়। শিবলিঙ্গ এবং দেবমূর্তি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার জন্য এইরূপ ধাতুনির্মিত খোল বা খোলিকাদানের আরও দৃষ্টান্ত আছে।[১০] সম্ভবতঃ বৈদ্যনাথের মন্দিরশিখরে একটি স্বর্ণকলশও দান করা হইয়াছিল।

৪৯। অত্যন্ত খণ্ডিত।

৫০। অখণ্ডিত। রাজা বর্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত অট্টহাসের মন্দিরশিখরে স্বর্ণকলশ স্থাপন করেন। উহাতে আলোক প্রতিফলিত হইলে বোধ হইত যেন আকাশে দ্বিতীয় একটি সূর্য উঠিয়াছে।

৫১। অত্যন্ত খণ্ডিত।

৫২। অত্যন্ত খণ্ডিত। সাগরসঙ্গম অর্থাৎ গঙ্গাসাগরসঙ্গমের উল্লেখ দেখা যায়। এই তীর্থে কোন ধর্মকার্য করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

৫৩। অখণ্ডিত। রৌপ্যদ্বারা সদাশিবমূর্তি এবং স্বর্ণদ্বারা চণ্ডিকা ও বিঘ্ননায়ক (গণেশ) মূর্তি এবং শেষোক্ত দেবতাদ্বয়ের জন্য একটি সোনার পীঠ বা আসন নির্মিত হয়। সম্ভবতঃ এইগুলি গঙ্গাসাগরের মন্দিরেই উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

৫৪। অত্যন্ত খণ্ডিত। এই শ্লোকে চণ্ডাংশু অর্থাৎ সূর্যদেবের (অর্থাৎ তাঁহার মূর্তির) উল্লেখ আছে।

৫৫। খণ্ডিত। এখানে চন্দ্র ও রৌপ্যদ্বারা সূর্য এবং স্বর্ণদ্বারা নবগ্রহের জন্য একটি পদ্মফুল নির্মাণের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

৫৬। খণ্ডিত। এই শ্লোকে শিবের স্বর্ণনির্মিত ছায়া অর্থাৎ মনুষ্যাকার মূর্তির উল্লেখ আছে; অর্থাৎ ইহা শিবলিঙ্গ নহে।

৫৭। খণ্ডিত। এখানে ব্রাহ্মণদিগকে দান দিবার উল্লেখ পাই। শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া রাজা যে দুর্গ অধিকার করেন, উহাই ব্রাহ্মণগণকে দান করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

৫৮। অত্যন্ত খণ্ডিত।

৫৯। খণ্ডিত। এস্থলে নিজের নগরে সরোবর এবং তাপসদিগের বাসের জন্য মঠ নির্মাণের কথা আছে। নিজের নগর বলিতে রাজার রাজধানী বুঝাইতে পারে। বৃহৎ মন্দির মধ্যে পূজিত শিবের নামাঙ্কিত কোন স্থান বুঝানোও অসম্ভব নহে।

৬০। খণ্ডিত। এই শ্লোকে স্বয়ং রাজা এবং রাজমহিষীর দ্বারা নির্মিত ইষ্টাপূর্ত অর্থাৎ মন্দিরাদির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ রাজকুমারের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছিল।

৬১। খণ্ডিত। শ্লোকটির প্রথমার্ধে রাজাকে পৃথিবীর চক্রবর্তী সম্রাট্ বলা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় । উহার দ্বিতীয়ার্ধে দেব অর্থাৎ রাজা কর্তৃক মঠনির্মাণপূর্বক তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠসংজ্ঞক অষ্টবাহু বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ দেখা যায়।[১১] এই মঠটিকে রৈবত বা রৈবতক পর্বতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৬২। সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত।

৬৩। খণ্ডিত। এই শ্লোকের প্রথমার্ধে রাজার দ্বারা একটি অরঘট্ট নির্মাণের কথা আছে। এখানে 'অরঘট্ট' শব্দের অর্থ গভীর কূপ বলিয়া বোধ হয়। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায়, তিনি পিঙ্গলার্যা নাম্নী দেবীর মন্দিরে শিলাদ্বারা একটি উচ্চ বলভী নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত অরঘট্টও ঐ মন্দির-প্রাঙ্গণে খানিত হইয়াছিল।

৬৪। অতি মাত্রায় খণ্ডিত।

৬৫। খণ্ডিত। এই শ্লোকটিতে সম্ভবতঃ প্রশস্তি-রচয়িতা কবির এবং তদীয় বংশের ও পিতামাতার উল্লেখ ছিল। বোধ হয় তাঁহার পিতার নাম ছিল মসাণদেব (সংস্কৃত 'শ্মশানদেব') এবং মাতার নাম পদ্মা।

শিলা-প্রশস্তির শেষে যে ব্যক্তি ইহা প্রস্তরখণ্ডের উপর লিখিয়াছিলেন বা খোদাই করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

৪। উপসংহার

সিয়ান শিলাপ্রশস্তির পাঠ এবং ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যাইবে যে, উহার ৬৫টি শ্লোকের মধ্যে মাত্র ৫।৬টির বেশি অখণ্ডিত নাই। সুতরাং কোথাও কোথাও শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ অনুমানের আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছি।

প্রশস্তির সূচনায় পালবংশের ধর্মপাল, তৎপুত্র দেবপাল, বিগ্রহপাল (দ্বিতীয় বিগ্রহপাল), এবং নয়পালের নাম উদ্ধার করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ধর্মপালের পিতা গোপাল

এবং নয়পালের পিতা এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালেরও নামোল্লেখ ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। নয়পালের পরবর্তী কোন পাল-রাজার নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। প্রশস্তিটিতে যাঁহার ধর্মকীর্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাকে অনেক সময় নরপতিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রাজা যে নয়পাল ব্যতীত অপর কেহ, তাহার কোন প্রমাণ প্রশস্তিতে পাওয়া যায় না।

প্রশস্তিতে যে বহুসংখ্যক মন্দির-নির্মাণ ও প্রতিমা-স্থাপনের উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মাত্র কতকগুলির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। নবম শ্লোকে পাই নয়পালের উল্লেখ এবং পরবর্তী শ্লোকসমূহে তাঁহার কীর্তিকলাপের বর্ণনা। যে সকল কীর্তি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ধারণা করা গিয়াছে, সেগুলি এই।—(১) পুরারি বা শিবের মন্দির এবং শৈবসাধুদিগের বাসের জন্য দ্বিতল মঠ; (২) শিলামন্দির সমূহে একাদশ রুদ্রমূর্তি প্রতিষ্ঠা; (৩) জগন্মাতার জন্য স্বর্ণকলশশোভিত শিলা বলভী নির্মাণ; (৪) পাষাণনির্মিত মন্দিরসমূহে নয়টি চণ্ডিকামূর্তি স্থাপন; (৫) দেবীকোটে হেতুকেশ শিবের মন্দির নির্মাণ; (৬) ক্ষেমেশ্বর শিবের স্বর্ণকলশ শোভিত শিলামন্দির এবং সরোবর; (৭) বরাক্ষেশ্বর নামক শিবের শিলামন্দির এবং মঠ ও সরোবর; (৮) উচ্চদেব সংজ্ঞক বিষ্ণুমূর্তি; (৯) ঐ মন্দির সংলগ্ন আরোগ্যশালা ও বৈদ্যাবাস; (১০) ষষ্টীশ নামক শিব এবং তাঁহার চতুর্দিকে চৌষট্টি মাতৃকা-মূর্তি স্থাপন; (১১) চম্পা নগরীতে বটেশ্বরের শিলামন্দির প্রতিষ্ঠা; (১২) মহেন্দ্রপাল-প্রতিষ্ঠিত চর্চা বা জগদম্বার শৈলমন্দিরে শিলাদ্বারা বলভী ও সোপান নির্মাণ; (১৩ সোম-তীর্থের কোন মন্দিরে কলশ (স্বর্ণকলশ) দান; (১৪) ধর্মারণ্যে মতঙ্গবাপী সংস্কার এবং মতঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির নির্মাণ; (১৫) তত্রত্য শিবমন্দিরে শিবের কন্যা শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা; (১৬) গঙ্গাসাগরে স্বর্ণত্রিশূল স্থাপন; (১৭) সূর্যমন্দির; (১৮) বৈদ্যনাথ শিবের স্বর্ণখোল নির্মাণ এবং বৈদ্যনাথ মন্দির-শিখরে স্বর্ণকলশ স্থাপন; (১৯) অট্টহাসে জগন্মাতার মন্দিরে স্বর্ণকলশ স্থাপন; (২০) গঙ্গাসাগরে রৌপ্যের সদাশিবমূর্তি এবং স্বর্ণের চণ্ডিকা ও গণেশমূর্তি ও এই দুই দেবতার জন্য স্বর্ণপীঠ নির্মাণ; (২১) চন্দ্রমূর্তি, রৌপ্যের সূর্যমূর্তি এবং নবগ্রহের জন্য স্বর্ণ-পদ্ম; (২২) শিবের স্বর্ণমূর্তি; (২৩) ব্রাহ্মণদিগকে দান; (২৪) শৈবসাধুগণের জন্য মঠ; (২৫) রাজা, মহিষী প্রভৃতি কর্তৃক মন্দিরাদি নির্মাণ; (২৬) একটি মঠ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ নামক বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা; এবং (২৭) পিঙ্গলার্যানাম্নী জগন্মাতার মন্দিরে বলভী এবং সরোবর নির্মাণ।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, সিয়ান-প্রশস্তিতে যে নরপতির ধর্মকীর্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার ভক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল শিবের প্রতি এবং তাঁহার কাছে শিবের পরেই ছিল জগন্মাতার স্থান। কিন্তু তিনি বিষ্ণু, সূর্য, গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতার প্রতিও একেবারে ভক্তিহীন ছিলেন না।

পালবংশীয় রাজা নয়পালকে পূর্বে বৌদ্ধ মনে করা হইত। বাণগড় শিলাপ্রশস্তির আবিষ্কারের ফলে দেখা গিয়াছে যে, তিনি শৈবাচার্য সর্বশিবের নিকট শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি শিব এবং শক্তির উপাসক ছিলেন বলা যায় ; কিন্তু পৌরাণিক বা স্মার্ত মতাবলম্বী হিন্দুর ন্যায় অন্যান্য দেবদেবীকেও তিনি অবজ্ঞা করিতেন না।[১২] লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সিয়ান-প্রশস্তিতে রাজার কীর্তিকলাপের মধ্যে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ এবং বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

পাদটীকা

১. Cf. Proceedings of the Third History Congress, Bangladesh Itihas Parisad, Dacca, 1973, pp. 36-43.
২. বৈদ্যদেবের কমৌলিশাসনের দ্বিতীয় শ্লোক দ্রষ্টব্য (মৈত্রেয়-কৃত 'গৌড়লেখমালা,' পৃষ্ঠা ১২৮)।
৩. রামচরিতে (১৪) ধর্মপালের শিলানির্মিত নৌকার উল্লেখ আছে।
৪. কারুষ বা বৃহদ্‌গৃহ দেশ চেদিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।
৫. R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, p. 138.
৬. রামচরিত, ১৷৯।
৭. Bhandarkar's List of Inscriptions, No. 1579.
৮. Cf. Journal of Ancient Indian History, Vol. VI, p. 45 an note ; Vol. VIII. p 344.
৯ Tripathi, History of Kanauj, p. 290.
১০. Ep. Ind., Vol. XXX, pp. 78ff.
১১. Journal of Ancient Indian History, Vol VI, p. 46 and note.
১২. Cf. J. N. Banerjea, Pauranic and Tantric Religion, p. 155.

উনবিংশ শতাব্দীর জীবন ও শিল্প

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর কলা এবং শিল্পের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করিতে হইলে, তাহার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পটভূমির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। শিল্প-যুগ বিশেষ অথবা যে কোন সময়ের দর্পণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শিল্পে তাহাদের জীবন-যাপনের ইতিহাস, সামাজিক ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক ইতিহাস গৌড়ীয় সুধীসমাজে সুপরিচিত। এই শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস রৌদ্র ও ছায়ার, হাসি ও কান্নার ইতিকথা। মন্বন্তর-প্রপীড়িত কৌম বাংলাদেশের উৎসাদিত প্রায় জনজীবনের নূতন করিয়া বাঁচিবার কাহিনী; ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, রূপসী বাংলার স্নেহচ্ছায়ায়, নব নব বৃক্ষের জন্ম। যেমন করিয়া যুগে যুগে রাজনৈতিকদ্বন্দ্বে পরাজিত বাঙ্গালী, স্বকীয় মেধা ও মনীষার দ্বারা জাতীয় জীবন সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যেরূপে মাৎস্যন্যায় হইতে পালযুগ, যেরূপে ১৩শ শতাব্দী হইতে হত্যা, দাহ, ধর্মান্তকরণ সত্ত্বেও বিজিত বাঙ্গালী বিজেতৃকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল—ঠিক সেইভাবে পলাশীর শোণিতময় প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইলেও, পলাশীর আম্রকাননে, উধুয়ানালার পরিখায়, বক্সারের রণক্ষেত্রের অর্ধশতাব্দীর পরেও পরাধীন, হৃতসর্বস্ব গৌড়ীয় হিন্দু ও মুসলমান দাবদাহে দগ্ধ গ্রাম; আম্র, পনস এবং বেতস বনে আবার নূতন স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অতি গোপনে হৃদয়ের অন্তরতম কোণে সে স্বপ্ন লুক্কায়িত থাকিত।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার মরিচীকা তাহাদের পূর্বসূরীদের প্লাবিত করিলেও গ্রামে, জনপদে জনপদে, গৌড়ীয় বীর্য্য সুপ্তোত্থিত হইতেছিল। ১৮৫৭ সালে যে সব ফাঁসীর মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল—সেই অঙ্কুরের সম্পূর্ণ ফল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং তাহাদের উত্তরাধিকারীরা "ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল জয়যাত্রার গান।" ইহা পরে বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দী প্রস্তুতির যুগ। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছিল তাহার আহুতি হয় ১৯৩৬ সনে। সেই সময় হইতে সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, ভাস্কর্য্যে এবং চিত্রকলার চর্চার যে বীজ বপন করা হইয়াছিল তাহা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে গৌড়ীয় সংস্কৃতিকে ঐশ্বর্য্যশালী করে। বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রমেশচন্দ্র দত্ত, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী, নবীনচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ হইতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বাংলা সাহিত্যকে গৌরবের চরম সীমায় উন্নীত করেন।

ইহারা সকলেই উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্মজীবন বিংশ শতাব্দীতে।

প্রাচ্যবিদ্যা এবং ইতিহাসে হরপ্রসাদ, সতীশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস, সতীশচন্দ্র মিত্র, যোগীন্দ্রনাথ রায়, রমেশচন্দ্র বাংলার ইতিহাসকে অতি উচ্চস্থান দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানে—রামেন্দ্রসুন্দর, আশুতোষ, জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দ্বারা বঙ্গের গৌরব বাড়াইয়াছিলেন।

একটা বিষয় ধরিলে দেখা যায় যে, ইতিহাস চর্চার উনবিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ অভাব ছিল। যেসব তরুণ তখন বঙ্গভাষার ও দেশমাতৃকার এই অভাবমোচনে নিজেদের উৎসর্গিকৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল রমেশচন্দ্রই জীবিত আছেন। সেই রকম কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় রচিত "গীতাঞ্জলি"র জন্য "নোবেল পুরস্কার" প্রাপ্ত হন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উপন্যাসে শরৎচন্দ্র, ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাখালদাস তাঁহাদের পূর্ব-সূরীদের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। নাটকে গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ, রসরাজ অমৃতলাল এবং ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানের মূল্যায়ন প্রয়োজন।

কেবল ভাষায় এবং সংস্কৃতিতে নহে, ধর্ম বিষয়েও বাঙ্গালীর কেবল বাংলা নহে, ভারতে শাশ্বত ধার্মিক সংগঠনে নব নব দান দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং মূর্খ ব্রাহ্মণদের জন্য হিন্দুধর্ম অবনতির পিচ্ছিল পথে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি নব নব ধর্মের উন্মেষ। দয়ানন্দের প্রতিষ্ঠিত ধর্মে কোন অনৈক্য হয় নাই কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে মতভেদের জন্য দুইটি নূতন শাখা উনবিংশ শতাব্দীতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহাদের জন্যই খ্রীষ্টান ধর্ম এক উপজাতি ব্যতীত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় হিন্দুধর্ম লুপ্ত করিতে পারে নাই। সামাজিক জীবনে বিহার উড়িষ্যা, বাংলা ও আসাম পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্লাবিত হইয়াছিল। সেইজন্যই বিলাত-ফেরৎ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছিলেন—

"আমরা বিলাত ফেরতা ক ভাই
সাহেব সেজেছি সবাই
তাই কি করি নাচার স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই॥
আমরা ইংরাজি ধরণে হাসি
ফরাসী ধরণে কাসি
আর পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে
বড়ই ভালবাসি॥

উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ছিল। এমন কি স্বদেশী শিল্প পর্য্যন্ত তাঁহারা পছন্দ করিতেন না। অন্যদিকে দীন, দরিদ্র ও গ্রামবাসিগণ

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। এইজন্যই কলিকাতায় দুই একটি মন্দির ব্যতীত চালা মন্দির অত্যন্ত স্বল্প, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সমস্ত বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ইংরাজ বণিকের প্রসাদে নব্য বণিকসমাজ অপূর্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যাহাদের টেরাকোটা-ভাস্কর্য অতুলনীয়।

রাজনৈতিক দিক হইতে একটা প্রস্তুতি ধীরে ধীরে কালের অমোঘ নির্দেশে একটি পথ অবলম্বন করিয়াছিল—যাহার প্রথম অগ্নুৎপাত হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। ১৮৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের একশত বৎসর পরে মিউটিনি নির্বাপিত হইলে ইংরাজ রাজপুরুষেরা একটি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। যেদিন বহরমপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডে গৌর পাণ্ডেকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার শব্দ কেবল শ্যামল বাংলার গ্রামে গ্রামে, শস্যক্ষেত্রে, নদীবক্ষে, নগরে নগরে ধ্বনিত হইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহা সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে আঘাত করিয়াছিল। তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে না পারিলেও তাহার আয়ু ক্ষয়িষ্ণু করিয়াছিল। সেই দুর্দিনে কোন ভারতীয় অথবা ইংরাজ এই মহাসত্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বদেশের দুর্দশা এবং নিজেদের দাসবৃত্তির পরিপূর্ণ পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হৃদয়ে সুদিনের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গে অত্যাচারিত কৃষককুলের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, কাল-বৈশাখীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। জাতির উত্থান এবং সংস্কৃতি-জীবনের সহিত তাহাদের সম্পর্ক অতি নিকট নহে, কিন্তু তথাপি ইংরাজ বণিকের কলিকাতায় এবং গ্রামাঞ্চলে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য-এর "আবার হইতে পারি" এই আদেশটি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

অখিল বিশ্বমানব সমাজে যে ভারতবাসী হীন নহে, তাহাদেরও মস্তিষ্ক আছে, ধ্যান, ধারণা, কার্যক্ষমতা আছে, এই আদর্শ তাহাদের উপলব্ধি হয়। তবে সর্বাপেক্ষা দান হইতেছে দুই ব্যক্তির—বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের। যেদিন বোস্টনে বিশ্বমানব মহামণ্ডলের নিকট হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ডেলিগেটদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন একজন তরুণ বাঙ্গালী পরিব্রাজক (বিবেকানন্দ), সেইদিন হইতে বিংশ শতাব্দীর নবদিগন্তের সূত্রপাত। অরবিন্দের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবারে জন্ম। বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র I. C. S. পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম গ্রহণ করেন নাই, দেশমাতৃকার দুঃখ ক্লেশ অপনোদনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইংরাজ শাসন-কর্তাগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যেমন মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন রাসবিহারী বসু, রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ চলিয়া যান আফ্‌গানীস্থানে। বাংলার দুর্ভাগ্য যে প্রথমোক্ত দুইজন আর বাংলাদেশে ফিরিয়া আসেন নাই।

এঁরা সকলেই উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের কর্মসময় বিংশ-শতাব্দী।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে রাজস্ব-বিভাগে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছিল, এক নূতন শ্রেণীর লোক ধনিক সমাজে প্রবিষ্ট লাভ করিয়া। তবে ইঁহারা সামন্ত ছিলেন না, ছিলেন "জমিদার"। সামন্ত-তন্ত্রবাদ বাংলাদেশে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর শুরু হয়। পাল এবং সেনযুগে এই আদর্শটি সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। যথা, সমস্ত আটবিক দেশের সামন্তচক্রের চূড়ামণি ছিলেন—লক্ষ্মীশূর। মুসলমান নৃপতিগণ উপযুক্ত লোকাভাবে এই নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়ের সুবিধা হইবে বলিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ সমস্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যা বড় বড় জায়গিরদারদের হাতে দিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণের পর দ্বিবার্ষিক অথবা অন্যান্য সেটেল্‌মেণ্ট এবং ফার্মিং প্রথা চালু করিয়া এইসব বুনিয়াদী ঘরের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। কেবল ভূস্বামী শ্রেণীর লোকের যদি তাহাতে ক্ষতি হইত তাহা হইলে বাংলার রাজস্ব বিভাগে মাৎস্যন্যায় হইত না; কিন্তু এইসব জায়গিরদার, তালুকদার, মনসবদার তাঁহাদের জমিদারীতে বসবাস করিতেন। তাঁহারা প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। স্থানীয় শিল্পগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কিন্তু অধিকরণের (collectorate) নিলামে উচ্চস্বত্ব ক্রয় করিয়া জমিদারগণ নগরে নাগরিক-জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের অনুপস্থিত জমিদার বলা হইত। আদায় ব্যাহত হইলে, তাঁহারা পত্তনিদার এবং দরপত্তনিদারী সৃষ্টি করিয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া লইলেন। এইসব জমিদার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী হইতে আসিয়াছিলেন।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইংরাজ কোম্পানীগুলি শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাকে দুর্ভিক্ষ এবং অনটনের পথে চালিত করিয়াছিলেন। ঢাকাই মস্‌লিন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ছাপা সিল্কের কাজ ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতে দেওয়া হইত না। ধীরে ধীরে অভাবের করালছায়া বাংলার শিল্প-সমাজকে গ্রাস করিল। সপ্তগ্রাম ধ্বংস হইয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীঃ ব্যাঙ্কবিভাগে জগৎশেঠের প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ব্যবসা বাঙ্গালীর হাত হইতে বাহির হইয়া গেল। কলিকাতায় ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক খোলা হইল। ইহার জন্য কেবল ইংরাজদের দায়ী করা যায় না। সে যুগের বাঙ্গালীর মধ্যে কল্পনার অভাব প্রতীয়মান হয় এবং তাঁহারা কাল ধর্মের সুযোগ সুবিধা না বুঝিয়া চিরাচরিত প্রথায় তাঁহাদের কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে ধীরে ধীরে তাঁহাদের ব্যবসা গুটাইতে হইল।

দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহের ধারা শিল্পকে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের প্রতিদিনের অশন, বসন, বিলাস, ব্যসন, চলন, বলন, মেলা, পূজাবিধি, ধার্মিক, সামাজিক এবং কুলাচার, মনন, অভ্যাস, সংস্কার, হিন্দু এবং ক্ষীয়মাণ-ধর্মীক মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির পরিচায়ক।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ন্যায় উনবিংশ শতাব্দীর আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যায় উপাদানের অভাব নাই। মনন এবং কল্পনা ব্যাহত হয় নাই, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান মন্দিরগুলির পোড়ামাটির অথবা টেরাকোটার ভাস্কর্য্য। তাহার পর সাময়িক সংবাদপত্র অথবা মাসিক, ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা সমূহ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সামাজিক উপন্যাস, যথা কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী, বিষবৃক্ষ, হাস্যরসাত্মক নাটক প্রভৃতি। নীলদর্পণ, সংসার ইত্যাদিও বাদ যায় না। বৈষ্ণব পদাবলী, কড়চাও আমাদের সাহায্য করে। প্রধান খাদ্য ভাত এবং তাহা নানা প্রকারের—যাহাদের নাম এ যুগের বাঙ্গালীরা ভুলিয়া গিয়াছেন, যেমন কামিনী আতপ চাল। ভাতের পরে ডাল, শাক, সব্জী, বংশের অঙ্কুর, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে ব্যঞ্জন তরকারী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালী সমাজে প্রচলিত ছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রবাসী পত্রিকায় খুলনাকে "ভোজ" দিবার সম্পর্কে যেসব তরিতরকারীর উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাদের তৃতীয়-চতুর্থাংশের নাম আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা শুনেন নাই। তবে যুক্ত প্রদেশে "বাথুয়া" শাক এখনও ভোজন করা হয়। এতদ্ব্যতীত মাছ-মাংস ত ছিলই। তবে গোঁড়া হিন্দুরা তখন "রামপাখী" খাইতেন না। দধি, পায়স, ঘন দুধ এবং ক্ষীর ইত্যাদিও তালিকায় ছিল।

শিকার বিংশ শতাব্দীর ধনাঢ্য সমাজের অতিপ্রিয় ছিল এবং শিকারলব্ধ হরিণ প্রভৃতির মাংস আহার্য্য ছিল। এই সময়ে পর্তুগীজদের চেষ্টায় আহরিত আলুর প্রচলন হইয়াছিল—কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মণ লাল আলু মাত্র গ্রহণ করিতেন। নারিকেলের জল, আনারস, ইক্ষুরস, গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত ছিল। ফল বাংলাদেশে প্রচুর ছিল—তখনও কীর (কাংড়া) এবং কাবুলের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। সুরা অতি প্রাচীনকাল হইতে উৎপন্ন হইত। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "করুণা"য় গৌড়ী বলিয়া মদের উল্লেখ আছে। মুঘল আমলের "সিরাজী"র পরিবর্তে উনবিংশ শতাব্দীতে বৈদেশিক সুরা, শেরী, ব্রাণ্ডী, হুইস্কী প্রভৃতি আমদানি হইত। বাঙ্গালী-শৌণ্ডিক অন্নাভাবে নিম্নশ্রেণীর কৌম বাঙ্গালীর জন্য ধেনো এবং তাড়ি প্রস্তুত করিত। খর্জ্জুর রস হইতেও সুরা এখনও হয়। বিহারে বসবাসকালে দেখিতাম যে পাশবানদের কল্যাণে তাল এবং খর্জ্জুর উদ্যান অত্যন্ত লাভজনক।

তখনকার বাঙ্গালী হীনবীর্য্য এবং মেদবহুল অথবা অস্থিচর্মসার হয় নাই। তাঁহারা শারীরিক ক্রীড়া করিতেন। টেরাকোটা ভাস্কর্য্য, ভারতচন্দ্র আমাদের নৃত্য, গীত এবং বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের সহিত পরিচিত করে। যাত্রা এবং মেলা অথবা উর্স সামাজিক এবং ধার্মিক জীবনের অঙ্গ ছিল। যানবাহনের মধ্যে গোযান, রথ, অশ্বযান এবং নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌযান ভাস্কর্য্যে এবং সাহিত্যে দেখিতে পাই। উত্তরবঙ্গের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন বন্দর এই তথ্য প্রমাণ করে। প্রাচীনতর মঙ্গলকাব্যে সমুদ্র গমনোপযোগী নৌকা নির্মাণের

বিবরণ ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অর্ধ শতাব্দীরও আগে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মেদিনীপুরের অর্থনৈতিক অবনতির অন্যতম কারণ—লোহার জাহাজ চিত্রে, ভাস্কর্য্যে এবং সাহিত্যে অমর। পাকাবাড়ী (অর্থাৎ ইষ্টক নির্মিত) প্রাসাদ, গম্ভ এবং বাটীর সন্ধান পাই। তবে পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে উচ্চ-মধ্যবিত্তের চারচালা চাঁচাড়ীর অথবা মৃন্ময় প্রাকার সমন্বিত গৃহনির্মাণ করিতেন। বালুরঘাট আদালতে ১৯৬৭ সনে সাক্ষ্য দিতে গিয়া আমি চাঁচাড়ীর শিল্প কি অপূর্ব ছিল তাহার প্রমাণ পাই। আসামেও এই শিল্প প্রচলিত ছিল।

বসন-ভূষণে, পরিবর্তন আসিয়াছিল। চোলি (কাঁচুলী), লেহঙ্গা (ঘাগরা) ওড়নি (উচ্চকোটীস্তরে উত্তর বাঘকের) পরিবর্তে শাড়ীর প্রচলন হইয়াছিল। যেমন ম্যানচেস্টার হইতে আগত মিলের শাড়ীর নাম ছিল "পরীর দেশের কাপড়"; এইরূপে সাজসজ্জায়, বসনে-ভূষণে উনবিংশ শতাব্দী উচ্চকোটী কৌম বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীয়ানা ত্যাগ করিয়া সাহেবীয়ানা গ্রহণের যুগসন্ধিক্ষণ।

মন্দির প্রতিষ্ঠা, ধার্মিক আচারের অঙ্গ। বর্ণাশ্রম ও শাশ্বত হিন্দুধর্ম পণ্ডিতাগ্রগণ্য কতিপয় মনীষীর জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঁচিয়াছিল। মুসলমান বিজয় বর্ণশ্রেষ্ঠদের একাধিপত্যে কুঠারাঘাত করিয়াছিল; চৈতন্যের প্রেমরস জাতিভেদে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। নব বৈষ্ণববাদের নেতৃস্থানীয়গণ তন্ত্রযানের বজ্রাচার্য্যদিগের ন্যায় নীচ জাতীয় ছিলেন। যবন হরিদাস মুসলমান। উপর কোটির বর্ণশ্রেষ্ঠ ছিলেন ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য এবং বৈদ্য। কৈবর্ত, ডোম, বাগদি, হাঁড়ি, চামার অ-জলচল কলু সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। কলু অর্থাৎ যাহারা তৈল উৎপাদন করিত। তাহারা হইত দুই শ্রেণীর—তিলি এবং তেলি। তিলি অ-জলচল নহে। ইহারা বর্ণসমাজের নিম্নতম স্তর। মধ্যযুগে, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী ভূস্বামীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল। বর্ধমান রাজবংশ ইহাদের পুরোধা। বিহারের ডুমারাঁবের পরমারগণ, গিধোড়ের চান্দেলরাজগণ প্রভৃতি। মেদিনীপুরের অনেক সামন্তবংশের ইতিহাস সন্ধানে দেখা যায় যে তাঁহারা উত্তরাপথ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ জগৎশেঠের বংশ মারবাড় হইতে বিহার এবং বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে শোষণকারী উপনিবেশিক কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রথমে আঘাত করেন এই বর্ণসঙ্কর সমাজের উপর। তাহার ফলে নদীমাতৃক দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অনেক নিম্নজাতি ধনাঢ্য রূপে পরিণত হন। তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বাংলার ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কৈবর্তরাজ দিব্য প্রধান। "পাণ্ডুয়ার কেচ্ছা" অনুসারে একজন বাগদিরাজ মুসলমান বিজয়ের সময়ে পাণ্ডুয়ার অধিপতি ছিলেন। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর লোকের সমাজে প্রতিপত্তি লাভ ইংরাজের সৃষ্টি নহে।

এইসব নিম্নশ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র তালিকা দিলে প্রবন্ধ বোধ হয় সামঞ্জস্য হারাইবে না। ১। তন্তুবায়, ২। শঙ্খ, গন্ধ এবং স্বর্ণবণিকগণ, ৩। নাপিত, ৪। কামার, ৫। কুমার,

৬। তিলি, ৭। বারুই, ৮। মোদক, ৯। তাম্বুলি, ১০। রজক, ১১। ধীবর, মৎস্যজীবী অথবা ব্যাগ্রক্ষত্রিয়, ১২। শুঁড়ি অথবা শৌণ্ডিক। ১৩। রাজবংশী দ্বাদশ অথবা তাহারও পূর্ব হইতে আমরা ম্লেচ্ছ নামক এক সমাজের উল্লেখ পাই। ১৪। পটুয়া এবং ১৫। সূত্রধর ইত্যাদি। উপরিলিখিত বর্ণবিন্যাস প্রমাণিত করে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী হিন্দু সমাজে জাতিভেদে বিশেষ পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রাচীন বাংলার ন্যায় উনবিংশ শতাব্দীতেও উচ্চবর্ণের সহিত ধনী অথচ নিম্নশ্রেণী উপস্থিত ছিল। ইহাই এই শতাব্দীর শিল্পচর্চার বিশেষ বৈশিষ্ট্য—যাহা অনুশীলন হয় নাই। ব্যবসা ও বাণিজ্য বিস্তৃতির সহিত কলার পৃষ্ঠপোষকদের বর্ণ এবং শ্রেণীর পরিবর্তন সহজেই বোধগম্য। শ্রেণী হিসাবে ভূস্বামীদের স্থান "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" উপদেশ পালন করিয়া যাহারা ধনাঢ্য হইয়াছিলেন তাঁহারা অধিকার করিয়াছিলেন। জাতি হিসাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থদের স্থানে বণিক সম্প্রদায় স্থলাভিষিক্ত হন। বাংলার জনজীবন তখন নগরকেন্দ্রিক হয় নাই; এই সব শিল্প-বাণিজ্য গ্রামকেন্দ্রিক থাকিয়া গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবন পুষ্ট করিয়াছিল। তাহাদেরই ধ্বংসাবশেষের উপর বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতা ও বণিক-জীবন।

যখন আবার ইংরাজ বণিকের পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস পায় তখন তাহাদের মন্দির নির্মাণও সমতালে কমিয়া যায়। সুতরাং বাংলাদেশের মন্দির নির্মাণ অর্থনৈতিক অবস্থার মানদণ্ড বলিয়া ধরিয়া লইলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

ওলা বিবির গান

(দক্ষিণ ২৪ পরগণায়)

শ্রীঅমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী

চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে এবং অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায় সাত বিবি তার আপন মাহাত্ম্যে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা। 'আপন মাহাত্ম্যে' বললাম এইজন্য যে, কোনো পুরুষ শক্তির ওপর এই বিবিদের নির্ভর করতে হয়নি। এই সাত বিবিরা হলেন, 'বন বিবি, ওলা বিবি, ঝোলা বিবি, মতি বিবি, আসান বিবি, জরিনা বিবি ও ভাসান বিবি', স্থানভেদে নামান্তর আছে ; যথা,—'মতি বিবি, আজগৈ বিবি, চাঁদ বিবি, ঝেটুনে বিবি, ফুল বিবি, ভুল বিবি ও এবরা বিবি' অথবা 'রায়মন বিবি, সাবধান বিবি, গুলাল বিবি ও ছোরাত (পাঠান্তর —ছুরাত) বিবি প্রভৃতি। অনেকে মনে করেন, এই সাত বিবিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সপ্তমাতৃকার রূপান্তর। বিবিদের মধ্যে কিন্তু বনবিবি নিঃসন্দেহে প্রধানা। ইনি ব্যাঘ্রভীতি-হন্ত্রী। তা বাদে সকলেই একেকটি ব্যাধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কেউ মুস্কিল আসানের, কেউ বসন্তরোগের। আবার বৈষয়িক মামলা-মোকর্দমার রক্ষাকর্ত্রী রূপেও কেউ অতিরিক্ত গুণের অধিকারিণী। এ অঞ্চলের লোকায়ত ধর্মচেতনায় প্রায় সর্বত্র এই বিবিদের প্রবল প্রভাব। এদের মধ্যে আমাদের আলোচ্য ওলা বিবি। সম্ভবতঃ হিন্দুচেতনায় ওলাই চণ্ডী ও মুসলিম-চেতনায় ওলা বিবি একই কামনার প্রতীক।

এমন একদিন ছিল, যেদিন ওলা-উঠা (cholera) নামে ব্যাধিটি ছিল দুশ্চিকিৎস্য। এ-রোগে কেউ একবার আক্রান্ত হলে তার মৃত্যু ছিল প্রায় অবধারিত। অদৃশ্য ও অতি-প্রাকৃত আধি-ভৌতিক শক্তির কাছে কৃপা ভিক্ষা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। সে কারণে এসব লৌকিক দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি অপেক্ষা ভয়মিশ্রিত বিশ্বাসই ছিল বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। এঁদের পূজাচার এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি পর্যবেক্ষণ করলে স্বতঃই মনে হয়, আদিতে এটি হিন্দু ও মুসলিম, দুই ভিন্ন ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মিলিত বিশ্বাসের ফলশ্রুতি, এখন কিন্তু প্রায় সমস্ত ব্যাপারটাই হিন্দুদের মধ্যে চলে এসেছে। মুসলমান ফকিরের পৌরোহিত্য ভিন্ন এই সম্প্রদায়ের প্রায় কেউই এখন আর এর কোনো অংশে অংশগ্রহণ করেন না। কেবল ওলা বিবির ক্ষেত্রেই নয়, লৌকিক দেব-দেবীদের পূজাচারে নেই কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি। হিন্দু, মুসলমান এবং উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণের সকল স্তরের হিন্দু মাত্রেই এসব অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণ করার পক্ষে কোনো বাধা নেই। পূজা-পদ্ধতি সর্বত্রই প্রায় এক। নিত্য পূজা প্রায় হয় না। বিশেষ পূজা (হাজোৎ উৎসব) বেশ জাঁক-জমকের

সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে ওলা-উঠা মড়ক রূপে দেখা দিলেই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে মাহাত্ম্য-সূচক পালা গান গ্রামে গ্রামে শোনা যায়, কোথাও ছাগ বলিও হয়। তবে এর বার্ষিক উৎসব অবশ্যই অনুষ্ঠিত হয়।

ওলা বিবির গায়ের রঙ্ গাঢ় হলুদবর্ণ, ত্রিনয়না, দ্বিভুজা, করতলে বরদ মুদ্রা। উপবিষ্টা মূর্তির কোলে একটি শিশু ; কিন্তু দণ্ডায়মানা মূর্তির কোলে শিশুমূর্তি থাকে না। অনেক স্থলে দেখা যায় ইনি ব্যাঘ্রবাহনা। ওলা বিবি (এবং তার ভগ্নিদের মূর্তি) হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি শাস্ত্রীয় দেবীদের অনুরূপ আর মুসলমান প্রধান অঞ্চলে এদের আকৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ, এমন কি পায়ের জুতা পর্যন্ত মুসলমান কুমারী বালিকাদের মত। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে বার্ষিক উৎসবে একটা সময় সাধারণতঃ নির্দিষ্ট থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে, বৃহস্পতিবার, রবি ও বুধবার নির্দিষ্ট বার। শুক্লপক্ষের দশমী পর্যন্ত পূজার তিথি সীমাবদ্ধ। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বর্ধিত হতে দেখা যায়। পৌরোহিত্য করেন মোল্লা অর্থাৎ মুসলমান ফকির। কোথাও মুসলমান রমণীকেও পৌরোহিত্যে নিযুক্ত দেখা যায়।

পূজার নির্দিষ্ট দিনে সকল স্তরের হিন্দু রমণীরা সারাদিন নিরম্বু উপবাস করেন। এই রমণীদের মধ্যে সধবা, বিধবা, কুমারী সকলেই থাকেন। দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন মাঙন (ভিক্ষা) করতে। গলায় খড়ের কুটো বাঁধা থাকে। প্রাচীনারা বলেন, আগে দন্তে তৃণ ধারণ করা হতো। সন্দেহ নেই, প্রথাটা দীনতা প্রকাশের প্রতীক্। সারাদিন ঐসব নারীর দল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ধান বা চাল সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে বিশেষ নিয়ম এই যে, মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তত একটি ঘরে গিয়েও মাঙন্ করতে হবে, নতুবা ব্রত সফল হবে না। মাঙনের জন্য সাধারণতঃ নিজ নিজ বস্ত্রাঞ্চল ব্যবহৃত হয়। সারাদিনের সংগৃহীত ধান-চাল একসাথে মিলে বিক্রয় কোরে, সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিবিমার হাজোতের জন্য চিঁড়া, মুড়কী, বাতাসা, পাটালি প্রভৃতি সিণির (বা সিন্নি) উপকরণ ক্রয় করেন এবং সেগুলি নিয়ে মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণে বিবিমার 'থানে' গিয়ে সবাই উপস্থিত হন। একটা নিয়ম হচ্ছে যে, এদিন বিবিমার হাজোতের জন্য দিনমানে কেউ বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে সন্ধ্যার পূর্বে সে বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না।

ফকির সাহেব বিবিমার পূজার্চনার পর তাঁর সামনে একটি গর্ত কোরে তার মধ্যে কাঁচা গো-দুগ্ধ, ডাবের জল ঢেলে দিয়ে বিবিমার স্নান করান। ব্রতিনীরা সেই স্নানোদক ঘটিতে ভরে ঘরে নিয়ে এসে ধানের গোলায়, গোয়াল ঘরে, শোবার ঘরে ছিটিয়ে দেন আর অবশিষ্ট জলটুকু সদর দরোজায় ঢেলে দেন। ধূল-ফুল (অর্থাৎ বিবিমার সম্মুখস্থ মৃত্তিকা) সকলকে ভক্ষণ করতে হবে। সন্দেহ নেই, এত সব কাণ্ডের মধ্যে নারীর স্থানই মুখ্য, পুরুষের ভূমিকা নিতান্ত গৌণ।

পূজো-হাজোৎ চলা কালীন বিবিমার একটি 'জাহির নামা' কীর্তন করা হয়। কীর্তনীয়ারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবই হিন্দু। কীর্তনটি পাঁচালী আকারে রচিত। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে মৃদঙ্গ (খোল), হারমোনিয়াম ও মন্দিরা। মহড়া (প্রধান) গায়ক একজন। চামর হাতে দাঁড়িয়ে গান করেন ও দোহারিয়া দোহার দেন। রীতিটা কৃষ্ণ কীর্তনের পালা-গানের মতই, গান আরম্ভের আগে পাঁচ পীরের উদ্দেশে পাঁচটি মোকাম একটা পিঁড়ি বা জলচৌকির ওপর রাখা হয়। তারপর গান হয়। শেষ হতে পাঁচ-ছ ঘণ্টা সময় লাগে। গানের শেষে প্রসাদ নিয়ে ব্রতিনীরা কিন্তু তখনই ঘরে ফেরেন না। পাড়ায় পাড়ায় দেখা যায়, উচ্চ থেকে নিম্নবিত্ত পরিবারের সর্বস্তরের নারীগণ একসঙ্গে দল বেঁধে গোল হ'য়ে বসে বনভোজন করেন। উপকরণ, চিঁড়া, মুড়কা, কাঁচা দুধ, কলা, পাটালী প্রভৃতি যার যেমন সঙ্গতি, তাই দিয়ে মহানন্দে শীতার্ত রমণীগণ উন্মুক্ত আকাশ-তলে বসে নিরামিষ আহারপর্ব সমাধা করেন। আহারপর্বে বিশেষত্ব এই, যা কিছু খাবার আছে, সবকিছু এখানেই খেয়ে যেতে হবে।

এরপর আরেকটি অনুষ্ঠান আছে। সেটি এই রকম: বাড়ির সদর দরোজায় একটি জলন্ত প্রদীপ, জলপূর্ণ একটি পিতলের ঘটি, তার পাশে কুলের একটি কাঁটা ভর্তি ডালা ও কিছুটা ইঁদুর মাটি থাকে। দরোজার অন্দরে দাঁড়িয়ে থাকে যেকোনো বয়সের একটি মেয়ে বা ছেলে, এবং দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন স্বয়ং ব্রতিনী। ব্রতিনী তখন আহার যা যা করার, তা সবই শেষ কোরে এসে দাঁড়িয়েছেন। কারণ ভেতরে প্রবেশ করলে কিছু আর খেতে পারবেন না; এমন কি পান-দোক্তা পর্যন্ত। তাই অনেক সময় দেখা যায়, অনেকের ওষ্ঠাধর তাম্বুল রাগে রঞ্জিত, বাইরে দাঁড়িয়ে ব্রতিনী প্রশ্ন করেন ও ভেতরে দাঁড়িয়ে মেয়ে বা ছেলেটি তার উত্তর দেয়। প্রত্যেক প্রশ্নোত্তরটি তিনবার কোরে উচ্চার্য। এটি ছড়ার আকারে, মিষ্টি শুনতে, কে তৈরী করেছিল বা কবে রচিত হয়েছিল, তা জানার উপায় নেই। তবে এর বয়স কয়েক শতাব্দী বটে, ছড়াটি শুনলে পরিষ্কার বোঝা যাবে, একদা হয়তঃ এই বিবিদের খোঁজে যেতে হোত দূর-দূরান্তে, হয়তঃ বা কয়েক দিনের পথ অতিক্রম কোরে, ফিরে আসত পরিবার-পরিজনদের কুশল চিন্তায় ব্যাকুল হৃদয়-নিয়ে। সেদিন দূরগত, আজ পাড়ায় পাড়ায় তাই হয়ত বিবিমা প্রতিষ্ঠার ঘনঘটা। কিন্তু ছড়ার কথা এখন থাক, বলব সবশেষে। এখন পালা গানটার কথা বলি।

ওলা বিবির এই পালাগানটি রচনা করেন, এই জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড গ্রামের কলেমুদ্দীন গায়েন। (আনুঃ জন্ম ১২৩৪৮, মৃত্যু ১৩২৮) এই কবিরই গান ('গাজী সাহেবের গান') বিশ্বকোষ-প্রণেতা রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩৩৫, ১ম সংখ্যা) প্রকাশ করেন। কথিত আছে, কলেমুদ্দীনের পিতামহ হাবিজুল্লা গায়েন দৈবশক্তিতে স্বপ্নের মাধ্যমে কবি-প্রতিভার অধিকারী হন এবং পৌত্র কলেমুদ্দীনকে সেই প্রতিভার উত্তরাধিকারী করে যান। ইনি স্বভাবকবি ছিলেন।

কেবল বিবিমার গান নয়, মানিকপীর, মোবারক গাজী প্রভৃতিকে অবলম্বন কোরে পাঁচালী আকারে অনেক গান তিনি রচনা করে গেছেন। প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চলে তাঁরই রচিত গান গীত হচ্ছে।

কয়েমুদ্দীনের শিষ্য চিন্তামণি (পদবীর সন্ধান পাওয়া যায়নি)। চিন্তামণির শিষ্য সাতাকুণ্ড গ্রামেরই নিতাই ছাটুই (আনু: জন্ম ১২৬২, মৃত্যু ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ)। নিতাই গাইয়ে এতদঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক ছিলেন। আমরা দেখেছি, পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত শতাধিক স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক গলায় মালার আকারে ঝুলিয়ে চামর দুলিয়ে তাঁকে গান করতে। বর্তমানে নিতাইচরণের শতাধিক শিষ্য, প্রশিষ্য সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এই কথা ও কাহিনীটি তাঁরই এক প্রশিষ্য রামনগর গ্রামনিবাসী শ্রীকালিচরণ মণ্ডল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাওয়া, সমগ্র গানটি এইরূপ। একটি কাঠের পিঁড়িতে পাঁচটি মোকাম রচনা কোরে প্রথমে সরস্বতী বন্দনা করা হয়।

বন্দনা।।

করিয়া প্রণতি-স্তুতি, বন্দি' মাতা সরস্বতী
বিধাতার মুখে বেদবাণী। (দোয়ারা)
দেব নারায়ণী সঙ্গে তোমায় বন্দিনু রঙ্গে
শ্বেত পদ্মাসনা ঠাকুরাণী॥
পরিধান শ্বেতবস্ত্র, খুঙ্গি পুঁথি মসী-পত্র,
শ্বেত বীণা হস্তে সুধারিণী॥ (২ বার)
পৃষ্ঠদেশে কেশ ঝোলে শ্রবণ কুণ্ডল দোলে
অজ্ঞান তিমির বিনাশিনী॥ (২ বার)
বীণা-বাক্য স্বপ্ত-স্বরা নারায়ণ মনোহরা
মৃদঙ্গবাদিনী বাগ্‌দেবী। (২ বার)
ব্যাস, বাল্মীকি মুনি নারায়ণ তত্ত্বজ্ঞানী
তোমাকে সেবিয়া হইল কবি॥ (২ বার)
দেবাসুর নাগ নর মৃগ, পক্ষী, চরাচর
সর্বঘটে বৈসে সরস্বতী। (২ বার)

তোমা বিনে বাক্য ব্যয় কাহার শকতি হয়
বলিবলা তোমার প্রকৃতি ॥ (২ বার)

শাস্ত্রের সঙ্গীত ধার গলে গজমতি হার
আভরণ মণিময় কত। (২ বার)

রবি-শশী দুরহুত সে হয় তোমার দূত
আর চরাচরগণ যত ॥ (২ বার)

দেব নারায়ণী যথা আছ গো ভারতী তথা
ত্যজি' দেবী বৈকুণ্ঠ নগর। (২ বার)

অধম বালক ডাকে পদ ছায়া দেহ মোকে
বৈস মোর কণ্ঠের উপর ॥ (২ বার)

মৃদঙ্গ-মন্দির ধ্বনি মিশাইয়া বাক্ বাণী
কণ্ঠে বসে বলাও সুবচন।

রাগতত্ত্ব, তাল মান কিছু মোর নাহি জ্ঞান
তব পদে লইনু শরণ ॥

ষড়রিপু ষষ্ঠ ভাগ বন্দিলাম ছয় রাগ
প্রিয়া যার ছত্রিশ রাগিণী।

মন মোর মূঢ়মতি উর দেবী সরস্বতী
আমি মূঢ় কি বলিতে জানি ॥

তুমি যারে কর দয়া সে জানে বিষ্ণুর মায়া
বৈসে সেই পণ্ডিত সমাজে।

কে জানে তোমারি মায়া অবিরাম কর দয়া
ক্ষমানন্দ তব পদ ভজে ॥

—('মনসার ভাসান' রচয়িতা ক্ষমানন্দ-প্রণীত)

ওলা বিবির বন্দনা

ধূয়া। সুরে :— এস, এস মা দরবার বিবি। আমার আসরে এস,
আসরেতে দৃষ্টি দিয়ে থানে গিয়ে বসো।

বন্দনা :— অকুল পাথারে তারা, তরাও গো নিস্তারিণী,
এই ঘোর বিপদে এ-সন্তানে স্থান দিও গো জননী ॥
ডাকি মা মা বলে, আমায় নে মা কোলে
যেন থেকো না থেকো না ভুলে, অধম সন্তান বলে,
স্থান দিও গো জননী ॥

পাঁচাল :— এস মা দরবার বিবি আসরেতে এসো। আসরেতে দৃষ্টি দিয়ে থানে এসে বসো ॥

আমি তোমার অধম সন্তান জ্ঞান-বুদ্ধি নাই।
মা বলে ডাকলে যেন রাঙা চরণ পাই ॥

আমি তোমার অধম সন্তান কি বর্ণিতে জানি।
নিজ গুণে মা জননী বলাবেন আপনি ॥

আমার আসর ছেড়ে যদি অন্য থানে যাও।
কি দিব আর ধর্মের দোহাই এই বালকের মাথা খাও ॥

আগের কথা যদি পিছনেতে যায়।
ক্ষমা করবেন মা জননী, সেলাম আপনার পায় ॥

পালা।

মূল :— একদিন মা ওলা বিবি করিলেন বাসনা। জাহির করিতে নিয়ে সঙ্গে যাবে মা, ব্যাধি পঞ্চজনা ॥

প্রশ্ন— কি কি ব্যাধি ?

উত্তর— ওলা, ঝোলা, টান, টংকার, কাল, বাত আর বল। এই পাঁচটি ব্যাধি নিয়ে মায়ের জাহির।

মূল। ধূয়া :— ব্যাধি পেয়ে ফকিরের মেয়ে হয়েছে অস্থির। ওলা, ঝোলা, ব্যাধি নিয়ে মায়ের জাহির ॥

মূল :— ব্যাধি নিয়ে মা পথে পথে চলে যায়। সম্মুখে এক বাদশার বাড়ি দেখিবারে পায় ॥ মা বলেন, আমি কোন খানে নাহি যাব, কেমন ইচ্ছব বাদশার মন একবার পরীক্ষা করিব ॥

ঐ কথা বলে মা বাদশার দ্বারে গেল। দ্বারীকে ডাকিয়া তখন কহিতে লাগিল ॥ শুন শুন ও বাপ দ্বারী, আমার কথা নাও। আমার সংবাদ নিয়ে বাদশার কাছে যাও ॥ দেখা হ'লে তাকে আমি করব আশীর্বাদ। যাও যাও ওহে দ্বারী দেহ গো সংবাদ ॥

ঐ কথা শুনে দ্বারী হলেন বিদায়। বাদশার কাছে গিয়ে দ্বারী উপনীত হয় ॥ দ্বারী গিয়ে বাদশার কাছে যখন সব কথা বলল। বাদশা তখন পাঁচ টাকা দিয়ে দ্বারীকে বিদায় কোরে দিতে বলল ॥ দ্বারী সেই পাঁচ টাকা নিয়ে ভিখারিণীর কাছে গেল। আর বাদশার কথা ভিখারিণীকে তখন জানালো ॥ ভিখারিণী সেই পাঁচ টাকা ভিক্ষা না নিয়ে বাদশাকে কাছে আসতে বলল। দ্বারী ফিরে গিয়ে সেই কথা বাদশাকে জানাল ॥

বাদশা তখন আরও পাঁচটি মোহর দিয়ে দ্বারীকে পাঠালো। ভিখারিণী মোহর পাঁচটিও ফেরৎ দিলেন। আশ্চর্য হয়ে বাদশা এলেন ভিখারিণীর কাছে। বাদশাকে দেখে ভিখারিণী বললেন, 'তোমার পুত্র কন্যাদের এখানে নিয়ে এস, আমি তাদের দীর্ঘজীবী হবার আশীর্বাদ কোরে যাব।' বাদশা তখন ভিখারিণীকে বললেন, 'আমি নিঃসন্তান।' এই কথা শুনে ভিখারিণী তখন বাদশাকে বললেন, 'আঁটকুড়ো লোকের মুখ দেখলে পাপ হয়। শীঘ্র আমাকে বিদায় করো। এই পাপরাজ্যে আমি থাকতে চাই না।' বাদশা শুনে বললেন, 'আমার মুখ দেখলে যদি লোকের পাপ হয়, তবে আপনি আমার সামনে দাঁড়ান, আপনার চরণ-তলে জীবন বিসর্জন দি।'

গান। (তাল-দাদ্‌রা)—"কাজ নাই আমার পাপ জীবনে।
আমি প্রাণ দিব মা ঐ চরণে ॥
প্রাণে কাজ কি আমার,—প্রাণ রাখব না আর।
বিনা সাধের পুত্র ধনে ॥"

কথা :—ভিখারিণী তখন বলছে, 'বাদশা তুমি কেঁদো না, আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার পুত্র সন্তান হবে। বাদশা সেই শুনে বললেন, 'তাহলে তোমাকে হাজার টাকা ভিক্ষা দেব।' ভিখারিণী আবার বলেন, 'এক বৎসরের মধ্যে তোমার দুটি পুত্র সন্তান হবে।' বাদশা খুশী হয়ে তিন সত্য কোরে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'এক বৎসরের মধ্যে যদি দুই সন্তান হয়, তাহলে হাজার টাকা আর একটি ছেলে ভিক্ষা দেব।' তাই শুনে ভিখারিণী বাদশাকে একটি ফুল দিয়ে বললেন, 'রাণীকে এটি ভক্তিভরে খেতে বলো, তাহলেই তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে।' এই বলে ভিখারিণী বিদায় নিলেন।

রাণী সেই ফুল ভক্তিভরে খেলেন আর যথা সময়ে স্বরূপচাঁদ ও অরূপচাঁদ নামে দুটি

পুত্র হলো। পুত্র দুটি পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করলে বাদশা তাদের পাঠশালায় ভর্তি কোরে দিলেন। বাদশার সুখে দিন যায়। পুত্র দুটিও চাঁদের মত বাড়তে থাকে। এসব ব্যাপার সেই ভিখারিণী মা জানতে পারছেন; কেননা তিনি যে অন্তর্যামী। একদিন তিনি বাদশার প্রাসাদে এলেন। দ্বারে দ্বারীকে ডেকে বললেন, —

(গান :—) বল্‌গে যা তোর রাজার কাছে।
মা দুঃখিনী কাঙালিনী, দ্বারেতে দাঁড়িয়ে আছে ॥
ভিক্ষা আমায় দেব বলে,
হাজার টাকা ও একটি ছেলে,
পুষ্প নিলো হস্তে কোরে
আল্লা তালাহ্‌ সাক্ষী আছে ॥"

(কথা :—) দ্বারী গিয়ে সব কথা বাদশাকে জানালে। বাদশা তখন উজিরের কুমন্ত্রণায় ভিখারিণীর কাছে এসে বললেন, 'টাকা গেছে পচে, ছেলে গেছে মরে।' অন্তর্যামী ভিখারিণীবেশী মা কিন্তু সব জানতে পারলেন। তিনি দেখলেন, বাদশা উজিরের মন্ত্রণায় ঘরের মধ্যে মাটি খুঁড়ে পুত্র স্বরূপচাঁদ আর তার মা বাদশাজাদীকে তার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। সব বন্ধ কোরে কেবল বাতাস বইবার একটু ফাঁক রেখে, ওপরে কাঠের তক্তা চাপিয়ে বাদশা আমার কাছে এসে মিথ্যে বলছে। ভিখারিণী তখন করলেন কি, তাঁর সঙ্গী সব ব্যাধিদের ডেকে আদেশ দিলেন, 'যা, তোরা এখনই স্বরূপচাঁদের জান্‌ নিয়ে আয়।' ব্যাধিরা তখন ঘরের মধ্যে খোঁড়া কবরের কাছে এগিয়ে গেল বাঘের মূর্তি ধরে। বাদশাজাদী কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না; কিন্তু স্বরূপচাঁদ সব দেখতে পেল। সে তখন ভয়ে মা মা ব'লে কেঁদে উঠল। মা বাদশাজাদী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হয়েছে বাবা স্বরূপচাঁদ? অমন কোরে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠলে কেন?' স্বরূপ তখন মাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে বলে, 'ওমা, মা, ঐ দেখ বাঘ এসেছে খেতে।' বাদশাজাদী কিছু দেখতে না পেলেও বুঝলেন, এ সেই ভিখারিণীর খেলা। ব্যাঘ্ররূপী ব্যাধিরা যখন দেখল, মা তার ছেলেকে বুকে রেখে সজোরে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, তখন তারা নিরুপায় হ'য়ে ফিরে গেল সেই ভিখারিণীর কাছে। গিয়ে বললে তারা, 'মায়ের কোল থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে আনতে পারলুম না।' মা ভিখারিণী তখন নিদ্রাদেবীকে আকর্ষণ কোরে ডেকে এনে আজ্ঞা দিলেন, বাদশাজাদীকে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন কোরে রাখতে। আজ্ঞা পাওয়া মাত্র নিদ্রাদেবী গিয়ে বাদশাজাদীকে গভীর ভাবে ঘুম পাড়িয়ে ফেললেন। মায়ের আজ্ঞায় আবার সেই অনুচর ব্যাধিরা বাঘের রূপ ধরে স্বরূপচাঁদকে আনতে গেল। স্বরূপচাঁদ একসঙ্গে এতগুলো বাঘ দেখে ভয়ে চীৎকার কোরে উঠল। মাকে ডাকতে লাগল,—

(গান :—) 'আমি ডাকি মা মা বলে, একবার নে মা কোলে

উঠে গো জননী।

এ জনমের মতো, হয় যে গো গত

(তোর) দুখের যাদুমণি ॥

সাধের ঘুম কি ভাঙ্‌লো না তোর,

কাল ঘুমের ঘোরে হ'লি মা কাতর,

ওমা, তোর ঘুমের ঘোরে আমায় নে'যায় চোরে

দেখ্‌লি না মা চেয়ে।

উঠে কাল সকালে, বাছা বাছা বলে

কাঁদবি গো বসি ॥'

মায়ের ঘুম আর ভাঙলো না। ব্রাহ্মরূপী অনুচর সেই কাল ব্যাধিরা স্বরূপচাঁদের জান্ (আত্মা) নিয়ে মায়ের কাছে চলে গেল।

এদিকে বাদশাজাদীর এক সময় ঘুম ভাঙলো। চেতনা পেয়ে দেখেন পুত্রের মৃতদেহ পাশে প'ড়ে রয়েছে। কান্নায় তিনি ভেঙ্গে পড়লেন, বাদশাজাদীর আকুল আর্তনাদ বাদশা শুনতে পেয়ে ছুটে এলেন ভূগর্ভের সেই প্রকোষ্ঠে, মৃত-পুত্র কোলে নিয়ে বাদশাজাদী যেখানে বসে অঝোর ঝরে কাঁদছেন। বাদশা কাছে আসতেই তিনি বল্লেন, 'ওগো আমি যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম ভেঙ্গে দেখি স্বরূপচাঁদ আমার নেই।'

গান : 'একবার এসে দেখ হে নাথ কপাল ভেঙ্গেছে।

পরীক্ষায় জগৎ জননী, এসেছিলেন হয়ে ভিখারিণী

কাল পাত্রের (উজীর) কথা শুনে মাথায় বজ্রাঘাত পড়েছে ॥'

এইভাবে বাদশা আর বাদশাজাদী তাঁদের প্রিয় পুত্রের শোকে নানাভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁদের আকুল আর্তনাদে বনের গাছপালাও কাঁদতে লাগল। কিন্তু স্বরূপ চাঁদের মৃতদেহ তো কবরস্থ করতে হবে! উজীর অনেক বোঝালেন; কিন্তু বাদশাজাদী প্রাণভরে কিছুতে তাঁর পুত্রকে কারুর হাতে তুলে দেবেন না। শেষে সেই মরা পুত্রকে কোলে নিয়ে বাদশাজাদী বনে চলে গেলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, পুত্রকে আমি বাঁচাব। দিন যায়, মাস যায়, যায় বছর। পুত্রের দেহ ক্রমে গলে যায়, পচে যায়, থাকে মাত্র কিছু অস্থি। পুত্রের অস্থি(কংকাল)গুলি বুকে কোরে বাদশাজাদী বন থেকে বনে ঘুরে বেড়ান আর কাঁদেন, কাতর প্রার্থনা জানান সেই ভিখারিণীর উদ্দেশে,—

গান : 'মা-বোল ব'লে ডাক স্বরূপচাঁদ,
কাঁদেরে তোর মা দুঃখিনা।
জগৎ আঁধার কোরে আমার,
কোথা গেলে যাদুমণি ॥
কোথা গো মা মা-জননী, কর করুণা এ অভাগিনা ॥
পুত্র হারা হয়ে আমি কাঁদি যে দিবস-রজনী ॥'

এদিকে সেই মা-ভিখারিণী অন্তরে সবই জানতে পারছেন, পারছেন সব বুঝতে। বাদশাজাদীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অলক্ষ্যে সর্বদাই তিনি আছেন। ভিখারিণী মধ্যে একবার মায়া-নদী সৃষ্টি কোরেছিলেন এক বনের মধ্যে, যে বনের মধ্যে বাদশাজাদী মরা পুত্রকে বুকে কোরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সমুখে নদী দেখতে পেয়ে বাদশাজাদী যখন তার জলে মৃত দেহের অস্থি থেকে গলিত মাংস ধুয়ে নিচ্ছিলেন, অদৃশ্যে থেকে সেই ভিখারিণী জলে-ফেলা মাংসগুলি আঁচল পেতে নিয়েছিলেন। বাদশাজাদী এসবের কিছুই জানতে পারলেন না। পুত্রের অস্থিগুলি নিয়ে গাছের লতা দিয়ে মালা তৈরি কোরে নিজের গলায় ধারণ কোরে কাঁদেন আর ঘুরে বেড়ান এবং সেই ভিখারিণীর উদ্দেশে কাতর মিনতি জানান। দেহ তাঁর ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে আসছে, চোখের জ্যোতিও হয়েছে ক্ষীণ, চলার শক্তিও ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে।

একদিন ভিখারিণী নোতুন কোরে একটা মায়াবন সৃষ্টি করলেন। নোতুন বন দেখে বাদশাজাদী সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করলে সেই ভিখারিণী বাঘের মূর্তি ধারণ কোরে তাঁর সামনে এসে দেখা দিলেন। বাদশাজাদী তাই দেখে ভয় না পেয়ে বললেন, 'ওরে বাঘ, আমার জীবনে আর কি প্রয়োজন, তুমি আমাকে নাও, আমার জীবন জুড়োক।' বাঘ বললে, 'আমি তো মানুষ খাই না, খাই তার অস্থি।' বাদশাজাদী বললেন, 'ওরে বাঘ, মানুষ না খেলে তার অস্থি কোথা পাবি?' বাঘ তখন বাদশাজাদীর গলার হাড়ের মালা দেখিয়ে বললে, 'ঐ তো, ঐটা দিলেই হবে।' বাদশাজাদীর মনে কী যেন উদয় হোল। বিশ্বাস কোরে প্রিয়তম পুত্রের অস্থিগুলি সব ঐ বাঘের কাছে সমর্পণ করলেন আর তখনই বাদশাজাদীর দুই চোখ বুজে গেল আর বাঘও কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। অদৃশ্যে থেকে সেই ভিখারিণী অস্থিগুলি জোড়াতালি দিয়ে, আঁচল থেকে মাংসগুলি নিয়ে একটি দেহ তৈরি করলেন এবং হাতের মুঠো থেকে জান্ (প্রাণ) নিয়ে সেই দেহের মধ্যে দিলেন এবং স্বরূপচাঁদকে সেই দেহের আহ্বান করলেন,—

(সুরে :) 'ওঠ ওঠ স্বরূপচাঁদ হওরে চেতন।
কাঁদেন তোর জনম দুঃখিনী, তোর ঘুমে এত মন ॥
স্বরূপচাঁদ ব'লে যখন ভিখারিণী ডেকেছিলো।
ঘুমন্ত ছেলে যেন জাগিয়া বসিল ॥"

দেখতে দেখতে বাদশাজাদীর চোখ খুলে গেল। তখন স্বরূপচাদকে দেখতে পেয়ে কোলে তুলে নিলেন। মা ডাকেন,—

(সুরে :) 'ওরে গোপাল আয় রে, আয় আয় জননীর কোলে।
তুই আমার মা-বলা ধন, একবার ডাক মা বলে ॥
ওরে গোপাল আয় রে, আয় আয় জননীর কোলে ॥'

(পাঁচাল :) 'বাঘ রূপেতে ভিখারিণী দাঁড়ায়ে রয়।
ছুটে গিয়ে ধরে রাণী (বাদশাজাদী) সেই বাঘের পায়।
কে তুমি জননী আমার দেহ পরিচয় ॥'

ভিখারিণী বলেন,—

'শুন শুন ওগো রাণী (বাদশাজাদী) আমার কথা নাও।
বাঘ রূপেতে মা ওলা বিবি দিলাম পরিচয় ॥
তোমার তপেতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।
মরা ছেলে বাঁচিয়ে তোমার কোলে তুলে দিয়েছি ॥
শুন শুন ওগো রাণী, আমার কথা নে।
তোর দেশেতে আমার নামে গান-হাজোত দে ॥
রাণী বলে, মা জননী ধর্ম প্রমাণ কব।
সাত গ্রামে মেডে তোমার গান-হাজোত দেব ॥
× × × × × × × × × × × ×
আশীর্বাদ কোরে মা হলেন বিদায়।
মরা ছেলে বাঁচিয়ে রাণী দেশে চলে যায় ॥
দেখে শুনে ইছব বাদশা এই কথা কয়।
শুন শুন ওগো রাণী আমার কথা নে ॥
স্বরূপচাঁদ তো মরেছিলো বাঁচিয়ে দিলো কে ?
রাণী বলে, বাদশা ওগো বলি আপনার কাছে।
বাঘ রূপে বিবিমা আমার স্বরূপে বাঁচিয়েছে ॥"

বাদশা তখন বিবিমার উদ্দেশে আক্ষেপ করেন,—

"আমি স্বপনে না জানি, শুন গো জননী,
এমন ভাগ্য কি আর হবে।
তুমি জগৎ জননী, হয়ে কাঙালিনী
এসেছিল আমার ঘরে ॥"

অষ্টমঙ্গলা :

কত মহিমা মা তোমার, তব মায়া বোঝা ভার।
কোথা আছ জননী, দেহ পদতরণী, অজ্ঞান-অন্ধ-মূঢ় আমি,
না চিনি তোমায় ॥
তব কৃপা গুণে বাঁধ ঐ চরণে, চরণতরী ভব বারি হতে পারাপার ॥
কত মহিমা মা তোমার……॥"

এই গান সমাপ্ত হলে ব্রতিনীরা পূর্বোক্ত প্রকারের ফলাহার কোরে ঘরের সদর দরোজায় এসে দাঁড়ান আর প্রাগুক্ত উপাচারগুলি সাজিয়ে রাখেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছড়ার আকারে মন্ত্র পড়েন,—

প্রশ্ন :—ঘরে কেন্ রে আলো ? (৩ বার পাঠ্য)

উত্তর :—গিন্নী গেছেন বন ভোজনে, সবাই আছে ভালো।

প্রশ্ন :—ঘরে কেন্ রে পেতল ?

উত্তর :—গিন্নী গেছেন বন ভোজনে সবাই আছে শেতল (শীতল)।

প্রশ্ন :—ঘরে কেন্ রে কাঁটা ?

উত্তর :—গিন্নী গেছেন বন ভোজনে, সবাই আছে লোহার ডাঁটা (=সুস্থ শরীর)।
(৩ বার পাঠ্য)

প্রশ্ন : –ঘরে কেন্ রে মাটি ? (৩ বার পাঠ্য)

উত্তর :—গিন্নী গেছেন বন ভোজনে, সবাই আছে খাঁটি (৩ বার পাঠ্য)।

[প্রতিটি প্রশ্নের পর একবার উত্তর, আবার সেই একই প্রশ্ন, পরে আবার সেই উত্তর, এমনভাবে আলো, পেতল, কাঁটা ও মাটি : এই চার প্রকার দ্রব্যকে অবলম্বন কোরে প্রত্যেক দফায় তিন প্রশ্ন হিসাবে মোট বারো বার উচ্চার্য]

এই প্রথা, আদি গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে আজও চলছে। তবে সন্দেহ নেই, উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এর প্রভাব আজ অতীব ক্ষীণ। জানিনা কবে, গ্রামীণ সংস্কৃতির এই প্রজ্জ্বল প্রভাটি তথাকথিত সভ্যতার ঘূর্ণি-বাত্যায় সামাজিক চেতনা থেকে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। সেই আশংকায় সাধারণের গোচরে আনার জন্য এই প্রয়াস ॥

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্মতারিখ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বাংলাদেশের নবযুগের অন্যতম প্রবর্তক হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডিরোজিওর জন্মতারিখ লইয়া বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। আমার সৌভাগ্যক্রমে একদিন সদ্য প্রকাশিত Selections from Calcutta Gazette, 1824-1832 গ্রন্থের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সহসা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল :

"Monday evening December 26, 1831, Deaths

At Calcutta, on the 26th December Henry Louis Vivian Derozio, Esq. aged 23 years 8 months and 8 days."

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ডিরোজিওর মৃত্যু হয় ২৬শে ডিসেম্বর এবং প্রচলিত মত যে ২৩শে ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়, ইহা ভ্রান্ত এবং তাঁহার জন্ম হয় ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল বা অন্য কোন তারিখে নহে। মাস ও দিন তারিখের উল্লেখ দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে ডিরোজিওর পরিবারের নিকট হইতেই লেখক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টানদের পরিবারে জন্মমাস ও তারিখের সঠিক বিবরণ থাকে ও তাহা অনেক স্থলে সমাধির উপর প্রস্তরফলকে লিখিত হয়। সুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিপিবদ্ধ এই তারিখটি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত History and Culture of the Indian People গ্রন্থের দশম খণ্ডের দ্বিতীয়ভাগে (Vol. X, Part II, P. 435, P. 462, fn. 6) আমার এই মন্তব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে অন্যান্য প্রবন্ধে ও গ্রন্থে এই মত প্রকাশিত করিয়াছি।

সম্প্রতি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩৮৩ : প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায়, পৃ. ৪৮) শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী ডিরোজিও সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ সাহেব যে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিওর জন্ম হয় লিখিয়াছেন তাহাই ঠিক, কারণ তিনি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত Bengal Directory গ্রন্থে ঐ তারিখের নির্দেশ পাইয়াছেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখিত Calcutta Gazette অপেক্ষা উক্ত গ্রন্থকে অধিকতর প্রামানিক গণ্য করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরীর যুক্তি এই যে—"কলিকাতা গেজেটে ডিরোজিওর জন্ম বছর ও তারিখের কোন উল্লেখ নেই, কাজেই

কিভাবে ঠিক করা হল মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ২৩ বছর ৮ মাস ৮ দিন তাও বোঝা যায় না। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ডিরোজিওর জন্ম হয়েছিল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল।" এই যুক্তিটি হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। কারণ ইহা সহজেই বোঝা যায় যে যাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা গেজেটে ডিরোজিওর সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল যে মৃত্যুকালে ডিরোজিওর বয়স ছিল ২৩ বৎসর ৮ মাস ৮ দিন—তাঁহারা যে নিশ্চয়ই ডিরোজিওর জন্মতারিখ প্রথমে জানিয়া পরে হিসাব করিয়া তাঁহার বয়স মৃত্যুকালে—বছর,—মাস,—দিন নির্ণয় করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। উন্মাদ ভিন্ন আর কেহ জন্মতারিখ না জানিয়া কাহারও মৃত্যুকালে তাহার বয়স কত বছর কত মাস কত দিন ছিল ইহা অনুমান করিতে পারে না।

ডিরোজিও কোন্ তারিখে হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধেও মতভেদ ছিল। কাহারও মতে ১৮২৮, কাহারও মতে ১৮২৭, এবং কাহারও মতে ১৮২৬। এই বিষয়েও আমিই সর্বপ্রথমে 'সমাচার দর্পণে'র ১৮২৬ সনের ১৩ই মে মাস তারিখের সংখ্যায় "হিন্দু কালেজে ডি রোজী সাহেবের" শিক্ষকপদে নিযুক্ত হওয়ার সংবাদটির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলাম যে ডিরোজিও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রথমভাগে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জন্মতারিখ সম্বন্ধে কলিকাতা গেজেটের উক্তির ন্যায় এ সম্বন্ধেও আমার উক্তির কোন উল্লেখ না করিয়া যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিয়াছেন: "ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন ১ মে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে (পৃ. ১২)।" কিন্তু বস্তুত তিনি একটু ভুল করিয়াছেন। আমি লিখিয়াছিলাম মে মাসের প্রথম ভাগে অর্থাৎ সমাচার দর্পণের উক্ত সংখ্যা প্রকাশের অল্প পূর্বে—ইহা ১লা মে না হইতেও পারে। উক্ত পত্রিকায় প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ২০শে বৈশাখ (১লা মে) হিন্দু কলেজ নব প্রতিষ্ঠিত ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং তাহার পরই ডিরোজিওর শিক্ষকতা পদে নিয়োগের কথা আছে। কিন্তু ইহাতে এমন বোঝা যায় না যে ঐ দুইটি ঘটনা ঠিক এক তারিখেই ঘটিয়াছিল।

যে ম্যাজ সাহেবের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া যোগীন্দ্রবাবু কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ডিরোজিওর মৃত্যু তারিখ ভ্রান্ত বলিয়া নিঃসন্দেহে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও যে ডিরোজিওর শিক্ষকতা পদে নিয়োগের তারিখ সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন ইহা যোগীন্দ্রবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। 'সমাচার দর্পণে'র উক্তিও যে কারণে অগ্রাহ্য করা যায় না কলিকাতা গেজেটের উক্তিও ঠিক সেই কারণেই গ্রহণ করা উচিত।

পাদটীকা

এই প্রবন্ধে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য:

১. *Indica*: Published by Heras Institute; 1976, pp. 113-119.

২. মৎপ্রণীত *Renascent India*: Chapter X.

গুপ্তিপাড়ার জোড়বাংলা ও তাহার নির্মাণকাল।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য

হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া মহাগ্রামের শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র জীউ মঠের চারিটি বাংলা রীতিতে গঠিত মন্দির আছে—শ্রীচৈতন্যের মন্দির, বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, রামচন্দ্রের মন্দির ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির। এই মন্দির চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের জোড়বাংলা মন্দিরটিই প্রাচীনতম।[১]

আগেকার দিনে বাংলাদেশে চালাঘরের প্রচলন বেশী ছিল। চালাঘর নির্মাণের প্রধান উপাদান হইল বাঁশ। বাঁশের বাখারী নমনীয়। এই নমনীয় বাখারীর সাহায্যে বাঙ্গালী বাসের জন্য ঘরের দেওয়ালের উপর ধনুকাকৃতি খড়ের চালার আচ্ছাদন নির্মাণ করিত। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে চালাঘরের প্রচলন এখনও আছে। বাঙ্গালী নিজে চালাঘরে বাস করিত। দেবতার জন্যও চালার আকৃতিবিশিষ্ট মন্দির নির্মাণ করিত। মন্দির নির্মাণ-কার্যে পাথরের অভাব সে ইঁট দিয়া পূরণ করিত। বাঙ্গালীর এই মন্দির স্থাপত্য রীতিকে বাংলা-রীতি বলা হয়। এই 'বাংলা-রীতি' বাঙ্গালী স্থপতিদের নিজস্ব উদ্ভাবন ও বৈশিষ্ট্য। রাঢ় বাংলা জুড়িয়া বাঙ্গালীর এই মন্দির স্থাপত্য-রীতির অসংখ্য নিদর্শন ছড়াইয়া আছে। এই বাংলা-রীতির স্থাপত্য পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বিকাশলাভ করিয়াছিল এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করিয়াছিল ও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মন্দির-স্থাপত্য-ধারা অব্যাহত ছিল। দক্ষিণের 'বেসর' ও দ্রাবিড় রীতির মতো এবং উড়িষ্যার 'পীরা' বা 'ভদ্রদেউল' রীতির মতো বাংলা-রীতি হয়তো ততো সুন্দর মনে না হইতে পারে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই রীতি যে ষোড়শ শতাব্দীতে 'বিশেষ জনপ্রিয়' হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আগ্রার 'বাংলা মহল'। সম্রাট আকবর (খ্রীঃ ১৫৫৬-১৬০৫) আগ্রায় বাংলা-রীতিতে অনেকগুলি সৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[২] আইন-ই-আকবরীতে ইহাদের 'বাংলামহল' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩] ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঞ্জাবে যে সকল গৃহ নির্মিত হয় তাহাদের মধ্যে বহু গৃহের গঠনরীতিতে বাংলা-রীতির প্রভাব দেখা যায়। সম্রাট শাহজাহানের (খ্রীঃ ১৬২৭-৫৮) রাজত্বকালে গোয়ালিয়রের উপান্তে গোঁড়ক্ষত্রিয় (Gond) রাজগণের রাজ্যস্থিত প্রাচীন ইন্দুরখী শহরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগে বাংলা-রীতিতে নির্মিত ইষ্টকগৃহের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দের পুরাতত্ত্ব বিভাগের জে. ডি. বেগলার উহা পরিদর্শন করেন।[৪]

বাংলা-রীতিতে নির্মিত মন্দিরগুলি বিভিন্ন ধরনের, যেমন—জোড়বাংলা (দোচালা), চারবাংলা (চারচালা), আটবাংলা (আটচালা), বারোবাংলা (বারোচালা) এবং ষোলবাংলা (ষোলচালা)। ইহাদের মধ্যে জোড়বাংলা এবং চারবাংলা মন্দিরই বেশী দেখা যায়। এই

বাংলা মন্দিরগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার ছোট ছোট চূড়াবিশিষ্ট। এই চূড়াগুলিকে 'রত্ন' বলে। চূড়ার সংখ্যা অনুযায়ী মন্দিরের পরিচয় দেওয়া হয়—যেমন 'পঞ্চরত্ন মন্দির' 'নবরত্ন মন্দির' ইত্যাদি। মন্দিরের প্রত্যেক তলার চারিকোণে চারিটি, কোথাও বা তার বেশী 'রত্নে'র সমাবেশ দেখা যায়।

উপরে বলা হইয়াছে যে, গুপ্তিপাড়া মঠের মন্দির চারিটির মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের মন্দিরটিই প্রাচীনতম। এইটিই বৃন্দাবনচন্দ্রের আদি মন্দির এবং এই মন্দির নির্মাণের পর পর্ণকুটীরবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত হ'ন। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনচন্দ্রের বর্তমান সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইলে বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ ঐ নবনির্মিত মন্দিরে অধিষ্ঠিত হ'ন। জোড়বাংলা মন্দির শূন্য পড়িয়া থাকে। অতঃপর দণ্ডী সদানন্দ আশ্রম (খ্রীঃ ১৮১২-৩০) ঐ শূন্য মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন।

গুপ্তিপাড়া মঠের এই জোড়বাংলা মন্দিরের নির্মাণকাল সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যায় না। মন্দিরগাত্রে কোন প্রতিষ্ঠার সনতারিখ নাই। এরূপ ক্ষেত্রে যে সকল সূত্র ধরিয়া মন্দিরের আনুমানিক নির্মাণকাল স্থির করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে জনশ্রুতিকেও একেবারে বাদ দেওয়া চলেনা। জনশ্রুতি মতে—

১. সত্যদেব সরস্বতী (প্রকৃত নাম সত্যানন্দ সরস্বতী) নামে একজন সন্ন্যাসী গুপ্তিপাড়ায় গঙ্গাতীরে আসিয়া জঙ্গলমধ্যে কুটীর নির্মাণ করিয়া সাধন-ভজন করেন এবং কিছুকাল পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ভাগীরথীর পরপারবর্তী শান্তিপুরের জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ আনিয়া আশ্রম কুটীরে প্রতিষ্ঠা করেন।

২. রাজা বিশ্বেশ্বর রায় নামে ভূস্বামী মঠের জোড়বাংলা মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং সত্যদেব সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুর আশীর্বাদে বিষয়-সম্পত্তি অর্জন করেন এবং মোমড়া প্রভৃতি জমিদারী বৃন্দাবনচন্দ্রকে দান করেন। ইহা ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।[৫]

জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়র লিখিয়াছেন, আকবরের রাজত্ব-কালের শেষভাগে ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্বেশ্বর রায় এই মন্দির নির্মাণ করেন।[৬]

প্রথমে বিচার্য—বিশ্বেশ্বর রায় কে এবং তিনি কোন্ সময় আবির্ভূত হ'ন।

গুপ্তিপাড়ার ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩১০ সালের ২রা আশ্বিন তারিখের 'বসুমতী' পত্রিকায় (তৎকালে সাপ্তাহিক পত্র) 'গুপ্তিপাড়া মঠ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন—বিশ্বেশ্বর রায় ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে গুপ্তিপাড়ায় বর্তমান ছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল মণ্ডলঘাট পরগনা জরীপ করাইবার জন্য বিশ্বেশ্বর রায় ও তাঁহার ভ্রাতাকে পশ্চিমাঞ্চল হইতে আনেন এবং মণ্ডলঘাট পরগনার অধিকারী শীলবাবুদের মহাফেজখানায় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে সকল

তথ্য পাওয়া যাইবে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ার ৺রজনীকান্ত ভট্টাচার্যকে লিখিত এক পত্রে সতীশচন্দ্র এই অভিমতের পুনরুক্তি করিয়া বলেন, জনৈক বৈদ্য বিশ্বেশ্বর রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ (খ্রীঃ ১৯০৩-১৫০=) ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় বর্তমান ছিলেন। তিনি মোমড়া প্রভৃতি জমিদারীর অধিকারী ছিলেন না। গুপ্তিপাড়ার ৺বারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'গুপ্তিপাড়া মঠ বিবরণ' গ্রন্থে সতীশচন্দ্রের মত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয় এবং আকবরের সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়াছেন।[৭] সাহিত্যিক ৺হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় (সম্ভবতঃ সতীশচন্দ্রের মত গ্রহণ করিয়া) রাজা বিশ্বেশ্বর রায়কে সম্রাট আকবরের সমসাময়িক বলিয়া এবং আদি জোড়বাংলা মন্দিরটি ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে নির্মিত হয় বলিয়া ধরিয়াছেন।[৮] 'বাঁকুড়ার মন্দির'-প্রণেতা শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও (সম্ভবতঃ হেমেন্দ্রপ্রসাদের মতানুসরণে) বিশ্বেশ্বর রায়কে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং জোড়বাংলা মন্দিরের নির্মাণকাল আঃ ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরিয়াছেন।[৯]

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—সম্রাট আকবরের (খ্রীঃ ১৫৫৬-১৬০৫) রাজত্বকাল মধ্যে টোডরমল যে পশ্চিমাঞ্চল হইতে মণ্ডলঘাট পরগনা জরীপের জন্য কোন ক্ষত্রিয়কে আনিয়াছিলেন এবং ইনি যে ভূস্বামীরূপে গুপ্তিপাড়ায় বসতি করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সতীশচন্দ্র কোন বিশিষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। শীলবাবুদের মহাফেজখানার কোন বিশেষ কাগজপত্র অথবা দলীলের ভিত্তিতে তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তিনি লেখেন নাই। মণ্ডলঘাট পরগনা সরকার সাতগাঁওয়ের এবং চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তে (খ্রীঃ ১৭২২) এই জমিদারী পদ্মনাভ রায়ের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় এবং ৫ পরগনায় ১, ৪৬, ২৬১, টাকা বার্ষিক জমা ধার্য হয়, পরে ইহা বর্ধমান রাজ্যের অধিকারে আসে।[১০] যদিও ধরা যায় যে, বিশ্বেশ্বর রায় নামে কোন ক্ষত্রিয় পরগনা মণ্ডলঘাট জরীপ করিবার জন্য টোডরমল কর্তৃক এদেশে আনীত হ'ন। তাহা হইলেও তিনি মন্দির-নির্মাতা (?) বিশ্বেশ্বর রায় নহেন, কারণ আমরা পরে দেখাইব যে জোড়বাংলা মন্দিরের নির্মাণকার্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ঘটিয়াছিল। সতীশচন্দ্র দ্বিতীয় একজন বৈদ্য বিশ্বেশ্বর রায়ের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহার সময়কাল খ্রীঃ ১৭৫৩ বলিয়াছিলেন—ইহাও যে ভ্রান্ত তাহা আমরা দেখাইতেছি।

খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে গুপ্তিপাড়ার বৈদ্যবংশীয় জনৈক রাজা বিশ্বেশ্বর রায়ের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ইনি রায়পুর পরগনার ভূস্বামী ছিলেন এবং—

১. খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে গুপ্তিপাড়ার বোনাসের রঘুনাথ জীউর প্রতিষ্ঠাতা রামকান্ত গোস্বামীকে ভূমিদান করিয়াছিলেন ;[১১]

২. তিনি বাংলা ১০৯০ সালে (খ্রীঃ ১৬৮৩) গুপ্তিপাড়ার শৌনক বংশীয় পণ্ডিত রামদাস বাচস্পতিকে নিষ্কর ভূমিদান করিয়াছিলেন ;[১২] এবং

৩. তিনি ১০৫৫ সালে (খ্রীঃ ১৬৪৮) গুপ্তিপাড়ার চট্ট শোভাকর বংশীয় পণ্ডিত

মহাদেব তর্কবাগীশকে রায়পুর পরগনায় নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমিদান করিয়াছিলেন।[১৩] এই মহাদেব তর্কবাগীশ গুপ্তিপাড়ার সিদ্ধ সাধক 'মহাকবি' মথুরেশ চক্রবর্তী বিদ্যালঙ্কারের সহোদর। মথুরেশ ১৫৯৪ শকাব্দের কার্তিক মাসে (খ্রী: ১৬৭২) 'শ্রীশ্যামাকল্পলতিকা' নামক সংস্কৃত খণ্ড কাব্য রচনা করেন।[১৪]

৪. এই বিশ্বেশ্বর রায় বৈদ্যবংশীয় এবং 'সেনরায়ো'পাধিক ছিলেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—"বিখ্যাত বৈদ্য গ্রন্থকার ভরত মল্লিক ১৫৯৭ শকে (খ্রী: ১৬৭৫) 'চন্দ্রপ্রভা' নামক কুলগ্রন্থ রচনা করেন ; এই গ্রন্থে তাঁহার পৌত্রের নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় (পৃ. ৩২)। 'চন্দ্রপ্রভা'র বহুস্থানে গুপ্তিপাড়াবাসী সেনবংশীয় বিশ্বেশ্বর রায়ের সম্বন্ধাদির উল্লেখ রহিয়াছে। রায় বিশ্বেশ্বর ক্ষত্রিয় ছিলেন না, অকুলীন বৈদ্য ছিলেন। ভরত মল্লিকের উক্তি অনুসারে তাঁহার সাতটি কন্যা বিশিষ্ট কুলীন বৈদ্যে অর্পিত হইয়াছিল ('চন্দ্রপ্রভা' পৃ. ২৬০, ২৬৭, ২৭২-৭৩, ২৯৯, ৩৪০, ৪০১)। তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য—

'রমাবল্লভ দাসেন গৃহীতা দৈন্যদোষতঃ।
গুপ্তিপাড়াবাসি-সেনরায়-বিশ্বেশ্বরাত্মজা ॥' (পৃ. ২৬০)

এই রমাবল্লভ ভরত মল্লিকের নিজ শ্বশুরের সপিণ্ড জ্ঞাতি এবং দৈন্যদোষে গণ্ডগ্রাই নিকৃষ্ট পরিণয়ে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভরত মল্লিক তাঁহার গ্রন্থে বিশ্বেশ্বরের দৌহিত্রদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু অধস্তন প্রদৌহিত্র প্রভৃতি কাহারও নাম নাই। সুতরাং ভরত মল্লিক এবং বিশ্বেশ্বর রায় সমসাময়িক ছিলেন ধরিতে হইবে এবং উভয়েই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও শেষভাগে জীবিত ছিলেন। 'চন্দ্রপ্রভা'র অন্যত্র (পৃ. ২২০-২২১) বিশ্বেশ্বর রায়ের যে পরিণয় ব্যাপারের উল্লেখ আছে, তদ্দারাও তাঁহার সময় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে যাইবে না।[১৫]

বিপিনমোহন সেন তাঁহার 'চাঁদরায়ী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—বিশ্বেশ্বর রায় নিঃসন্তান ছিলেন।[১৬] এ উক্তি ভ্রান্ত। 'চন্দ্রপ্রভা'য় বিশ্বেশ্বর রায়ের সাতকন্যার উল্লেখ আছে। রামজীবন নামক এক পুত্রেরও উল্লেখ আছে। বিশ্বেশ্বর রায়ের গুপ্তিপাড়া নিবাসী অধস্তন পুরুষদের গৃহে রক্ষিত একটি বংশলতা হইতে জানা যায় বিশ্বেশ্বর রায়ের অপর দুই পুত্র ছিল, পরশুরাম ও নীলকণ্ঠ এবং গুপ্তিপাড়া বিশ্বেশ্বর বংশীয়রা নীলকণ্ঠের ধারা হইতে উদ্ভূত ও বিশ্বেশ্বর হইতে ৯ম পুরুষ অধস্তন। তিন পুরুষে ১০০ বৎসর ধরিলে বিশ্বেশ্বর রায়ের সময়কাল খ্রী: ১৭শ শতাব্দী হয়।

দ্বিতীয় বিচার্য—বিশ্বেশ্বর রায় কি মোমড়া প্রভৃতি জমিদারী বৃন্দাবনচন্দ্রকে দান করেন এবং জোড়বাংলা মন্দির নির্মাণ করেন ?

এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা কঠিন। বৃন্দাবনচন্দ্র মঠের তায়দাদাদি প্রাচীন কাগজপত্র বর্তমানে মঠে নাই। সম্ভবতঃ উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে অথবা খোয়া গিয়াছে। তবে রাজা বিশ্বেশ্বর রায় যে দেবব্রাহ্মণের হিতার্থ নিষ্কর ভূমিদান করিতেন, তাহার তিনটি

প্রমাণ উপরে দেওয়া হইয়াছে। যদি বিশ্বেশ্বর রায় বৃন্দাবনচন্দ্রকে জমিদারী দান করিয়া থাকেন, তবে কোন্ সময়ে করিয়াছিলেন? বিশ্বেশ্বর রায় রায়পুর পরগনার ভূস্বামী ছিলেন। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান (খ্রীঃ ১৬২৭-৫৮) অন্যান্য ২০টি পরগনার সহিত রায়পুর পরগনা পাটুলীর ভূস্বামী রাঘব রায়কে (খ্রীঃ ১৬২৭-৭৪) বন্দোবস্ত দেন।[১৭] পূর্বে বলা হইয়াছে যে বিশ্বেশ্বর রায় ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাদেব তর্কবাগীশকে ভূমিদান করেন। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বেশ্বর রায় জীবিত থাকিলেও রায়পুর পরগনা তাঁহার অধিকারে ছিল না। ইহা পাটুলীর ভূস্বামী রাঘব রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং বিশ্বেশ্বর রায় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা সত্যানন্দ সরস্বতীকে জমিদারী দান করিয়া থাকিলে, তাহা ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বা তৎপূর্বে ঘটিয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনটি অসুবিধা দেখা যায়—

১. হুগলী জেলা জজ আদালতের ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের 'রামচন্দ্র সেন বনাম দণ্ডী মধুসূদনানন্দ আশ্রম' নামিত মোকর্দমায় ঐ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে হুগলী জেলা জজ মিঃ বার্নিয়ে (Mr. Bernier) বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন, তাহার উত্তরে মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁহার ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখের পত্রে হুগলী জেলা জজকে জানান যে, গুপ্তিপাড়া মঠের অধিকাংশ সম্পত্তি বর্ধমান জমিদারী হইতে প্রদত্ত। অবশিষ্ট সম্পত্তি দণ্ডীদের স্বোপার্জিত।[১৮] মোমড়া জমিদারী ৫নং তৌজী কৃষ্ণবাটীর (রায়পুর পরগনার) অন্তর্ভুক্ত এবং বৃন্দাবনচন্দ্রের বর্তমান জমিদারীসমূহের মধ্যে ইহা বৃহত্তম। সুতরাং মহারাজ তেজচন্দ্রের উক্তি মানিয়া লইলে মোমড়া প্রভৃতি মৌজার জমিদারী বর্ধমান রাজের প্রদত্ত, বিশ্বেশ্বর রায়ের প্রদত্ত নহে। রায়পুর পরগনা ১১৪৭ সালে (খ্রীঃ ১৭৪০) বর্ধমান রাজের অধিকারে আসে।[১৯] সুতরাং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বা তৎপরে মোমড়া প্রভৃতি জমিদারী বৃন্দাবনচন্দ্রকে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়।

২. গুপ্তিপাড়া মঠে প্রচলিত একটি দীর্ঘকালীন জনশ্রুতি এই যে—সত্যানন্দ সরস্বতীর তিরোধানের পর তাঁহার শিষ্য গোমুখানন্দ সরস্বতী মঠের গদীর অধিকার পাইয়া ইষ্টদেবতার সেবার জন্য ধনী গৃহস্থদের দ্বারে বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহসহ উপস্থিত হইতেন। গৃহস্থ সেবার আয়োজন করিয়া দিলে দণ্ডী আয়োজিত দ্রব্যাদি ইষ্টদেবতাকে ভোগ দিয়া সমস্ত ভোগই প্রসাদস্বরূপ গৃহস্থকে দিয়া দিতেন। নিজে কিছুই গ্রহণ করিতেন না; অন্যত্র ভিক্ষা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। গোমুখানন্দের এইরূপ নির্লোভ ও সাধু আচরণ দেখিয়া ধনীগণ আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের দানে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির নির্মিত হইল।[২০] সত্যানন্দ বিশ্বেশ্বর রায় প্রদত্ত জমিদারী পাইলে তাঁহার শিষ্যকে ইষ্টদেবতার সেবার জন্য ধনী গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইত না।

এই সকল কারণে স্পষ্ট প্রমাণ না পাইলে রাজা বিশ্বেশ্বর রায়কে জোড়বাংলা মন্দিরের নির্মাতা অথবা জমিদারী দানকর্তা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

তৃতীয় বিচার্য—মঠের প্রতিষ্ঠাতা সত্যদেব (বা সত্যানন্দ) সরস্বতী কে এবং কোন্ সময়ে তিনি আবির্ভূত হ'ন?

১৩১৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অভিরাম দাস (খ্রীঃ ১৭শ)-কৃত 'পাটপর্যটন' নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অনুযায়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নবদ্বীপ প্রভৃতি পাঁচটি ধাম। শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদগণ অম্বিকা, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি ১২টি বৈষ্ণবপাটে শ্যামসুন্দর মূর্তি স্থাপন করেন। তাঁহাদের ভক্তগণ আরও ১৭টি পাট প্রতিষ্ঠা করেন। অভিরাম দাস তাঁহার গ্রন্থে এই ১৭টি পাটের বিবরণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে গুপ্তিপাড়ার সত্যানন্দ সরস্বতীর পাট অন্যতম। অভিরাম দাস লিখিয়াছেন,—

বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর।
বগনাপাড়া নিবাসী শ্রীরামাক্রি ঠাকুর।
গোপ্তি পাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পীরিতি॥—ইত্যাদি।[২১]

"গোপ্তি পাড়া"র এই সত্যানন্দ সরস্বতী যে গুপ্তিপাড়া মঠের প্রতিষ্ঠাতা সত্যানন্দ সরস্বতী (লোক-প্রচলিত নাম সত্যদেব সরস্বতী) সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উদ্ধৃত পয়ারের "সেবেন করিয়া পীরিতি" কথাগুলি হইতে বোঝা যায় 'পাটপর্যটন' রচনাকালে সত্যানন্দ সরস্বতী জীবিত ছিলেন। উদ্ধৃতি হইতে আরও বোঝা যায় যে, সত্যানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন এবং গুপ্তিপাড়া মঠ আদিতে বৈষ্ণব মঠ ছিল ও খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল।

চতুর্থ বিচার্য—কোন্ সময়ে মঠের উৎপত্তি হয় এবং কোন্ সময়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের আদি জোড়বাংলা নির্মিত হয়?

এ বিষয়ে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি দুর্লভ তথ্য প্রকাশ করেন।[২২] দীনেশচন্দ্র বর্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রাম হইতে একখানি হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন। পুঁথিখানি 'চৌর পঞ্চাশিকা' কাব্যের কালীপক্ষীয় টীকাগ্রন্থের অনুলিপি। এ যাবৎ এই পুঁথি অন্যত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। পুঁথিখানি জীর্ণ। স্থানে স্থানে খণ্ডিত ও ১০৩ পত্রে (folio) সম্পূর্ণ।[২৩] গ্রন্থারম্ভে গদ্যে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের বর্ণনা আছে, কিন্তু পাত্র-পাত্রীর নামে কিছু প্রভেদ আছে। যেমন টীকাগ্রন্থের সুন্দর কাশীরাজ গুণরত্নের পুত্র, বিদ্যা বর্ধমানরাজ বীরসিংহের কন্যা, দূতের নাম দ্বিজ জনার্দন ইত্যাদি। গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে সংযোজিত পুষ্পিকা[২৪] হইতে দীনেশচন্দ্র ধারণা করেন যে, যাত্রা নাটকের অনুকরণে অভিনয়ের জন্য গ্রন্থকার চন্দ্রচূড় ব্রহ্মচারী এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের মূল অংশ হইল—চোর কবি-কৃত 'চৌর পঞ্চাশিকা'র কালীপক্ষে ভক্তিরসাত্মক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। গ্রন্থের শেষে লেখক চন্দ্রচূড় ব্রহ্মচারী আত্মপরিচয় দানকালে নিজেকে

গুপ্তপল্লীর দণ্ডিশ্রেষ্ঠ গোমুখের ছাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কল্যাণদেবের পৌত্র ও জগন্নাথের পুত্র ত্রিপুরারাজ চম্পক রায়ের দৈবাৎ সঙ্গলাভ হওয়ায় তাঁহার আদেশে ১৬২৭ শকে বৃহস্পতিবারে গ্রন্থ রচনা (সমাপ্ত) করেন এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন।[২৫] এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে চম্পক রায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

আসাম সরকার প্রকাশিত 'ত্রিপুরা বুরুঞ্জী'তে এবং 'ত্রিপুরার জয়মালা'য়[২৬] চম্পক রায় সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্য অনুযায়ী আঃ ১৬০৬ শকাব্দে (আঃ খ্রীঃ ১৬৮৪) ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রাজা রামমাণিক্যের মৃত্যু হয়। ত্রিপুরারাজ কল্যাণমাণিক্যের পৌত্র এবং জগন্নাথমাণিক্যের পুত্র চম্পক রায় রাজা রামমাণিক্যের দেওয়ান ছিলেন। মৃত্যুকালে রামমাণিক্য তাঁহার সাত বৎসর বয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যকে চম্পক রায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। চম্পক রায় দেওয়ান হইয়া নাবালক দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের নামে ত্রিপুরা শাসন করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে রামমাণিক্যের ভ্রাতা নরেন্দ্রমাণিক্য নবাবের [সুবাদারের ?] সৈন্যের সাহায্যে ত্রিপুরা অধিকার করেন। চম্পক রায় ঢাকায় পলায়ন করেন। পরে উদয়পুরের (ত্রিপুরা) অমাত্যগণের সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাইয়া ঢাকা হইতে সৈন্য আনিয়া চণ্ডীগড়ের যুদ্ধে নরেন্দ্রমাণিক্যকে পরাস্ত করেন এবং ত্রিপুরারাজ্য উদ্ধার করেন। নরেন্দ্রমাণিক্য পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন ও পরে বন্দী হইয়া ত্রিপুরায় আনীত হ'ন এবং চম্পক রায়ের আদেশে নিহত হ'ন। চম্পক রায় পুনরায় দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যকে সিংহাসনে বসাইয়া দেওয়ানরূপে ত্রিপুরা শাসন করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে রাজ্যের প্রধানদের ষড়যন্ত্রের ফলে চম্পক রায় ও দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। এই বিভেদ গুরুতর হইয়া উঠে। চম্পক রায় ঢাকায় পলায়নের উদ্দেশ্যে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যান। কিন্তু রাজ্যের প্রধানগণের ষড়যন্ত্রে আঃ ১৬২৯ শকাব্দে (আঃ খ্রীঃ ১৭০৭) উদয়পুর হইতে কিছুদূরে ধৃত ও নিহত হ'ন। সম্ভবতঃ চম্পক রায়ের প্রথমবার ঢাকায় অবস্থানকালে চন্দ্রচূড় তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া ত্রিপুরা আসেন[২৭] এবং ত্রিপুরা রাজসভায় অবস্থান করিয়া টীকাগ্রন্থ রচনা করেন এবং ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাকালে ত্রিপুরা পরিত্যাগ করেন।

এইবার চন্দ্রচূড়ের টীকাগ্রন্থের প্রসঙ্গে আসা যাক্।

চন্দ্রচূড়ের টীকাগ্রন্থের শেষে সংযোজিত বিবৃতি অনুযায়ী তাঁহার গ্রন্থ ১৬২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। পুঁথির "ইতি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ—" ইত্যাদি সমাপ্তি বাক্যের শেষেও "শকাব্দাঃ ॥ ১৬২৭ ॥" লিখিত আছে।[২৮] পুঁথির ১০৩/১-সংখ্যক পত্রে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয়সূচক শ্লোকের ২য় পংক্তির "নিবসতি সততং" কথা হইতে ধারণা হয়, গ্রন্থ রচনাকালে অর্থাৎ ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে মঠের ২য় দণ্ডি, সত্যানন্দ সরস্বতীর শিষ্য এবং গ্রন্থকারের গুরু গোমুখানন্দ সরস্বতী জীবিত ছিলেন। সুতরাং গ্রন্থকারের গুরুর গুরু

সত্যানন্দ সরস্বতী নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন এবং ঐ সময় বা তাহার কিছু আগে তিনি গুপ্তিপাড়া মঠের প্রতিষ্ঠা করেন।

জনশ্রুতি অনুসারে সত্যানন্দ সরস্বতী যখন গুপ্তিপাড়ায় আসেন তখন তিনি তরুণ বয়স্ক ছিলেন এবং তখন বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রথম সেবক—শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ জীবিত ছিলেন। সত্যানন্দের গুপ্তিপাড়ায় ভাগীরথী-তীরে আশ্রম-কুটীর নির্মাণ করিবার কিছুকাল পরে (তখন শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ পরলোকগত) তিনি ঐ ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যার নিকট হইতে বৃন্দাবনচন্দ্রকে গুপ্তিপাড়ায় আশ্রম-কুটীরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।[২৯] ইহাও জনশ্রুতি আছে যে, সত্যানন্দ দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। যদি দণ্ডিদের পর্যায় মোটামুটি দশ বৎসর ধরা হয়, তাহা হইলে গোমুখানন্দ আঃ (১৭০৬-১০ =) ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সত্যানন্দের তিরোধানের পর মঠের গদী পান। সত্যানন্দ ৩০ বৎসর বয়সে গুপ্তিপাড়া আসিয়া থাকিলে এবং ৮০ বৎসর বয়সে তিরোহিত হইলে তাঁহার গুপ্তিপাড়ায় আগমনকাল হয় আঃ { ১৬৯৬ – (৮০ – ৩০)} = ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার কমপক্ষে দুই বৎসর পরে বৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্তিপাড়ায় আনীত হ'ন। সুতরাং মঠের প্রতিষ্ঠাকাল আঃ ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে।[৩০]

শ্রীপতি কবিরত্ন কর্তৃক পরিবেশিত জনশ্রুতি অনুযায়ী যদি জোড়বাংলা মন্দির গোমুখানন্দ সরস্বতীর আমলে নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জোড়বাংলা মন্দির আঃ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে কোন সময় নির্মিত হইয়াছিল।

পাদটীকা

১. "The oldest is that of Chitanya Dev which faces east and has a door on the west ; there are three Cusped arches on the east, but they have been walked up, leaving a small door. Its roof is that of the Jor-Bangla type, with two iron rods to represent 25 pires. It contains the images of Chaitanya and Nityananda, the two great Vaishnava preachers of Bengal."—*Bengal District Gazetteers*, Hooghly, vol. xxix, p. 262.

[মঠের মন্দির চতুষ্টয়ের মধ্যে এইটিই আয়তনে সর্বাধিক ছোট। চত্বর বাদে মন্দিরের দৈর্ঘ্য ২২' ফু. ৯" ই. এবং প্রস্থ ২২' ফু. ৬" ই ; ভূমি হইতে মন্দিরের উচ্চতা ২১' ফু. ৫" ই, মন্দিরের চারিদিকে ৫' ফু. করিয়া প্রশস্ত চত্বর। ভূমি হইতে চত্বরের উচ্চতা ৪' ফু ৩" ই ; মন্দিরের পূর্ব দিকে থামের গায়ে স্বল্প সূক্ষ্ম অলঙ্করণ আছে।]

২. Vincent Smith : *Oxford History of India* 2nd ed. p. 351.

৩. "The reason for the name Bengali Maball may be found in the

statement made in the Ain to the effect that Akbar's fort in Agra contains more than five hundred. Stone edifices in the five styles of Bengal and Guzrat—*Archaeological Survey of India*, 1903-04.

৪. "At Indurkhi there are some chhatris with curved eaves and ridges to the roofs like the thatched houses and curve-ridged temples of Lower Bengal."—*Archaeological Survey of India*, vol. vii, Bundelkhand and Malwa, p. 38.

৫. বিপিনমোহন সেন: 'চাঁদরাণী,' ২য় সং (১৩১৮), পৃ. ১৭-১৯, পৃ. ২১-২৩ দ্রষ্টব্য। বিপিনমোহন লিখিয়াছেন, গ্রন্থরচনা কাল অর্থাৎ ১৭১৬ শকাব্দ (=খ্রীঃ ১৮৯৪) হইতে প্রায় ৩২৪ বৎসর পূর্বের ঘটনা। তদনুযায়ী ইহা (খ্রীঃ ১৮৯৪-৩২৪=) ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

৬. "According to a note in the records of a local Pandit, the temple was built by Biseswar Rai, in the reign of Akbar and therefore apparently in the beginning of the 17th Century; this claim to antiquity is supported by its thin bricks and archaic apparence."—*Bengal District Gazetteers*, Hooghly, vol. xxix, p. 262.

৭. বারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'গুপ্তিপাড়া মঠ বিবরণ', '১ম খণ্ড, ১ম সং (১৯৩১), পৃ. ৪।

৮. মাসিক বসুমতী, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৭শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ. ২৮: হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র'-শীর্ষক প্রবন্ধ।

৯. সাপ্তাহিক দেশ; ৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭০, পৃ ১১১২: শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'গুপ্তিপাড়ার মন্দির'-শীর্ষক প্রবন্ধ।

১০. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাঙ্গালার ইতিহাস,' অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল (১৩১৫), পৃ ১৯৬।

১১. বর্ধমান কালেক্টরীর ৫৬২৫৭নং তায়দাদ্।

১২. মাসিক ভারতবর্ষ, ২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ. ৯৪৪: ননীগোপাল মজুমদার কৃত 'গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিত সমাজ'-শীর্ষক প্রবন্ধ। কিন্তু এই ভূমিদানের সালটি লইয়া গোলযোগ আছে। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রায়পুর পরগনা বিশ্বেশ্বর রায়ের অধিকারে ছিল না, বংশবাটী রাজগণের অধিকারে ছিল। ননীগোপাল ভূমিদানের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন দলীলগত প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। রামদাস বংশীয়গণের গৃহেও কোন তায়দাদ নাই। ভূমিদানের ঘটনা সত্য হইতে পারে, কিন্তু সালটি লইয়া গোলমাল।

১৩. বর্ধমান কালেক্টরীর ২৮৮৮৩ নং তায়দাদ্।

"বেদাঙ্ক তিথিশাকেষু তুলাস্থে চণ্ডরোচিষি। অকারি মথুরেশেন শর্মণা কালিকাস্তুতিঃ॥

—শ্রীপতি কবিরত্ন সম্পাদিত 'শ্রীশ্যামাকল্পলতিকা (১৯০৪), পৃ ৪৪, সমাপ্তিবাক্য।

[বেদ=৪ ; অঙ্ক=৯ ; তিথি=১৫ ; 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই নিয়মে ১৫৯৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। 'তুলাস্থে চণ্ডরোচিষি'=সূর্যের তুলারাশিতে অবস্থানকালে অর্থাৎ কার্তিক মাসে।]

১৫. মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃ. ৬৪০-৪১ : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত 'গুপ্তি-পাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র' (আলোচনা)।

১৬. উপরের ৫নং পাদটীকা।

১৭. শ্রীসুধীরকুমার মিত্র : 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ,' ২য় খণ্ড (১ম সং) পৃ ৬৯৯, এই রাঘব রায় বংশবাটী রাজগণের পূর্বপুরুষ।

১৮. সম্মিলনী, সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯১৫ : শ্রীপতি কবিরত্ন কৃত 'মধুসূদনানন্দ আশ্রম' -শীর্ষক প্রবন্ধ।

১৯. শ্রীসুধীরকুমার মিত্র : 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ,' ২য় খণ্ড, (১ম সং), পৃ. ৭০৫ : 'নৃসিংহদেব রায়'-শীর্ষক অনুচ্ছেদ।

২০. সম্মিলনী, ২০ আষাঢ় ১৩২২ : শ্রীপতি কবিরত্ন কৃত 'গোমুখ সরস্বতী'-শীর্ষক প্রবন্ধ।

২১. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৮, পৃ. ১১০ : অভিরাম দাস কৃত 'পাটপর্যটন'।

২২. মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃ. ৬৪০-৪১ : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত 'গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র' (আলোচনা)।

২৩ এই পুঁথিখানি অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার নিকট রক্ষিত ছিল। তাঁহার পুত্রের উক্তি অনুযায়ী দীনেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কলিকাতাস্থ কোন ভদ্রলোক পুঁথিখানি কলিকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে দিবার জন্য লইয়া যান। সেই পর্যন্ত ঐ পুঁথিখানির কোন উদ্দেশ নাই। দীনেশচন্দ্রের জীবদ্দশায় লেখক পুঁথিখানির একটি নকল করিয়াছেন। গুপ্তিপাড়ার ৺রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয় (কাশীপ্রবাসী) তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ পুঁথির একটি নকল করিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন।

২৪. "ইতি শ্রীলশ্রীমহারাজাধিরাজ-চম্পকমহীনাথ নিদেশিত-শ্রীচন্দ্রচূড় ব্রহ্মচারি-রচিত-বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান নাটকানুবন্ধে বিদ্যাপরিণয়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদঃ॥ রামনাথ শর্মণা পুস্তিকালিখনঞ্চ।" —পুঁথির ২১/২ পত্র।

২৫. "আস্তে শ্রীসুরবরসরিত্তীরদেশে সুধন্যা
তত্র শ্রীগোমুখাখ্যো নিবসতি সততং দণ্ডিণামগ্রগণ্যঃ।
তচ্ছাত্রশ্চন্দ্রচূড়স্ত্রিপুরনরপতিঃ শ্রীযুতং চম্পকাখ্যং
দৈবাৎ তস্যৈতৎ টীকাস্তদনুমতিবশাদ্ ব্যরচ ব্রহ্মচারী॥

মহাভূপ কল্যাণ দেবস্য পৌত্রং সুতং সজ্জগন্নাথবীরস্য ধীরম্।
গুরোর্বাসরে মাসি মাঘে চ ধক্ষে শকে সপ্তযুগ্মারিরাত্রীশগণ্যে ॥ কর্মকুলকং ॥"

(পুঁথির ১০৩/১ পত্র)

"ইতি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ চম্পকমহীনাথনিদেশিত-শ্রীচন্দ্রচূড় ব্রহ্মচারিবিরচিতা কালীপক্ষীয়া বিদ্যাসুন্দর কাব্য টীকা সংপূর্ণা ॥০৭॥ শকাব্দাঃ ॥১৬২৭॥" (পুঁথির ১০৩/২ পত্র)

২৬. আধুনিক গবেষকরা 'ত্রিপুরা রাজমালা'কে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন (Vide D. C. Sark r, '*The Sakta Pithas,*' 1948, P. 4.)

২৭ ইহা দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুমান (উপরের ২২নং পাদটীকা)। আমাদের মনে হয় এরূপ ধারণা একান্তই অনুমান। চম্পক রায় যে সমরাভিযানের গণ্ডগোলের মধ্যে চন্দ্রচূড়কে সঙ্গে লইয়া যাইবেন বা সন্ন্যাসী চন্দ্রচূড় যাইতে সম্মত হইতেন। ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আমাদের মনে হয় ব্রহ্মচারীত্বে দীক্ষার পর তীর্থদর্শন বিহিত বলিয়া চন্দ্রচূড় তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ৫২ পীঠের অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরীর পীঠে উপস্থিত হ'ন এবং সেখানেই চম্পক রায়ের সঙ্গে পরিচিত হ'ন।

২৮. উপরের ২৫নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৯. ক। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন-সম্পাদিত 'ধর্মপ্রচারক,' ১৮২৬ শকাব্দ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা।

খ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন: 'ভক্তি ও ভক্ত,' ৮ম সং (১৩৪৩), পৃ. ২৪৮-৫৫; 'ভক্তিমতী বিধবা'-শীর্ষক কাহিনী।

৩০. ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বেশ্বর রায় জীবিত ছিলেন এবং রায়পুর পরগনার অধিকারী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি মন্দির-নির্মাতা এবং বৃন্দাবনচন্দ্রকে ভূমিদানকারী বলিয়া কিংবদন্তীতে জড়িত হইয়াছেন। গুপ্তিপাড়া মঠ লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এযাবৎ বহু মামলা-মোকর্দমা হইয়াছে, কিন্তু কোন কাগজপত্রেই বিবদমান পক্ষের কেহ বিশ্বেশ্বর রায়ের নাম অথবা তৎকর্তৃক মন্দির নির্মাণের বা জমিদারী দানের উল্লেখ করেন নাই; যদিও অনেক কাগজপত্রেই মঠ-প্রতিষ্ঠাতা সত্যদেব সরস্বতীর নামোল্লেখ আছে।

৩১. ২০নং পাদটীকা।

উভয়লিঙ্গ 'নির্বাণ'

('শূন্য'-নির্বাণ বনাম 'ব্রহ্ম'-নির্বাণ)

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বৌদ্ধনির্বাণ ও ব্রহ্মনির্বাণ: নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বৌদ্ধ'নির্বাণ' ও বেদান্তদর্শনের 'ব্রহ্মনির্বাণ' সমার্থব্যঞ্জক। শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা এ-বিষয়ে কিছু অনুশীলন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভাবতেও কষ্ট হয় যে সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত বুদ্ধদেবকে আমরা দশাবতারের মধ্যে স্থান দিয়েও, তাঁর প্রচারিত 'সনাতন'-ধর্মকে ভারত থেকে নির্বাসিত করেছিলাম। 'অহিংসার ধর্মকে আমরা হিংসার দ্বারা বহিষ্কার করেছিলাম। অথচ আচার্য শঙ্করকে আমরা 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ' বলে বরণ করে নিয়েছিলাম, যদিও শঙ্করের মায়াবাদ বা বিবর্তবাদ ভিত্তিক শারীরক ভাষ্যের প্রতিপাদিত নির্বিশেষ ব্রহ্মনির্বাণের সঙ্গে বুদ্ধের শূন্যবাদ ভিত্তিক নির্বাণ মুক্তির কোনো যুক্তিসহ প্রভেদ প্রতিপাদন করা যায় না। গীতার সংজ্ঞায় যা 'ব্রাহ্মীস্থিতি' তারই অপর নাম বৌদ্ধদর্শনের সংজ্ঞায় 'ব্রহ্মবিহার'।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি। (গীতা, ২/৭২)

এই 'ব্রহ্মনির্বাণ', কে লাভ করেন,—তা তার পূর্ব শ্লোকেই বলা হয়েছে

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ (গীতা, ২/৭১)

এই শান্তির পূর্ণতায় ভূমানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়—যাকে গীতা বলেছেন—"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্" (গীতা ৬/২১)। এবং "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" (গীতা, ৬/২২) ঐ অবস্থায় "দুঃখ সংযোগ বিয়োগ" তো হয়ই উপরন্তু "সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শং অত্যন্তং সুখমশ্নুতে"। কিন্তু এই অসমোর্ধ্ব অত্যন্ত সুখকর ব্রহ্মানন্দের সাধনার উপায় বলতে গিয়ে গীতা বলেছেন :—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ (গীতা, ৬/২৫), স্পষ্টতঃ

প্রতীয়মান হয় যে—এই 'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"—ইহা শূন্যধ্যান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই 'শূন্য ও পূর্ণ' উভয়ই এক অনির্বচনীয় অবস্থার দার্শনিক সংজ্ঞা মাত্র যার অর্থে কোনো ভেদ প্রতীতি হয় না, কেবল বলিবার বা বুঝাইবার ভঙ্গীর ভেদমাত্র প্রতীতি হয়। বুদ্ধ শূন্যকে বলেছেন "শূন্যং শূন্যং স্বলক্ষণম্ স্বলক্ষণম্" অর্থাৎ সমস্তই এক শূন্যে পর্যবসিত,— সমস্তই স্বলক্ষণ অর্থাৎ আপন আপন বিশিষ্ট লক্ষণে পরিচিত হয়।

সমস্তই 'ক্ষণিকং ক্ষণিকং—দুঃখং দুঃখং' হলেও দুঃখাতীত অবস্থা একমাত্র শূন্য। বিচার করলে দেখা যায় যে শূন্য, নির্বাণ, মুক্তি ও কৈবল্য একই অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে বৌদ্ধের নির্বাণ এক 'শূন্য' বা অভাব পদার্থ,—বেদান্তের নির্বাণ বা ব্রহ্মনির্বাণ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ভাবপদার্থ। "আনন্দ রূপং অমৃতং যদ্বিভাতি"।

সুষুপ্তিতে 'ন কিঞ্চিদ্ অবেদিষম্' অবস্থায় কেবল 'সুখমহমস্বাপ্সম্' রূপ প্রতীতি মাত্র থাকে,—এই সুষুপ্তিও শূন্যের প্রতীক, কৈবল্যের বা নির্বাণেরও প্রতীক। তখন জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—দর্শন-দৃশ্য-দ্রষ্টা এই ত্রিপুটীর লয় হয়। যা থাকে, সেই স্মৃতি বা প্রতীতি, অনির্বচনীয়। এ-অবস্থায় সদর্থক ও নঞর্থকের ভেদ লোপ পায়। তাই গীতায় বলা হয়েছে,—

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ (গীতা, ১৩/১২)

তাহাকে সৎ (ভাব পদার্থ) বা অসৎ (অভাব পদার্থ) এই দুইয়ের কোনোটির দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তবে তখন সকল ভেদ বিভেদ সূচক সকল বিশেষণ-ই এক বিশেষ্যে একীকৃত হয়—"পয়সামর্ণব ইব" (মহিম্নস্তোত্রম্), গীতা বলেন,—(১৩।৩১) "যদাভূত-পৃথকভাবমেকস্থমনুপশ্যতি। তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥" এই 'একস্থ' হওয়াকে শূন্যত্ব বা পূর্ণত্ব যাহাই বলা হোক তাহা—সেই একমাত্র 'কেবল' অবস্থা বা কৈবল্যকেই বুঝায়। সাংখ্যও এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করেছেন, বলেছেন—"বিশুদ্ধং 'কেবলম্' উৎপদ্যতে জ্ঞানম্"। এ-অবস্থায় নানাত্ব বা বহুত্ব থাকে না। বেদান্তের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয়। তখন,—"নাস্মি, নমে, নাহম্ ইত্যপরিশেষম্ অবিপর্যয়াৎ উৎপদ্যতে বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানম্"—অর্থাৎ অহংতা-অস্মিতা-মমতা দূর হলে অবিদ্যাবিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান 'কেবল জ্ঞান' বা কৈবল্যের উদয় হয়।

যজ্ঞ ও হিংসা: মীমাংসা দর্শনকার জৈমিনি বললেন,—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাম্" অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডই প্রধান আর সব অপ্রধান বা অনর্থক। উত্তর মীমাংসা ও উপনিষদসার গীতা বললেন—যাঁরা "যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে" তাঁরা "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" (৯/২১), পুনরায় জন্মমৃত্যুর গতাগতি চক্রপথে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হন। কিন্তু যজ্ঞবাদীরা এই যজ্ঞের সঙ্গে পশুবধে এমনভাবে মেতে উঠলেন যে সঙ্কৃতির পুত্র রাজা রন্তিদেবের যজ্ঞনিহত পশুদের চর্ম হতে যে রসরক্ত-ক্লেদ নির্গত হত, তা থেকে একটা নদী উৎপন্ন হয়,—যার নাম চর্মণ্বতী (চম্বল)। তাঁর গৃহে এত অতিথি সমাগম হত যে প্রত্যহ বহু সহস্র পশু বধ করতে হত। শাস্ত্রের মধ্যেও লৌকিক প্রভাব পড়ে, তাই বিধান হয়ে গেল—"যজ্ঞে বধঃ = অবধঃ" অর্থাৎ যজ্ঞে যে বধ করা হয় তা হিংসাত্মক বধ নয়,—সেই বলিপ্রদত্ত জীবের আত্মার সদ্গতি হয়।

বুদ্ধের আবির্ভাব কাল : এইভাবে স্বর্গ কামনায় তথা পুণ্য কামনায় যখন তৎকালীন ব্রাহ্মণ পুরোহিত যাজ্ঞিকগণ পশুহিংসার নিষ্ঠুরতায় উন্মত্ত, তখন শাক্য রাজবংশে আবির্ভূত হলেন—শান্ত মুক্ত অনন্তপুণ্য করুণাঘন তথাগত বুদ্ধ, স্বীয় তপস্যায় ধরণীতলকে কলঙ্কমুক্ত করবার জন্য। তাঁর অমৃতবাণীর দ্বারা মানবহৃদয়ের মধুনিষ্যন্দী প্রেমপদ্ম বিকশিত করবার জন্য, -গীতার প্রতিশ্রুতি পালন করতে—ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করতে তিনি অবতীর্ণ হলেন।

বর্ণের গণ্ডিতে বহুধা-বিভক্ত ভারতবর্ষ সেদিন মানবতা বোধে জাগ্রত হয়ে স্বীকার করেছে সকল মানুষকেই। তাই তাঁর বাণী ও ধর্ম অবাধে প্রচার এবং প্রসার লাভ করেছে—তিব্বত চীন, সিংহল, মোঙ্গল, ব্রহ্মদেশ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এমনকি সুদূর জাপান পর্যন্ত।

বিশেষস্থানে স্থণ্ডিলাদি নির্মাণ করে মন্ত্র পড়ে আগুনে ঘি পুড়িয়ে পশু বধ করে নানা বিচিত্র বিধানে যখন মানুষ উর্দ্ধগতি সন্ধান করছিল—দিশেহারা হয়ে,—তখনই বুদ্ধ এলেন তাঁর—বিশ্বমৈত্রী, অহিংসা, নিঃস্বার্থ প্রেম ও তৃষ্ণা (বা 'তহ্না') ক্ষয় দ্বারা মুক্তির উপায় প্রদর্শন করতে।

বুদ্ধের উপদেশ : তিনি শীলসাধনা ও মৈত্রী ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মবিহারের পথ নির্দেশ করে খাঁচার পাখিকে মুক্তাকাশে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। 'মাতা যথা নিজং পুত্তং' মা যেমন নিজের পুত্রকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করেন তেমনি অপরিমেয় মৈত্রী ও করুণা সমস্ত জগতের প্রতি, এমন কি শত্রুদের প্রতিও -আপন অন্তরে জন্মাইতে এবং তাহাই আমাদের নিত্যকার ব্যবহারে প্রয়োগ করতে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

ধ্যানপঞ্চক : তিনি পাঁচ প্রকার ধ্যান উপদেশ করেছেন :

১। বিবেক বিচারের ধ্যান দ্বারা অপ্রমত্ত চিত্তে আপনাকে সকল আপাতমনোরম ক্ষণিক বিষয়সুখের 'তহ্না' বা তৃষ্ণা থেকে মুক্ত করা এবং 'আত্মৌপম্যেন'—নিজের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবকে সাম্যদৃষ্টিতে দর্শন করা (গীতা ৬/৩২)।

(ধম্মপদ অপ্পমাদ বগ্গো ৭)

২। করুণার ধ্যান—'আর্তিং প্রপদ্যেঽখিল দুঃখভাজাম্,' অখিল জনের দুঃখের অংশ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করা ও তাদের দুঃখলাঘবের জন্য চেষ্টা করা।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯/২১/১২)

৩। প্রেমের ধ্যান—সকলের প্রতি মৈত্রী ও প্রীতিবশতঃ,—ব্রাহ্মণ তর্পণের মত,—'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু'—ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হোক্, এইরূপ ভাব জন্মানো।

৪। শান্তির ধ্যান,—সকল দ্বন্দ্ব ভালোমন্দ সুখ দুঃখ, নিন্দাস্তুতি জয়-পরাজয় থেকে আপনাকে 'স্থিতঃ প্রকৃত্যা হিমবানিবাচলঃ—অচলপ্রতিষ্ঠ করে মনকে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত শান্ত স্থির রাখা। "আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং—(গীতা ২/৭০) অবস্থা।

৫। আনন্দ ধ্যান—সকলের সুখে সুখী হয়ে নিঃস্বার্থ নিরাসক্তভাবে পরার্থপরতার উচ্চতর আনন্দ অনুভব করা।

ধম্মপদে বুদ্ধ বলেছেন,—

নত্থি রাগ সমো অগ্‌গি নত্থি দোষ সমো গহো
নত্থি মোহসমং জালং নত্থি তহ্না সমা নদী।

অর্থাৎ আসক্তির সমান অগ্নি নাই, দ্বেষের মত হিংস্র গ্রাসকারী জন্তু নাই,—মোহের মত জাল নাই, তৃষ্ণার সমান দুস্তর নদী নাই,—তৃষ্ণা হতেই শোক-ভয়,—আসক্তির উন্মূলনই দুঃখত্রাণের চাবিকাঠি (গীতা, ৩/৩৭)।

মানব মনীষার শ্রেষ্ঠ অবদান প্রজ্ঞা। শুধু তথ্য বা তত্ত্বজ্ঞান নয় সারাজীবনের সর্বাঙ্গীণ সংযম ইহার সাধনা এবং সদ্ধর্মের আচরণ,—যথা দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য ও ধ্যান ইহার লাভের উপায়। (গীতা-৪/৩৩-৪২)।

এই মহামানবের সমগ্র জীবনে,—মহাভিনিষ্ক্রমণ থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত,—একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—মানবের দুঃখত্রয় উপশমের জন্য নির্বাণলাভের উপায় নির্দেশ করা। তাঁর সংকল্প ছিল,—

'আমি যেন,—অনাথগণের নাথ,—যাত্রিগণের পথপ্রদর্শক, পারগামিগণের নৌকা, তরণেচ্ছুগণের সেতু, দীপার্থিগণের দীপ, শয্যার্থিগণের শয্যা এবং দাসার্থিগণের দাস হই'। ('বরেণ্য চরিত'—পৃঃ ১৮ শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত)।

ধম্মপদে বুদ্ধ বলেছেন—পঞ্চস্কন্ধের মত পাপ নাই,—বিশ্বাসই পরম আত্মীয় এবং 'নিব্বাণং পরমং সুখম্' (ধম্মপদ, সুখবগ্‌গো ২০৩, ২০৪ সূত্ত)।

'পঞ্চস্কন্ধ' পারিভাষিক শব্দ—তার অর্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে· রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধের সংস্কার বন্ধন মুক্ত হয়ে, এবং ধর্ম প্রীতি রস পান করেই 'নির্বাণ' সুখ পাওয়া যায় ('ধম্ম প্পীতি রসং পিবং') এই সুখকে তিনি বলেছেন 'অমতোগধং —অমৃতাবগাধং বা গাঢ় অমৃত।

ধম্মপদ, বুদ্ধ বগ্‌গো ১৯০-১৯২ সূত্তে, বলা হয়েছে,—যদি কেহ বুদ্ধ, ধর্ম, এবং সঙ্ঘের শরণ লয়,—এবং চারিটি আর্যসত্য (যথা ; দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের অতিক্রম, ও দুঃখোপশমের অষ্টাঙ্গ মার্গ)-কে সম্যক্ জ্ঞানের সহিত দেখে তবে ইহাই নিরাপদ আশ্রয়,—ইহাই উত্তম আশ্রয়,—ইহা অবলম্বন করিলে সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ('ধম্মপদ'—ভিক্ষু শীলভদ্র, চতুর্থ সংস্করণ, ১২১ পৃঃ)।

অট্‌ঠাঙ্গিকং মগ্‌গং বা অষ্টাঙ্গ মার্গ যথা,—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত বা ব্যবসায়,—সম্যক্ আজীব বা উত্তম জীবিকা,—সম্যক্ ব্যায়াম বা উত্তম চেষ্টা, —সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি—অর্থাৎ ধ্যান এই আটটিকে অষ্টাঙ্গ মার্গ বলা হয়।

ব্রাহ্মণ বগ্‌গে—(ধম্মপদ ৪১১ সূত্ত),—'অম তো গধং (=অমৃতাবগাধং গাঢ়ামৃতং

অর্হৎপদমিত্যর্থঃ) যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন,—যিনি তৃষ্ণা জয় করেছেন ও সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা সংশয় ছেদন করে অমৃত পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি। তাঁহার কৃত ব্রাহ্মণের এই সংজ্ঞা আজও সর্ববাদিসম্মত সন্দেহ নাই। তিনি 'জাতি ব্রাহ্মণ' বা জন্মগত ব্রাহ্মণকে—বলেছেন ভো-বাদী—অর্থাৎ হে মহাশয় 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কথনশীল। (ধর্মপদ ৪১৯ সূত্রে) তিনি অকিঞ্চন, অনাদান, ধ্যানসমাধিরত, অবিদ্যাতীত, শীলবান্, তৃষ্ণাহীন, ভয়শূন্য, পাপমুক্ত, শান্ত, প্রসন্ন, চতুরার্যসত্যে প্রতিষ্ঠিত গম্ভীরব্রত মারজিৎ মহর্ষিকে সুগতবুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ বলেছেন,—'তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং'।

বুদ্ধের একটি শ্রেষ্ঠ উপদেশ জীবসেবা,—এবং আধ্যাত্মিক স্তরে ব্রহ্মবিহার-এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেই প্রসঙ্গে স্মরণীয় গীতা-র ৬অ/২৯, ৩১, ও ৩২ শ্লোকগুলি,—'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি,—ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।' 'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ, সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে। 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন,—সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।' তুলনা করলে দেখা যাবে বুদ্ধের 'ব্রহ্ম বিহার' গীতার উপরি-উক্ত শ্লোকগুলি এবং ঈশোপনিষদের ৬-এবং ৭ শ্লোক,—একই সত্যের, একই তত্ত্বের জ্ঞাপক,—কেবল ভাষার পরিচ্ছদে বিভিন্নরূপে প্রকাশ মাত্র।

এই উপলব্ধি না থাকলে বুদ্ধের জীবসেবা,—বর্তমান যন্ত্রযুগের একটা প্রাণহীন চাকা ঘোরানো প্রথা মাত্রে পর্যবসিত হ'ত।

আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতির উপদেশ বুদ্ধের বাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট উল্লেখ বা প্রাধান্য পায়নি কিন্তু তাই বলে আত্মা বা ব্রহ্মের স্বীকৃতি নাই একথা সমীচীন বলে মনে হয় না। না হলে ধম্মপদে তাঁর 'ব্রাহ্মণ বগ্‌গ'-র নাম এবং তত্ত্বকথাগুলি ভিত্তিহীন হয়ে পড়ত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের পারিভাষিক সংজ্ঞার ভিন্নতা নিবন্ধন ভ্রান্তি বা ভেদ জ্ঞানের সৃষ্টি হয়।

আত্মা ও অনাত্মা :—বেদান্ত যে অর্থে 'আত্মা' শব্দ ব্যবহার করেন বৌদ্ধদর্শন সে অর্থে করেন না। মিলিন্দ-পঞ্‌হের নাগসেন-মিলিন্দার কথোপকথনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিলিন্দা প্রশ্ন করলেন, (নাগসেনকে)—"নাগসেন কে" ? নাগসেন উত্তর দিলেন,—"শরীর, চিত্তাদির সমষ্টিই নাগসেন"। বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত পুদ্গলাত্মক-দেহাভিমানী জীবকে আত্মা বলেন। বেদান্ত তাহাকে অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ সমন্বিত অবিদ্যোপহিত জীবাত্মা বলেন। রক্ত মাংসের দেহ (পুদ্গল)-রূপ পুত্তলিকায় আত্মবোধ বা আত্মাভিমান-অবিদ্যার সৃষ্টি। বেদান্তের আত্মা শুদ্ধবুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ 'অণুব্রহ্ম'—বা ব্রহ্মের চিৎকণ বা স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ, গীতার "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫/৭) তাই মুক্তাত্মা বলেন "অহংদেবো ন চান্যোঽস্মি, ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্"।

বৌদ্ধেরা বলেন 'তৃষ্ণা' বা 'তহ্না' ক্ষয় হলে তবে 'নির্বাণ' হয়,—গীতাও তাই বলেন—নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ (৬/১৮) 'শান্তিং নির্বাণপরমাং' (৬/১৫) লাভ করেন (৫/২৪-২৫-২৬)—যাঁরা অন্তঃসুখ, অন্তরারাম, কাম ক্রোধ বিযুক্ত এবং সর্বভূতহিতে রত হ'য়ে, শান্তি পাবার এই পথে, এই ব্রাহ্মীস্থিতি ও ব্রহ্মবিহার যদি অন্তিমকালেও লাভ করেন তাহলে তাঁদের ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তি হয় (গীতা ২/৭২)।

সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে গীতার ব্রহ্মনির্বাণ, সাংখ্যের কৈবল্য এবং বৌদ্ধের নির্বাণ একই জীবন্মুক্ত অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। বাচক বিভিন্ন হলেও বাচ্যার্থ এক এবং অভিন্ন।

বৌদ্ধেরা যাঁকে পঞ্চস্কন্ধের অতীত অনাত্মবোধ,—নির্বাণ বা অসঙ্খত ধাতুরূপ অনন্ত অনুৎপন্ন অসীম অগাধ অনিমিত্ত অপ্রণিহিত অমৃতময় শূন্য, বলেন,—তাহাই বেদান্তের ও 'ব্রহ্ম-নির্বাণ, 'সর্বভূত হিতেরত' আনন্দময় প্রসন্নাত্মার অবস্থা।

মাণ্ডুক্য শ্রুতি তাকেই বলেছেন,—"অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চো-পশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ"। ইহার ইঙ্গিত আরও পাওয়া যায়—

অন্তঃ শূন্যো বহিঃ শূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে
অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবাম্ভসি। (বরাহ পুরাণ ৪/১৮)

উত্তর গীতা (মহাভারত)য় বলা হয়েছে,—

সর্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।
ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ (১৩)

সত্ত্বরজস্তমোবর্জিত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মই 'ত্রিশূন্যং'।

ঊর্ধ্বশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকম্
সর্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥ (ঐ ৩৩)
শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (ঐ ৩৪)

তাই আমি শূন্যবাদ সম্বন্ধে 'তথাগত বোধিসত্ত্ব' কবিতায় বলেছি,—

"*শূন্যবাদ নহে শূন্য,*—অগাধ অমৃত করি পান
প্রেম-মৈত্রী-করুণায় তথাগত মহামহীয়ান্,—
অনির্বচনীয় তত্ত্ব, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা-জ্ঞান-একাকারে
মিলাইলে সে-অতলে কি রহিল কে বলিতে পারে?"

তাঁর উপদেশের সারমর্ম আমি সংক্ষেপে বলেছি,—

"প্রেমমূর্তি তুমি তপোধন!
ক্ষমা ক্ষেম সাধনায় পরিপূর্ণ করিলে ভুবন।

মন্ত্রে তন্ত্রে যাগযজ্ঞে পশুরক্তে মুক্তি নাহি হয়
'আত্মদীপ' হও সবে সুখতৃষ্ণা 'তহ্না' কর ক্ষয়
এই মহামন্ত্র তব,—বাসনার নির্বাণে 'নিব্বান্'
উন্মুক্ত আকাশে মুক্তি মুক্তপক্ষ পক্ষীর সমান।"

শূন্য ধ্যানের কথা উল্লেখ করেছি। শূন্য' যোগীরও পরম ধ্যেয় পদার্থ। শূন্য প্রত্যক্ষ হলে 'ত্রিপুটী'র নাশ হয়,—যুষ্মদ-অস্মদ্ প্রত্যয় তিরোহিত হয়, অস্তি-নাস্তি বলিবার কেহ থাকে না,—এখানে অস্তি নাস্তির সমন্বয়। "নসৎ তন্নাসদুচ্যতে' (গীতা, ১৩।১২) ভাব ও অভাবেরও সমন্বয়। বুদ্ধদেব শূন্যের বর্ণনা করতে অক্ষম হয়ে বলেছেন, "অনক্ষরস্য ধর্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা"? শ্রুতিও তাই বলেছেন,—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। বৌদ্ধদর্শনে এই পদার্থটিকে—'অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত ও অবিজ্ঞপ্তিক" বলা হয়েছে। (ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, 'ধম্মপদ, ভিক্ষুশীলভদ্রের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়)।

বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্য সুভূতিকে বলেছেন এই শূন্যতা 'গম্ভীর',—অক্ষয়, 'অপ্রমেয়', 'অগাধ'। বৌদ্ধাচার্য শান্তিদেব বলেছেন 'শূন্যতা'-দুঃখ-শমনী ততঃ কিং জায়তে ভয়ম্?"

বুদ্ধদেব বলেছেন—সুভূতিকে,—

"গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্",
"শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদপ্রমেয়মিতি"।
"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপি তে"।

এবং, শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য, পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্॥

অর্থাৎ—"আধ্যাত্মিক জগৎ শূন্য বলিয়া দেখ, বাহ্য জগৎ শূন্য বলিয়া দেখ, যিনি শূন্যতা ভাবনা করিবেন তিনি নিজেকেও শূন্য বলিয়া ভাবিবেন। শূন্যবাদ 'শুদ্ধ' এবং 'কেবল',—কিন্তু ইহা 'শুষ্ক' নয়,ইহা যোগী এবং দার্শনিকের শিরোরত্ন মানব চিন্তার আকাশবৎ সর্বোচ্চ এবং সর্বব্যাপী বিশ্রাম স্থান। তবে শাণ্ডিল্য নারদ আদি ভক্ত্যাচার্যগণ এর চেয়েও উচ্চতর স্থান দেন ভক্তিলভ্য আনন্দের পঞ্চম পুরুষার্থকে, কিন্তু তার প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

নির্বাণের স্বরূপ:—এই নির্বাণ বা শূন্য, ফাঁকা বা vacuum পদার্থ নয়, তাও মিলিন্দা পঞ্হ ও ধম্মপদে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে 'একান্ত সুখং' 'পরম সুখং' 'অমৃতাবগাধম্' বা একান্ত অগাধ গভীর আনন্দময় অবস্থা বলা হয়েছে।

সুতরাং মায়িক বা প্রাকৃত গুণের যে ঔপাধিক শূন্যতা তাই আবার অপরদিকে

অপ্রাকৃত অলৌকিক অনির্বচনীয় পরম সুখ বা আনন্দের পরিপূর্ণতা, অর্থাৎ একই অবস্থা একদিকে শূন্য, অপরদিকে পূর্ণ শব্দের বাচ্য। কবি টেনিসনের ভাষায় :

Rain—Rain and Sun a rainbow on the lea
Truth is this to me and that to thee.

একই প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে কেউ দেখছেন রামধনু ইন্দ্রধনুরূপে আর কেউ বা বিজ্ঞানের চোখে জলীয় বাষ্পের পুঞ্জে শুভ্র আলোকের প্রতিসরণের ফলে—তাকে সপ্তবর্ণের বর্ণালীরূপে দেখছেন।

স্বয়ং বুদ্ধ সুভূতিকে বলেছেন যে যাহা শূন্য তাহাই অক্ষয়, অপরিমেয়,—অগাধ, 'অসঙ্‌খ্যেয়' অসীম। শ্রুতি বলেছেন "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" অস্থূলং অনণু অহ্রস্বং, অদীর্ঘং ইত্যাদি।

আকাশতত্ত্ব : এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয় বেদান্তের আকাশতত্ত্ব। আকাশকে আমরা শূন্যও বলি অনন্তও বলি। তাই আকাশ ব্রহ্মেরও পর্যায় বিশেষ। 'পরমং ব্যোমন্'—বলেছেন শ্রুতি। ভগবান বুদ্ধও বলেছেন—অপ্রমেয়মিতি বা অসঙ্খ্যেয়মিতি বা, অক্ষয়মিতি বা, শূন্যমিতি বা……অভাব ইতি বা বিরাগ ইতি বা নিরোধ ইতি বা নির্বাণমিতি বা। সুতরাং এই সমস্ত বচন একই বস্তু বা অবস্তুকে, একই ভাব বা অভাব পদার্থকে একই বাচ্য বা অবাচ্য তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চাইছে। এই শূন্যকে অমিতা বা অসীম, পনীতা বা সর্বোত্তম, লোকুত্তরা বা লোকোত্তর বা অলৌকিক প্রভৃতি বিশেষণেও বিশিষ্ট করা হয়েছে।

সাধনোপায় : এই অবস্থা প্রাপ্তির সাধনোপায়ও বিজ্ঞানসম্মত। চিকিৎসা বিজ্ঞান যেরূপ চতুর্ব্যূহ ইহার সাধনাও সেইরূপ। যথা :—রোগের নিদান বা হেতুভূত উপাদান, রোগ বিজ্ঞান বা রোগের স্বরূপ, রোগের প্রতিকার বা চিকিৎসা এবং তার পরে আরোগ্য বা অনাময় অবস্থা লাভ।

অপরপক্ষে দুঃখের হেতু, দুঃখের স্বরূপ জ্ঞান, দুঃখনিবৃত্তির উপায় এবং সর্বশেষে কৈবল্য (সাংখ্যে) নির্বাণ বা শূন্যাবস্থা (বৌদ্ধ দর্শনে) অথবা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ (বেদান্ত দর্শনে) নামে ইহাই বর্ণিত হয়েছে বিবিধ দর্শনে।

শূন্যধ্যান : অনির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য এবং "অচিন্ত্যাক্ষরব্যাপকাব্যক্ত-তত্ত্ব"-রূপে। জ্ঞান সংকলনী তন্ত্রে এই শূন্য ধ্যানকেই প্রকৃত ধ্যান বলা হয়েছে : –

"ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ"—অর্থাৎ সাকার সগুণ চিন্তা প্রকৃত ধ্যান নয়, "ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ"—মনের সংকল্প শূন্য অবস্থাই প্রকৃত ধ্যান।

প্রাণতোষিণী তন্ত্রেও তাই বলা হয়েছে :

শূন্যন্তু সচ্চিদানন্দং নিঃশব্দং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।

চিত্ত যখন বিষয়সংস্কারহীন ও সর্বপ্রকার বিশেষবিহীন হয়ে শূন্যাকার ধারণ করে,—তখন সেই নিঃশব্দ নির্বিশেষ জ্ঞানের অবস্থারই নাম সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

যোগবাশিষ্ঠ বলেছেন,—

সংবিন্মাত্রস্য শুদ্ধস্য শূন্যস্য চ কিমন্তরম্।

যচ্চান্তরং তদ্বিবুধা বিদন্ত্যেতি ন বাগ্‌গতিম্ ॥

শুদ্ধ চৈতন্যে ও শূন্যে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বিষয় না থাকায় যাহাকে শূন্য বলা হয়) কোনো পার্থক্য যদি থাকে তো তা সাধকের অনুভূতিসাপেক্ষ, বাক্যের দ্বারা তা বর্ণনা করা যায় না।

শূন্য ও পূর্ণ: বরাহ পুরাণ (৪/১৮) দৃষ্টান্ত দিয়ে সমন্বয় করেন যে এই শূন্য ও পূর্ণ একই:—"অন্তঃ শূন্যো * * ইবার্ণবে।" পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

সাধকের নির্বিকল্প অদ্বৈত তত্ত্বে অবস্থানের সময় তাঁর আকাশস্থ কুম্ভের মত তাঁর ভিতর বাহির দুই-ই শূন্য এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত কুম্ভের মত তাঁর ভিতর বাহির দুই-ই পূর্ণ। অর্থাৎ তিনি যুগপৎ শূন্য এবং পূর্ণ। 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'র সঙ্গে ইহা তুলনীয়।

ভাষার হেঁয়ালি বা Jugglery of words:

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন, সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনা দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ, অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধন', দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে যুক্ত হয়, তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র। কিন্তু সেই-ই মুক্তি।"

"প্রত্যহ শীলসাধনা দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন, এবং মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন স্মরণ করো * * যে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে * * এই পদ্ধতিকে তো কোনো ক্রমেই শূন্যতা লাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিল লাভের পদ্ধতি, এই তো আত্ম-লাভের পদ্ধতি, পরমাত্ম লাভের পদ্ধতি।"

"এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার এই সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি * * এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।" (রবীন্দ্রনাথ)

'নির্বাণ'কে পাওয়া যায়না: বৌদ্ধদর্শন বলেন, কোনো লব্ধ বস্তুর মত নির্বাণকে পাওয়া যায় না। ছায়া কোনো বস্তু বিশেষ নহে,—অন্ধকার না থাকলে আলো অব্যক্ত, মুক্তিও অব্যক্ত, নির্বাণও অব্যক্ত।

নির্বাণং নির্বৃতি বৃত্তং নির্বাণঞ্চ ন লভ্যতে

অপ্রবৃত্তেষু ধর্মেষু যথা পশ্চাৎ তথা পুরা।

মুক্তি বা নির্বাণের স্বভাবই এই যে ইহা প্রাপ্তি নয়, নিবৃত্তি বা আবরণ উন্মোচন এবং তার ফলে শান্তি। তার কোন বৃত্তি নাই,—নিমিত্ত নাই। যাহা অপ্রবৃত্ত স্বভাব তাকে পাওয়া বা তার সামীপ্য লাভ কিরূপে সম্ভব? স্বরূপতঃ তা নিবৃত্তি মাত্র,—তার পূর্ব পশ্চাৎ আদি কোন সম্বন্ধ নাই,—তা স্ব-স্বরূপে অব্যক্ত।

নির্বাণ, সদর্থক ও নঞর্থক :

নির্বাণের দুটি দিক আছে। একটি প্রজ্বলিত অগ্নি বা প্রদীপ নির্বাণের মত (নঞর্থক) তৃষ্ণা-মোহের বন্ধন 'ক্ষয়' ও 'দুঃখ' ত্রয়ের পরিসমাপ্তি এবং তখন কৃতকর্মের 'বীজ' ভর্জিত (ভাজা) বা ক্বথিত (সিদ্ধ) হওয়ায় তা আর ফলপ্রদ হয় না। পুনর্জন্মও হয় না।

ইহা জড়ভরতের মত নিষ্ক্রিয় জীবন মাত্র বুঝায় না। বুদ্ধ আনুমানিক ৩৫ বৎসর বয়সে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েও দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল নিরলস ভাবে কর্মময় নিষ্কাম নিরাসক্ত জীবন যাপন করে গেছেন।

'সদর্থক' দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নির্বাণকে পরিপূর্ণ কল্যাণ, মঙ্গল ও শান্তিপূর্ণ আনন্দময় অবস্থা বলা যায়।

মূল পালি সাহিত্যে তথাগত বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নির্বাণ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এইরূপ,— 'ভবনিরোধো নির্ব্বাণং (জন্মান্তর নিবৃত্তি),—সব্ব গন্থপ্পমোচনং (সকল গ্রন্থি বা বন্ধন থেকে মুক্তি) তণহা বিপ্পহানেন নিব্বানং (তৃষ্ণা বা বাসনার বিনাশেই মুক্তি) রাগক্খয়ো দোষক্খয়ো মোহক্খয়ো নির্ব্বানং—এবং পঞ্চস্কন্ধের নিরোধই নির্বাণ ('ভারত কোষ' ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬-৭)। এগুলি সব নঞর্থক বা অভাব বাচক।

সদর্থক বা ভাব বাচক,—'অমতোগধং' (ধম্মপদ ১০০ সূত্র) বা পরম সুখময় অগাধ অমৃতময় অবস্থাও বলা হয়েছে।

ওলডেনবার্গ, টমাস,-ওয়ালড্স্ মিড্ট্ ম্যাক্স্মূলর প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক গণও 'নির্বাণ'কে একান্ত নঞর্থক বা 'annihilation' বলেন নি,—উভয়াত্মক নির্বাণকেই স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে "মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম" বলেছেন এবং অধিকাংশ মনস্বী দার্শনিক যা সমর্থন করেছেন বুদ্ধের সেই 'নির্বাণ' যে উভয়লিঙ্গ বা উভয়াত্মক সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

শরৎচন্দ্র ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

শ্রীমদনমোহন কুমার

পঁচিশে বৈশাখের ন্যায় একত্রিশে ভাদ্র বাঙ্গালী জাতির জীবন-পঞ্জিকায় একটি পরম পুণ্যাহ। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬) শুক্রবার হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে দেবানন্দপুর দুই শতাব্দী পূর্বে সাহিত্যসাধনার তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিচিত। রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রথম জীবনের কাব্যসাধনা এই গ্রামেই শুরু করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম কবিখ্যাতি এই গ্রামেই তিনি লাভ করেন।

শরৎচন্দ্রের জন্মতারিখ সুপরিচিত হইলেও তাঁহার জন্মসময়টি এতদিন অজ্ঞাত ছিল। শরৎচন্দ্রের জন্মমুহূর্ত, রাশি, নক্ষত্র ইত্যাদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সম্প্রতি সংগৃহীত শরৎচন্দ্রের জন্মপত্রিকায় পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, সিংহ রাশিতে, মীন লগ্নে, অশ্লেষা নক্ষত্রে, সূর্যাস্তের ৩ দণ্ড ৩২ পল সময়ের পর শরৎচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র সূর্যাস্ত হয় ৬টা ৬ মিনিটে। সূর্যাস্তের ৩ দণ্ড ৩২ পল অর্থাৎ ১ (এক) ঘণ্টা ২৪ (চব্বিশ) মিনিট ২৪ (চব্বিশ) সেকেণ্ড পরে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড শরৎচন্দ্রের জন্মক্ষণ।

শরৎ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি, মূল চিঠিপত্র, আলোকচিত্র, ব্যবহৃত সামগ্রী ইত্যাদি অনুসন্ধান কালে শরৎচন্দ্রের জন্মপত্রিকাটি পরম সৌভাগ্যক্রমে খুঁজিয়া পাই। শরৎচন্দ্রের এই কীটদষ্ট জীর্ণ জন্মপত্রিকাখানি শরৎশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পরিষদের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই উপলক্ষে ৩১শে ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে পরিষৎ-প্রকাশিত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়াছে। পরিষৎ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ও পরিষৎ কর্তৃক 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের এই জন্মপত্রিকার আলোকচিত্র পরদিন ১লা আশ্বিন ১৩৮৩ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত 'বাতায়ন' পত্রিকার 'শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা'য় (পুনর্মুদ্রিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২৭শে ফাল্গুন ১৩৪৪, ১১ই মার্চ ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ৪১-৪২) "শরৎচন্দ্রের রাশিচক্রবিচার" নামে একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের একটি রাশিচক্র প্রকাশ ও আলোচনা করেন। ৩২ বৎসর পরে ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র-বিষয়ক একখানি গ্রন্থে

জনৈক গ্রন্থকার 'বাতায়ন' পত্রিকার ঐ প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ করিয়াছেন। অবশ্য 'বাতায়ন' পত্রিকার উল্লেখ তিনি করেন নাই। পরিষৎ সংগৃহীত শরৎচন্দ্রের জন্মপত্রিকার রাশিচক্রের সহিত 'বাতায়ন' পত্রিকায় মুদ্রিত রাশিচক্রের কিছু গরমিল আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, শরৎচন্দ্র একদা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার মলাটের একটি পৃষ্ঠায় তাঁহার স্মৃতি হইতে একটি রাশিচক্র আঁকিয়া তাহার নীচে লিখিয়াছিলেন : জন্ম ৩১ ভাদ্র ১২৮৩

মৃত্যু

ভবানীপুরে উমাপ্রসাদ বাবুদের বাড়িতে উমাপ্রসাদের সহপাঠী নির্মলবাবু একদিন শরৎচন্দ্রের হাত দেখিয়াছিলেন। উমাপ্রসাদকে লিখিত শরৎচন্দ্রের একখানি পত্রে তাহার উল্লেখ আছে।* ভবানীপুরে উমাপ্রসাদবাবুদের বাড়িতে একদিন শরৎচন্দ্র 'বঙ্গবাণী'র মলাটের পাতায় নিজের স্মৃতি হইতে ঐ রাশিচক্রটি অঙ্কন করিয়াছিলেন। 'বঙ্গবাণী'র ঐ বাঁধানো খণ্ডটি শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে। বঙ্গবাণীর মলাটে শরৎচন্দ্রের ঐ রাশিচক্রের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত শরৎচন্দ্রের জন্মপত্রিকার রাশিচক্রের সামান্য গরমিল আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সংগৃহীত শরৎচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত কয়েক শত পত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের লিখিত পত্রাদিতে অনেক সময়ে বাংলা ও ইংরেজী তারিখের গরমিল হইত। অন্যমনস্কতা বা অসতর্কতার জন্য তাঁহার চিঠিপত্রে কিছু কিছু ভুল থাকিত। পরিষদে সংগৃহীত শরৎচন্দ্রের মূল চিঠিপত্র ও সেগুলির আলোকচিত্রে তাহার সাক্ষ্য আছে। পত্রিকার মলাটের পৃষ্ঠায় কলিকাতায় ভবানীপুরে বসিয়া স্মৃতি হইতে রাশিচক্র আঁকিতে গিয়া—সম্ভবত নিজের জন্মপত্রিকা হইতে নকল না করিয়া—এই গরমিল ঘটা কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়। নিজের রাশি লগ্ন ইত্যাদি স্মরণে থাকিলেও সম্পূর্ণ রাশিচক্র স্মরণ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। যাহা হউক, শরৎচন্দ্রের জন্মপত্রিকাটি বঙ্গের অন্যান্য মনীষীদের -দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখের—জন্মপত্রিকার সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় (Museum-এ) শরৎজন্মশতবার্ষিকীতে সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়া পরিষদের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিল।

পরিষদের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শরৎচন্দ্রের জন্মপত্রিকাটি বহু দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কয়েকজন কৌতূহলী দর্শক শ্রম স্বীকার করিয়া প্রদর্শনী-কক্ষে সমগ্র জন্মপত্রিকাটি নকল করিয়া লন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যচিত্রে পরিষৎ-প্রদর্শনীর চিত্রাদির সহিত এই জন্মপত্রিকাটিও প্রদর্শিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই

---

* 'শরৎচন্দ্র'—শ্রীমদনমোহন কুমার সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৩) পৃ. ১০৫

কিন্তু দর্শকগণের কৌতূহল দেখিয়া শরৎচন্দ্রের জন্মপত্রিকাখানি একজন বিশিষ্ট জ্যোতিষীকে বিচারের জন্য অনুরোধ করি, তাঁহার বিচার নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"এই রাশিচক্র অনুযায়ী লগ্ন মীন, রাশি সিংহ। পঞ্চমে কর্কটে শুক্র, ষষ্ঠে সিংহে মঙ্গল, সপ্তমে বুধের ক্ষেত্রে রবি ও বুধ, বৃশ্চিকে লগ্নপতি বৃহস্পতি। দ্বাদশে কুম্ভে শনির স্বক্ষেত্রে শনি ও রাহু

বৃহস্পতির শুভাবস্থানে এবং বুধ তুঙ্গী হওয়ায় বিদ্যা, সৌভাগ্য ও ধর্মে আন্তরিক নিষ্ঠালাভ হইয়াছে। বৃহস্পতি কর্মাধিপতি, অর্থ ও ভাগ্যস্থানের অধিপতি মঙ্গল কর্তৃক আবার আয় ও ব্যয়স্থানের অধিপতি শনি কর্তৃক দৃষ্ট। পুত্রহীনতা সূচিত হইলেও নানা বাধার মধ্যেও বিদ্যাচর্চায় সম্মান ও স্বীকৃতি পাইয়াছেন।

মারক শুক্র পঞ্চমে কলঙ্ক ও অপবাদ ভোগ করাইলেও স্বচ্ছন্দ দাম্পত্যসুখ পাইয়াছেন।

দ্বাদশস্থ শনি ও রাহু তাঁহাকে নিরাসক্ত ও নিঃস্বার্থ করিয়াছে। পরের জন্য মমতা সুবিদিত।

অষ্টমাধিপতি মঙ্গল অস্ত্রাঘাতে—এ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের ফলে মৃত্যু ঘটাইয়াছে।"

শরৎচন্দ্রের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কেবল মূল পরিষৎ নহে, কলিকাতার বাহিরে অবস্থিত বিভিন্ন শাখা-পরিষদের সহিতও শরৎচন্দ্রের যোগ ছিল, বিভিন্ন শাখা-পরিষদের আহ্বানে শরৎচন্দ্র শাখা-পরিষদের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগ দিয়াছেন।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, বরিশাল-শাখা শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সভায় শরৎচন্দ্র 'ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পর বৎসর ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ১০ই আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনের উৎসব-সভায় শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে শরৎচন্দ্র 'সাহিত্য ও নীতি' নামে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন, ভাষণের প্রথমে কৃষ্ণনগরের সহিত শরৎচন্দ্রের বাল্যকাল হইতে সুমধুর পরিচয়ের স্মৃতি উল্লেখ করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমার রায় এই সভায় সঙ্গীত ও আবৃত্তি করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নথিপত্রে ১৩৩১ বঙ্গাব্দে পরিষদের বিভিন্ন শাখার কার্য্য-বিবরণ প্রসঙ্গে নদীয়া শাখার নিম্ন উদ্ধৃত কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :

"নদীয়া শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি. এ., এম. বি.

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি. এল.

সদস্য সংখ্যা -৩০, অধিবেশন-সংখ্যা —৪, তন্মধ্যে দুইটি অধিবেশনে এই প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়, —

১। সাহিত্যে বিষাদের সুর — শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ.।

২। লোহারাম শিরোরত্ন ও তাঁহার রচিত মালতী-মাধব নাটকের গদ্যানুবাদ—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি. এ., এম. বি.।

অপর দুইটি অধিবেশনে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত একটি উৎসবসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিরূপে 'সাহিত্য ও নীতি' সম্বন্ধে এক অভিভাষণ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় এবং ছাত্রগণ সঙ্গীত ও আবৃত্তি করেন।

শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি. এল. মহাশয় মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখাগুলির অন্যতম প্রতিনিধি সভ্য ছিলেন।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নদীয়া-শাখার সম্পাদক ও মূল পরিষদের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য (শাখা-পরিষৎ-প্রতিনিধি) ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বৈবাহিক ছিলেন—ললিতকুমারের কন্যার সহিত আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উৎসব সভা উপলক্ষে শরৎচন্দ্র ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে উঠিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র-লিখিত সভাপতির ভাষণের মূল পাণ্ডুলিপি এবং উহার সম্পূর্ণ আলোকচিত্র শরৎশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শরৎশতবর্ষ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরিষৎ-প্রকাশিত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ "সাহিত্য ও নীতি" বঙ্গবাণী পত্রিকার ১৩৩১ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শুভ উৎসব ও মহৎ অনুষ্ঠান 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন'। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে বাঙলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান" করিয়া "পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপন শাখা স্থাপন" করিয়া "পর্য্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন" করিবার প্রস্তাব করেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়।[১] ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৭-২৮ চৈত্র ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য-শাখার সভাপতি, ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

১. 'সাহিত্য পরিষদ'—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৮৩-তম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, পৃ. ২৯-৩৮ ও পাদটীকা পৃ. ৩৮-৩৯ দ্রষ্টব্য)

ইতিহাস-শাখার সভাপতি, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী দর্শন-শাখার সভাপতি, ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং নাটোরের মহারাজা জগদিনাথ রায় মূল সভাপতি নির্বাচিত হন এবং উৎসব-সভা অলঙ্কৃত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এই সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি শরৎচন্দ্রের একখানি আলোকচিত্র তোলেন 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর গল্পলেখক, বর্তমানে প্রখ্যাত স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ার শ্রীভূপতি চৌধুরী। আলোকচিত্রটি শরৎচন্দ্র মুন্সীগঞ্জ সম্মিলনে যাওয়ার পূর্বে তাঁহার বাজে শিবপুরের বাসায় গৃহীত হইয়াছিল। এই আলোকচিত্রটি তৎকালে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শরৎশতবার্ষিকীতে পরিষদের প্রদর্শনীতে এই চিত্রটি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরিষৎ-প্রকাশিত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নথিপত্রে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের সাংবাৎসরিক কার্য্যবিবরণ প্রসঙ্গে মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নিম্ন-উদ্ধৃত কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :

"আলোচ্য বর্ষের ২৭এ ও ২৮এ চৈত্র ঢাকা মুন্সীগঞ্জ নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশন হয়। দেশবন্ধু স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি অসুস্থতাবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই। রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয়দ্বয় অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সম্মিলনের মূল সভাপতি ছিলেন নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ., পি-এইচ. ডি. মহাশয় ইতিহাস-শাখার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় দর্শন-শাখার এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, এম. এ, পি-এইচ. ডি. মহাশয় বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মুন্সীগঞ্জ অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে শরৎচন্দ্র একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। সভাপতির অভিভাষণটি "আর্ট ও দুর্নীতি" নামে পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৭-২৮শে চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে শরৎচন্দ্র যখন ঢাকায় যান তখন আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত শরৎচন্দ্রের পত্রগুলি আলোকচিত্রসহ পরিষৎ প্রকাশিত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। "শরৎস্মরণিকা" গ্রন্থে রমেশচন্দ্রের 'শরৎস্মৃতি' প্রবন্ধ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শরৎ-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে রমেশচন্দ্রের পঠিত 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৮২, পৃ. ৫২-৫৩) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পঁচিশে বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ত্রিপুরা-শাখা রবীন্দ্রজন্মোৎসবে

শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন। অভিনন্দন পত্রটি নিম্নে মুদ্রিত হইল :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ত্রিপুরা শাখার অভিনন্দন পত্র

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী, সর্বজন সম্মোহন
ঔপন্যাসিক, বাণীর বরপুত্র, স্বদেশপ্রাণ, জন্মভূমির
একনিষ্ঠ পূজারী পরম শ্রদ্ধাভাজন
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়
শ্রীকরকমলে—

স্বাগতম্!

আধুনিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আদি লীলাভূমি ত্রিপুরায় বঙ্গমাতার সুসন্তান বাণীর বরপুত্র তোমাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আজ আমরা তোমাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

তোমার মোহন স্পর্শে বাংলার সাহিত্য-কানন অশেষবিধ ফল-পুষ্প-সম্ভারে শ্রীসৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও তোমার লেখনীতে পর্বতপ্রমাণ ভাবরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোথাও তোমার হাস্যরসের উজ্জ্বল রশ্মিপাত হৃদয়ের জমাট অন্ধকারকে অপসারিত করিতেছে, কোথাও তুমি দৃষ্টতঃ ঘৃণিত জীবনের ভিতরে মনুষ্যত্ব-নারায়ণের অধিষ্ঠান দেখাইয়াছ। হে ভাবুক, হে নবযুগের পথ প্রদর্শক, তোমাকে নমস্কার।

হে সমাজ-সংস্কারক, দেশের এবং সমাজের পঙ্কিলতা দূর করিবার জন্য, সত্য এবং ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য, দেশের নবশক্তি জাগরণের জন্য, তুমি যে সমাজদেহে নবভাবের প্রেরণা দিয়াছ, তজ্জন্য দেশবাসী তোমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে।

হে সত্যসন্ধ, তোমার অনুপম সৃষ্টি-চাতুর্য্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে এক অভিনব ভাব-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছে, এক নূতন সুরের ঝঙ্কার তুলিয়াছে, এক নূতন সত্যের আলোক আনিয়া দিয়াছে, তোমাকে আমাদের হৃদয়ের সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।

হে রাজনৈতিক, তোমার 'পথের দাবী', তোমার ভাব ও ভাষা, তোমার কার্য্য ও কথা মৃতপ্রায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে ও করিতেছে। হে মাতৃ-সেবক, তুমি নব বিকাশোন্মুখ, নব জাগ্রত, দেশপ্রাণ, প্রবীণ ও তরুণদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর।

হে বিপ্লবী, হে মাতৃমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উপাসক, হে মুক্তিকামী তোমাকে নমস্কার। তুমি গতানুগতিকের পাশ কাটাইয়া, সাহিত্যে ও সমাজে নবভাব প্রচার করিয়াছ, সর্বজীবে নর-নারায়ণের সত্তা উপলব্ধি করিয়াছ, স্বাধীনতার বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছ, বঙ্গ সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছ। হে দেশপ্রেমিক, ভগবান তোমাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন। বাণীর অর্চনায়, দেশের সেবায় তোমার জীবন ধন্য হউক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ত্রিপুরা শাখার সভ্যবৃন্দ আবার তোমাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছে।

কুমিল্লা
২৫শে বৈশাখ
১৩৩৮ বাং

তোমার গুণমুগ্ধ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্
ত্রিপুরা শাখার সভ্যবৃন্দ

১৩৪০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (জানুআরি ১৯৩৪) ফরিদপুর সাহিত্য সম্মিলনে শরৎচন্দ্র মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্ততিতম বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজনের প্রস্তাব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠানের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পূর্বতন সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এই সমিতির সভাপতি এবং পরিষদের সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ বসু এই সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণ হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইল :

"রবীন্দ্র জয়ন্তী

আলোচ্য বর্ষে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততিবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে একটি উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি গঠিত হয়। আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই সমিতির সভাপতি এবং পরিষদের সম্পাদক এই সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন।......

৯ই পৌষ ১৩৩৮ তারিখে টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভা ও প্রদর্শনীতে পরিষদের সভাপতি আচার্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় পরিষদের মানপত্র পাঠ করিয়া কবিবরকে উপহার দেন। তৎপরে ১৩ই তারিখে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয়ের প্রদত্ত কবিবরের এক মর্ম্মরমূর্তি পরিষদের সভাপতি মহাশয় পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেইদিন অপরাহ্নে কবিবরের সম্বর্ধনার জন্য পরিষদ্ মন্দিরে প্রীতি-সম্মিলন হয়।"

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানের এক মাস পূর্বে শরৎচন্দ্রের রচিত ও ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ তারিখে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত ও আচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর স্বাক্ষরিত অভিনন্দন পত্রটি নিম্নে মুদ্রিত হইল :

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। তোমার সপ্ততিতম বর্ষ শেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন, আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে, বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত সেবক না ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি। ইতি

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮ই অগ্রহায়ণ '৩৮

শরৎচন্দ্রের লিখিত এই অভিনন্দনপত্র তিনখানি সোনার পাতে উজ্জল কালো রঙের মীনাকারিতে রচিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিন অনুরাগী সদস্য আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কালিদাস নাগ ও অমল হোম এই অভিনন্দনপত্র নির্মাণে শিল্পকর্মের জন্য শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুর সহিত পরামর্শ করেন। মীনাকারির জন্য নন্দলাল অভিনন্দনটি স্বহস্তে লিখিয়া দেন এবং কলিকাতা, ভবানীপুর, কাঁসারীপাড়ার স্বর্ণকার-পল্লীর বিখ্যাত মণিকার ও মীনাকার আশুতোষ দত্ত এই মীনাকারি প্রস্তুত করিয়া দেন। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির লিখনের সুন্দর অনুকরণ এই স্বর্ণময় অভিনন্দনপত্র তিনখানিতে কিছু কিছু অলঙ্করণও আছে, আধুনিক ভারতশিল্পের ইহা এক অভিনব নিদর্শন। এই তিনখানি সোনার পাতে রচিত অভিনন্দনপত্রের আলোকচিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১১ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) টাউন হলে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে পরিষদের সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু অসুস্থ থাকায় পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি কবি কামিনী রায় শরৎচন্দ্র-রচিত এই অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিয়মাবলী অনুসারে দেশ-বিদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত হন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসের (জুলাই ১৯৩৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সদস্যগণ চারিজন স্বনামধন্য সাহিত্যিককে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্বাচিত করেন—জলধর সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্র সেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক সমিতি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে শরৎচন্দ্রকে পরিষদের সাহিত্য শাখার সভাপতি পদে নির্বাচন করেন।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার প্রামাণ্য গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় প্রকাশ করিয়াছেন (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', ৫২ সংখ্যক পুস্তক)।

বঙ্গের মনীষী ও সাহিত্যিকগণের এবং ভারত-সংস্কৃতির অনুরাগী বিদেশী মনীষিগণের চিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অমূল্য সম্পদ্। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ৩ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুআরি ১৯৫৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় শরৎচন্দ্রের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উৎসব সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

উপহৃত পুস্তক-তালিকা

১৩৮৩

অনাদিভূষণ দাস, ২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৬

১। কল্পনা—কালীশ মুখোপাধ্যায়

২। নজরুল কথা—শান্তিপদ সিংহ

৩। The story of the English People—J. Funnimore

অনিমেষ দাশগুপ্ত, ২০৯বি, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা ২৯

১। দাদাতত্ত্ব, ১ম খণ্ড—অনামী

২। দাদা প্রসঙ্গে, ১ম, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড অনামী

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা

১। ব্যায়াম, বিশেষ করে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে—অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

অনিলধন মুখোপাধ্যায়, ১৮এ, ব্রজনাথ লেন, কলিকাতা ১২

১। আমাদের ত্রিপুরা (পত্রিকা) : ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা

অবনী চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা

১। মিশালী—অবনী চট্টোপাধ্যায়

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১। অসম্ভবের দেশে—হেমেন্দ্রকুমার রায়

২। ডুয়েল—ময়ূখ চৌধুরী

৩। তিন ভূতের কীর্তি—অমিয়কুমার চক্রবর্তী

৪। বন্ধু অমল—অরুণ আইন

৫। মেঘদূতের মর্তে আগমন—হেমেন্দ্রকুমার রায়

৬। সুন্দর বনের নরখাদক—তাহাওয়ার আলি খান্

৭। হেমেন্দ্রকুমারের কিশোর সঞ্চয়ন—হেমেন্দ্রকুমার রায়

অমরনাথ বসু, ৫০ কাঁটাপুকুর, হাওড়া-১

১। বায়ুবাহী বিষন্নতার জাপানুরা—অমরনাথ বসু

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ১০এ, তেলিপাড়া রোড, কলিকাতা-২৬

১। গোয়েন্দা সোম—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

২। ফকড়দার মজার মজার গল্প—"

অমলেন্দু ঘোষ, সোদপুর, ২৪ পরগণা

১। দ্বৈতস্বর—অমলেন্দু ঘোষ

অরবিন্দ গুহ (ইন্দ্রমিত্র), পি ৪০, দক্ষিণ বেহালা রোড, কলিকাতা-৬১

১। ইতিহাসে আনন্দবাজার—ইন্দ্রমিত্র

২। *বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা*— ”

৩। শরৎ কথামালা— ”

অশোক উপাধ্যায়, ১৩, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৬

১। অধিবেশন : কলিকাতা ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ -কেশবচন্দ্র সেন

২। অনিঃশেষ—অমিয় চক্রবর্তী

৩ আনন্দ-মেলা, পূজাবার্ষিকী, ১৩৮৩

৪। এক্ষণ—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য, স°

১১শ বর্ষ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৮২

১২শ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা ১৩৮৩

৫। ঐতিহাসিক, ১ম বর্ষ, বৈশাখ ১৩০৩

৬। ” শ্রাবণ ১৯৭৬ খ্রী:

৭। কলকাতা (দ্বিতীয় রাজনৈতিক সংখ্যা)—জ্যোতির্ময় দত্ত, স°

৮। কৌশিকী ১৩৭৭-১৩৮১—তারাপদ সাঁতরা, স°

৯। গুরুঠাকুর—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। চোর বা বাহাদুর—নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

১১। ডালিম (নাটক)—বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

১২। ডেভিড হেয়ার ও উনবিংশ শতকের বাংলা—নির্মলকুমার খাঁ ও বীণা চট্টোপাধ্যায়, স°

১৩। ধর্মানুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৪। নজরুল কথা—শান্তিপদ সিংহ

১৫। নব-কল্লোল, বৈশাখ ১৩৮৩

১৬। নিশাঠাকুরের কড়চা—শশিভূষণ দাশগুপ্ত

১৭। নিষিদ্ধ বাংলা—শিশির কর

১৮। *নীল দর্পণের ইংরেজী অনুবাদ ও মধুসূদন প্রসঙ্গ*—তপোবিজয় ঘোষ

১৯। *বঙ্গের রত্নমালা*—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

২০। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা—রাজনারায়ণ বসু

২১। বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর ডায়েরী—অরূপরতন ভট্টাচার্য

২২। বীরভূম কাহিনী—রেবতীমোহন সরকার

২৩। মহল্লোকদিগের সচিত্র জীবন বৃত্তান্ত—ত্রিভঙ্গচাঁদ মুখোপাধ্যায়
২৪। মহাপৃথিবীর কবিতা—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৫। ললিতা, শারদীয়া সংখ্যা—১৯৬৭-৬৮, ৭১-৭৪ খ্রী:
২৬। শরৎ-রচনাপঞ্জী—দীপক গোস্বামী, সংক°
২৭। শারদীয়া বেতার জগৎ, ১৯৭৫ খ্রী:
২৮। *শিল্পী, শারদীয়া ১৯৬৬ খ্রী:*
২৯। শীত বসন্তের গল্প—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩০। শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয় হীরক জয়ন্তী, ১৯৭৫ খ্রী:
৩১। শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিকথা—হরিহর চট্টোপাধ্যায়
৩২ সমকালীন, ১ম-১২শ সংখ্যা, ১৩৮৩
৩৩। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৩য়+৪র্থ, ১২শ সংখ্যা ১৩৮৩।
৩৪। হাতের পাঁচ—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অশোককুমার কুণ্ডু, 'অশোক নিলয়', গ্রাম—বোড়হল, পো:—কালিপাড়া, জেলা—হুগলী

১। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী, ১৩৮৩—অশোককুমার কুণ্ডু, স°

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

১। দুই নারী ও তিন নায়িকা—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অসীমকুমার দত্ত, ২২/১এ, নন্দন রোড, কলিকাতা-২৫

১। শিকল ভাঙার কাহিনী—অসীমকুমার দত্ত

আবুল কাসেম চৌধুরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

১। মোহাম্মদ মণিরুজ্জমান কাব্যসংগ্রহ—মো: মণিরুজ্জমান

আশা দাস, হুগলী

১। শরৎ-স্মারক গ্রন্থ : জন্মশতবার্ষিকী, ১৩৮৩

ইউনাইটেড স্টেটস ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস, (U. S. I. S) কলিকাতা

1. The Collected Poems of Theodore Roe.
2. Sixteen modern American authors—Jackson R. Brayer, ed.
3. The Complete poems of Emily Dickinson—Emily Dickinson
4. Catch-22—Joseph Heller
5. The Pictorial history of the American revolution—Ruper Furneaux.
6. The Clasic short history—*Ira Konigsberg, ed.*
7. The American heritage : Pictorial atlas of the United States history.

8. Whitman : A Collection of critical essays—Roy Hove Pearce.
9. Mark Twain : a god's fool—Hamlin Hill
10. Hemingway : The writor as artist—Carlos Baher
11. Fifteen American authors before 1900—Rees R. A. and E. N, *Herbert, ed.*
12. *A Death in the family James Agee*
13. The Damnation of Theron Ware—Harold Frederic
14. Seven American Stylists—George T. Wright, ed.
15. Fifty years of American short history, Vol. I & II.—William Abrahams.
16. The Enduring Hemingway : An anthology—Charles Scribner, ed.
17. Leaves of grass—Walt Whitman
18. To kill a mocking bird—Harper Loe
19. Theodore Droiser—John J McAleer
20. Marde—Herman Melville
21. A Modern instance W.D. Howells
22. American novel and its tradition Richard Chase
23. A hort history of the United St tes—Allan Navins & H S. Commager
24. The Frontier in American his ory Jackson Turner Frederiok
25. The Collected poems of Wallace Stevens
26. Essays on the American Revolution—G. Kartz Stephens & J. H Hutson, ed.
27. O'Neill—Louis Sheaffer
28. The marble Faun—Nathaniel Hawthorne.
29. Backgrounds of American literary though Rod W. Harton & others
30. Tender in the night—F. Scott Fitzgerald.
31. Drums—James Boyd
32. The Comic imaginatiou in American literature—Louis D. Rubin, ed.
33. Bright book of life—Alfred Kazin

উদিতেন্দু প্রকাশ মল্লিক, ৯ হেষ্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১

১। ঝড়ের দিনে—উদিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক

ঋতীশ চক্রবর্তী, সম্পাদক 'রা' পত্রিকা, কলিকাতা-৫৪

১। 'রা' পত্রিকা, বিশেষ সংকলন, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৮৩

২। ঐ শারদ সংকলন, ১৩৮৩

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা-১২

১। বিশ্বসাহিত্যের আঙ্গিনায় (১ম খণ্ড)—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
২। গীতসূত্র সার (১ম খণ্ড)—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া—আশুতোষ ভট্টাচার্য
৪। বাংলার লোকনৃত্য— ঐ
৫। সুভাষ আলেখ্য—প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী
৬। মন চল গঙ্গা যমুনা—অমূল্য সেনগুপ্ত

ওরিয়েণ্ট বুক কোং, কলিকাতা-৭

১। মুক্তবেণী—প্রমথনাথ বিশী
২। মহাত্মা গান্ধী—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৩। রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা—অর্চনা মজুমদার

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯, রামমোহন মুখার্জী রোড, হাওড়া

১। যান্ত্রিক, ১৯টি সংখ্যা

কারেণ্ট বুক স্টল, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

১। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—দেবেশ চট্টোপাধ্যায়
২। বাংলা মঙ্গল কাব্যের আলোচনা—অমলেন্দু গুপ্ত ও অমলেন্দু চৌধুরী
৩। ত্রিকাব্যের আলোচনা ঐ

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ১০৩ লেক টাউন, কলিকাতা-৫৩

১। রবিবাসরীয় — কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
২। বর্ধমান বন্দনা — ঐ
৩। মাতামহের শ্রাদ্ধ ও হুসাষ্টক — ঐ

Curator, Byculla Museum, Bombay 127

1. Brief guide to the museum

কিশোরীদাস বাবাজী, হালিশহর, ২৪ পরগণা

১। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, ১৩৮২ সাল—কিশোরীদাস বাবাজী, স
২। ঐ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঐ
৩। ঐ ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৮৩

কুমারেশ ঘোষ, ২৮।৩।আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলিকাতা-৫৪

১। ষষ্টিমধু, ১৩৮২

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য্য, ৬৩-এ রসা রোড ঈস্ট ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-৩৩

১। শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক—কুমুদকুমার ভট্টাচার্য্য

কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী, রিষড়া, হুগলী

১। তিনশতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজচিত্র—কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী

ক্ষেত্রমোহন কর, ১৩২, কে. এন. সেন রোড. কলিকাতা-৪২

১। শ্রীশ্রীনদীয়া যুগল ভজন—ক্ষেত্রমোহন কর

গণেশ লালওয়ানী, কলিকাতা-৭

1. Jain Journal No. 1—4, vol. X, 1975 ; Nos. 1—3 vol. XI, 1976

২। শ্রমণ—গণেশ লালওয়ানী স°. ১ম বর্ষ, ১৩৮০

৩। ঐ ৩য় বর্ষ. ১৩৮২

৪। ভূমা—গণেশ লালওয়ানী, অনু.

গিরীন্দ্রনাথ দাস, বারাসত, ২৪ পরগণা

১। বাংলা পীর সাহিত্যের কথা—গিরীন্দ্রনাথ দাস

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৪১ হরিশ নিয়োগী রোড, কলিকাতা-৬৭

১। বাংলার কীট পতঙ্গ—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গোপালচন্দ্র রায় সাহিত্য সদন, এ/১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

১। শরৎচন্দ্র, ১ম খণ্ড (জীবনী)—গোপালচন্দ্র রায়

গোপীনাথ সেন, ৩৩বি, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

১। স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা—গোপীনাথ সেন

গৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১। কাব্য বিচিত্রা, ১ম অর্ঘ্য—গৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, ৪ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯

১। রাজনগরের ইতিহাস ও অন্যান্য গল্প—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ, ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১। ত্রিনয়ন—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, আরণ্যক, ব্যারাকপুর স্টেশন রোড, ব্যারাকপুর ২৪ পরগণা

১। দুর্গ বাড়ী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, ৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১। কালোত্তীর্ণ সম্পদ—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Germany. 9th Congress of the Socialist Unity Party

1. Report of the party 5 Cops.

জিজ্ঞাসা, ১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-১২

১। বাংলাভাষা—পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য

২। বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে—অশোককুমার দে

৩। ভিয়েতজিও —যোগেশচন্দ্র বাগল

৪। ছেড়ে আসা গ্রাম দক্ষিণারঞ্জন বসু

জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী কলিকাতা

১। ভক্তকণ্ঠমালা -জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী

জীবনকৃষ্ণ শেঠ, ৪১/২৪ নটবর পাল রোড, কদমতলা, হাওড়া-৫

১। *ট্রাজিডীর তত্ত্ব ও রূপ —জীবনকৃষ্ণ শেঠ*

২। ভারত সাধনা — ঐ

জে. এন. দাস, কলিকাতা

১। সীমান্তর, বিশেষ সংখ্যা, ৩য় বর্ষ

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা

১। বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) ৩য় খণ্ড,—রমেশচন্দ্র মজুমদার

২। ,, ,, (মুক্তি সংগ্রামে) ৪র্থ খণ্ড- ঐ

ডাইরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, কলিকাতা-১

১। গান্ধীজীকে জানতে হলে ভি. আর. রাও

Director, V. V. B. Institute of Sanskrit & Indological Studies Hoshierpur, Punjab.

1. Descriptive Catalogue of Manuscript of the V. V B. I. S. . S. (Punjab University).

Directorate of Census Operation, West Bengal.

1. District Census Handbook of Midnapur, Pt. X-A, 1971.
2. District Census Handbook of Calcutta. Pt. X-A & B, 1971
3. District Census Handbook of Burdwan, Pt. X-A & B, 1971

তুলি কলম, ১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

১। হোমার রচনাসমগ্র (ইলিয়ড ও ওডিসি) সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, অনু°

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩১, একবালপুর রোড, কলিকাতা-২৩

১। দরবার নটী কলাবন্ত —দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

২। বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীত চর্চা— ঐ

দেবকুমার বসু, ৯৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

১। মানুষ শরৎচন্দ্র —বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

২। হয়ত অর্জুন —প্রণবকুমার বসু

৩। মনের আকাশ - হরেন ঘোষ

৪। হয়ত গোলাপ— জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

৫। গোলাপের বনে ঝড়—রমেশ পুরকায়স্থ

৬। কোলাজ—সন্দীপ দত্ত

৭। পায়রার নখের আঁচড়—সন্ধ্যাশ্রী চক্রবর্তী

৮। অন্যমুখ আরেক আকাশ—নীরদ রায়

৯। ঝুল বারান্দা—চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। বুকের নির্জনে নদী—নন্দদুলাল আচার্য্য

১১। মুসাফির—প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

১২। আমি ভাবলাম—রতিরঞ্জন মণ্ডল

১৩। অনুভব-অন্বেষণ পরিক্রমা—পার্থ রাহা

দেবনারায়ণ গুপ্ত, ৮এ, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৬

১। নায়িকা ও নাটমঞ্চ—দেবনারায়ণ গুপ্ত

দ্বিজেন পাল, মুঙ্গের

1. Souvenir : Saratchandra Centenary celebration Committee 1976.

ননীগোপাল দত্ত, ৩৭ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭

১। নবকলি, শরৎ সংকলন ১৩৮৩

নন্দ মুখার্জী, ৫৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

1. Keshab Chandra Sen—Max Muller

নবকুমার শীল, কিশোর কল্যাণ পরিষদ, কলিকাতা-৬

১। কিশোর কল্যাণ রজত জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩৮২

নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-৯

১। কমিউনিজম কি? প্রশ্ন ও উত্তর।

নরেশচন্দ্র জানা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

১। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুক্রমণিক—নরেশচন্দ্র জানা ও বিমানবিহারী মজুমদার

নলিনীমোহন দাশগুপ্ত, ১৪।৩ বি, গিরীশ বিদ্যারত্ন লেন, কলিকাতা-৯

১। মহাভারত (হস্তলিখিত পুঁথি)

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন, পুরুলিয়া

১। শিশু সাহিত্য, সংকলন ২ কপি

নির্মল গুপ্ত, জগাছা, হাওড়া

১। বাংলা আমার বাংলা, ২ কপি—নির্মল গুপ্ত

নির্মল দাস, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

১। চর্য্যাগীতি পরিক্রমা—নির্মল দাস

নির্মলকান্তি মজুমদার, কলিকাতা

১। অ্যারিষ্টটলের পলিটিক্স—নির্মলকান্তি মজুমদার

নির্মলকুমার খাঁ, হাওড়া

১। ডেভিড হেয়ার ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—নির্মলকুমার খাঁ ও অন্যান্য সং

২। ছয় ঋতু—বীণা চট্টোপাধ্যায়, সং

নির্মলচন্দ্র নাগ, সিলেট, বাংলাদেশ

১। পদাবলী পরিচয়—নির্মলচন্দ্র নাগ

নির্মলেন্দু বিশ্বাস, গ্রামীণ সঙ্গীত সমাজ, নদীয়া

১। স্মৃতিকণা—নির্মলেন্দু বিশ্বাস

নীলকণ্ঠ সাহা, ৩৬বি, সিমলা রোড, কলিকাতা-৬

১। মালঞ্চ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। সংকল্প ও স্বদেশ—ঐ

৩। চোখের বালি ঐ

৪। তিন পুরুষের কবিতা - ঐ

৫। কাব্য মঞ্জুষা মোহিতলাল মজুমদার

৬। অভিন্নহৃদয়েষু—মনোতোষ সরকার

৭। গৌতম বুদ্ধ—ত্রিভঙ্গ রায়

৮। পদি পিসীর বর্মী বাক্স—লীলা মজুমদার

৯। বরকনে নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১০। বন মল্লিকা—নলিনীকুমার ভদ্র

১১। নীলদিগন্ত—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১২। ভারতীয় ফুটবল—চিরঞ্জীব

১৩। চিরবসন্ত—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৪। রাত্রির যাত্রী—হেমেন্দ্রকুমার রায়

১৫। আবার রবিনহুড্—দীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৬। ছায়া কালো কালো—বুদ্ধদেব বসু

১৭। তিন তরঙ্গ—প্রতিভা বসু

১৮। মিতালি মধুর রবীন্দ্রনাথ দাস

১৯। লক্ষ্মী এলো ঘরে—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২০। হাসির অ্যাটম বোম (সংগ্রহ)

২১। শিশুসাথী (বার্ষিকী)

২২। জন্মদিনের উপহার—শিবরাম চক্রবর্তী

২৩। তিন বন্ধু— স্বপনকুমার

২৪। অপরাধী— ঐ

২৫। বার হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি –বিনয় চৌধুরী

২৬। প্রতিধ্বনি পত্রিকা ১০ খানি

ন্যাশানাল পাবলিশার্স, কলিকাতা-৬

১। শবের শরীর —কৃষ্ণা বসু

২। রাশিয়া দেখে এলাম —রণেন মুখোপাধ্যায়

পবিত্র চক্রবর্তী, কলিকাতা

১। পাঁচালী, জানুআরি-ফেব্রুআরি, ১৯৭৬

২। ঐ মে, ১৯৭৬

পরেশ ঘোষ, করিম বক্স রো, গভঃ হাউসিং এস্টেট, ব্লক-বি, কলিকাতা-২

১। মানুষ শরৎচন্দ্র—পরেশ ঘোষ

পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য, সল্ট লেক, কলিকাতা

১। শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ স্মরণে পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য

পুলকেশ দে সরকার, ৩১সি/১৫ হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা ৯

১। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা পুলকেশ দে সরকার

পূর্ণেন্দুকুমার সেন, গৌহাটি

১। সেন বংশের শঙ্করপুরের ইতিকথা পূর্ণেন্দুকুমার সেন

প্রজ্ঞান রায় চৌধুরী, কলিকাতা

1. The Untold story—B. M. Kaul.
2. Political Verse & Song from Britain & Ireland—Asraf Mary. & Ereland.
3. K. Mapke
4. গণসঙ্গীত সঙ্কলন
5. ভারত শ্রমজীবী—কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় স°
6. The First Indian War of Independence, 1857-59—Karl Marx & F. Engels.
7. The Great Victory of the Chinese People's Liberation Army.
8. The Cossacks—L. Tolstoi
9. Classics of Russian literature—J. S. Turgenev.
10. History of the Communist Party of the Soviet Union.

প্রণতি সরকার, কলিকাতা

১। শরৎচন্দ্রের কবি মানস—প্রণতি সরকার

প্রদোষ দত্ত, হাওড়া

১। ভালবাসা এবং অপর্ণা—প্রদোষ দত্ত

২। প্রবাসী মন—প্রভাত দত্ত

প্রবোধচন্দ্র বসু, ৮৩, প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা-৯

১। মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত—প্রবোধচন্দ্র বসু

প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া

১। স্মৃতি সুন্দর—প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমতোষ সেনগুপ্ত, ১৫২/১ এ, আর, এন. গুহ রোড, কলিকাতা-৭৪

১। আয়ুর্ব্বেদীয় পুঁথি—৩ খানি

বন্দিরাম চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা

১। বন্দেমাতরম্ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

২। উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাকরণ ও রচনা—পঞ্চানন চক্রবর্তী ও বন্দিরাম চক্রবর্তী

বরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা

১। বেঁটে বাচ্চুর গপ্পো বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫২ নীলকমল কুণ্ডু লেন, হাওড়া-২

১। শরৎ পরিক্রমা বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বলাইচন্দ্র হাজরা, ৩, রমানাথ মজুমদার, স্ট্রীট কলি-৯

১। ডেবরা থানার ইতিকথা বলাইচন্দ্র হাজরা

বাসুদেব মোশেল কলিকাতা

1. A Mystic sage Ma Anandamavi—Shyamananda Banerji

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা

১। চীনের উপকথা—জয়ন্তকুমার, অনু

২। ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি—সমরজিৎ কর

৩। গল্পময় ভারত, ১ম খণ্ড—সুশীল জানা

৪। স্বর্ণমুকুট—গোপেন্দ্র বসু

৫। চোরের পাল্লায় চকরবরতি শিবরাম চক্রবর্তী

৬। সুন্দরবনের চিঠি—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৭। অথ ভারত কথকতা—কথক ঠাকুর

৮। বিজ্ঞানের দুঃস্বপ্ন—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। সাহিত্য বিতান—মোহিতলাল মজুমদার

বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা

১। কারার ফুল, ১ম, ২য় ও ৩য় স্তবক নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ চৌধুরী, শিলং, আসাম

১। ভারতবর্ষ—বিভূতিভূষণ চৌধুরী

২। শতাব্দীর প্রণাম — ঐ

৩। শরৎচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সংখ্যা — ঐ

বিমল মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

১। সাহিত্য বিবেক - বিমল মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী, কলিকাতা

১। ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, কলিকাতা

১। সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস - বীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা

১। তারার আলো—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক—অমিতাভ চৌধুরী

৩। সোভিয়েটের দেশে দেশে - মনোজ বসু

বেলা দেব, কলিকাতা

১। পরমার্থ সঙ্গীত—৺রাজকুমার নন্দী মজুমদার

ভারবি, কলিকাতা

১। বাল্মিকী রামায়ণ, ২য় খণ্ড—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অনু.

২। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য

৩। জন্মেছি এই দেশে—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সং

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা

১। সংকলিতা —মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

২। ডোভার পেরিয়ে — ঐ

মনোজ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, কলিকাতা

১। রাজকন্যার স্বয়ম্বর—মনোজ বসু

২। সোবিয়েতের দেশে— ঐ

৩। সবুজ চিঠি — ঐ

৪। সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল —ঐ

মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা

১। সোনার হরিণ—নারায়ণ চক্রবর্তী

২। একদিন অনেক রাতে—রঞ্জন সেন

৩। ঝংকার —আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৪। গুরু — সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৫। সিক্রেট স্পাই – চিরঞ্জীব সেন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা

১। পলাতক সৈনিক —আশাপূর্ণা দেবী

২। কলকাতার কাছেই গজেন্দ্রকুমার মিত্র

৩। মরণের পরে —সুমথনাথ ঘোষ

৪। বেনিফিট অফ্ ডাউট্ —প্র না. বি.

৫। পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় —সৈয়দ মুজতবা আলি

মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা

১। সমাজতন্ত্র ও সদ্য স্বাধীন জাতিসমূহ - আর. উইলিয়ানভস্কি।

২। ইতিহাসের ধারা —সুশোভন সরকার

রঘুনাথ মল্লিক, ২০৭/এ/১এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা-৫৪

১। কালিদাস প্রতিভা —রঘুনাথ মল্লিক

৪, কৌটিল্য মার্গ, চাণক্য পুরী, নিউ দিল্লী ১১০০২১

1. Economic History of British India —R. C. Dutt
2. Famines in India — Do
3. Literature of Bengal — Do

4-5. Speeches and papers on Indian question (2 copies)—Do

6. Kings of Kashmir—Jogesh Chandra Dutt
7. Ancient India, Vol I —R. C. Dutt
8. ,, ,, Vol II — Do
9. ,, ,, Vol III — Do
10. Mahabharata (The epic of ancient India condensed into English Verse) Do
11. The Peasantry of Bengal—R. C. Dutt
12. England and India— Do
13. The great epics of India - Do

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

১। বাংলা নাট্যনিয়ন্ত্রণের ইতিহাস - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ৫নং এস এন ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩

১। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট : শরৎ-জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা (১৮৭৬-১৯৭৬)

রমেন চৌধুরী, ৪, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

১। অশ্রুকমল রমেন চৌধুরী

২। নির্বাচিত কবিতা— ঐ

৩। ওমর পঞ্চাশিকা— ঐ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

১। সাহিত্যতীর্থ, ২২শ বার্ষিকী, ১৩৮২

২। সন্ধ্যার জ্যোৎস্না সকালের রোদ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

রাধু গোস্বামী, কলিকাতা।

১। অন্বেষণ, জুলাই, ১ম সংকলন, ১৯৭০

রূপা এণ্ড কোং (ডি মেহরা), কলিকাতা

১। Origin and Development of Bengali Language ? 1-3 vols.

Sunitikumar Chatterjee

রেখা চট্টোপাধ্যায়, ৭৩ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬

১। শারদীয়া "আভা"—রেখা চট্টোপাধ্যায়, স°

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা

১। কালান্তরের পাথিক রমাঁ্যা রলাঁ—প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত

শচীন্দ্রনাথ বড়পাণ্ডা, ৩৩বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১। ঊষা : ৩০শ বর্ষ, ১৩৮২

শরৎ-জন্ম শত বার্ষিকী উৎসব সমিতি, কোলাঘাট, মেদিনীপুর

১। শতাব্দী স্বাক্ষর : শরৎ জন্ম শত বার্ষিকী উৎসব স্মারক

শান্তিময় মিত্র, কলিকাতা-৪০

১। সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়, ২য় সং

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-৫৪

১। সচিত্র লাঠি খেলা শিক্ষা—শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শান্তিলতা রায়, ৩৪ সেণ্ট্রাল রোড, কলিকাতা-৩২

১। বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন—শান্তিলতা রায়

শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা

১। সংহতি ৪র্থ বর্ষ, ১৩৮২

শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

১। The footprints on the road to Indian independence—

Kalicharan Ghose

২। সংস্কৃত নাটকের গল্প -অমিতা চক্রবর্ত্তী

৩। প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য —নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪। সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু, স

শুক্লা দে, ১৮৬/১ নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩

১। মিছিলে তোমার আলো—শুক্লা দে

২। অদ্বৈত সাধনার সম্পদ মনুষ্যত্ব -আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

১। রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা - অশোক সেন

২। কাছাড়ের কান্না - পরিতোষ পালচৌধুরী

৩। The Bengal Vaishnavism and modern life

K. L. Datta and K. M. Purkaystha

৪। ধর্ম্ম সমীক্ষা --ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত

৫। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র - সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

৬। সমাজ মনোবিদ্যা—জগদীশ্বর সান্যাল

৭। আবার চীন দেখে এলাম --হেমাঙ্গ বিশ্বাস

সতী ঘোষ, ৩০ রিজেন্ট এস্টেট, কলিকাতা-৩২

১। পদরত্নাবলী (২ কপি)—সতী ঘোষ

২। দাক্ষিণাত্যের আড়বার গীতি ও
বাংলার বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (২ কপি)—ঐ

৩। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর
ক্রমবিকাশ (২ কপি)—ঐ

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২ কপি)—ঐ

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, ২৯-এ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

১। আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা, ১ম পর্ব (১৯২৭—৪৫)—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সদানন্দ দাস, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বর্ধমান শাখা

১। পল্লী কবি ভোলানাথ মোহান্ত --সদানন্দ দাস

২। রূপ চতুর্দ্দশী : পল্লীকবি ভোলানাথ মোহান্ত (৪ কপি)—সদানন্দ দাস

সনৎকুমার মিত্র, ৭, সত্যেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৭

১। কর্ত্তাভজা ধর্ম্মমত ও ইতিহাস, ১ম পর্য্যায়,—সনৎকুমার মিত্র স

সন্দীপ রায়, ১৪, আর. জি. কর রোড, কলিকাতা-৪

১। ক্যালকাটা ফিল্ম সার্কল, দশম বর্ষপূর্ত্তি স্মারক, ১৯৬৫-৭৫ । ২ কপি

সমরেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৬৭ সি, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩১

১। স্ফুলিঙ্গ—সমরেন্দ্রচন্দ্র বসু

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ২১১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

১। মহাজন বাণী—স্নেহলতা দাস, সঙ্ক°

২। ব্রাহ্মসঙ্গীত চয়নিকা

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র -শিবনাথ শাস্ত্রী

৪। আত্মজীবন স্মৃতি - নীলমণি চক্রবর্ত্তী

৫। আত্মচরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র

৬। আত্মীয় সভার কথা —প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

১। অন্যান্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ—ডাঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

২। নজরুল কাব্য পরিচয়—মধুসূদন বসু

৩। দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান—ডাঃ ভবানীগোপাল সান্যাল

৪। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। Metaphysics at a glance—S. P. Dasgupta

৬। Some problems of phylosopy of religion — Do

৭। A study of Alexander's space, time and deity— Do

সিরাজুল হক, বামনীগ্রাম, লাবপুর, বীরভূম

১। কমলাকান্ত পাঠক, সম্বর্দ্ধনা স্মরণিকা, ১৩৮৩

সুকুমার রায়, ২৫ এ, ডাক্তার জগবন্ধু লেন, কলিকাতা-৫

১। ভারতীয় সঙ্গীত : ইতিহাস ও পদ্ধতি—সুকুমার রায়

সুকুমারী দত্ত, ৯।৬।১ সি, পিয়ারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৬

১। কাব্যগ্রন্থাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। লিখন সুরেন্দ্রকুমার বসু

৩। পদ্মা—প্রমথ রায় চৌধুরী

৪। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা—জে. এন. হালদার

৫। শেষ মিনতি—সন্তোষকুমার বিশ্বাস

৬। বিদায় বাণী —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৭। মানব গীতা—যোগীন্দ্রনাথ বসু

৮। হাসির গান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৯। দেবী চৌধুরাণী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০। চন্দ্রহাস—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১১। যৌবনপথে—চণ্ডীচরণ বসাক
১২। পাতঞ্জল দর্শন —তারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী
১৩। খিল হরিবংশ
১৪। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর গ্রন্থাবলী - ভারতচন্দ্র
১৫। মায়ের ছেলে বিভা দেবী
১৬। শরৎ গ্রন্থাবলী (বসুমতী সাহিত্য মন্দির)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৭। ছোট ছোট গল্প—যোগীন্দ্রনাথ বসু
১৮। ভন নদীর গতিপথে—সুধীন সরকার
১৯। বাংলার নবরত্ন—অমরেন্দ্রনাথ বসু, অনু°
২০। মেজ বৌ —শিবনাথ শাস্ত্রী
২১। গন্ধর্ব নগর—যোগীন্দ্রনাথ বসু
২২। কবিতা প্রসঙ্গ— ঐ
২৩। সরল প্রবন্ধ ও কবিতা—যোগীন্দ্রনাথ বসু
২৪। সীতা— ঐ
২৫। কমলা—সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
২৬। পৃথ্বীরাজ—যোগীন্দ্রনাথ বসু
২৭। কনক ছায়া—ঐ
২৮। পতিব্রতা, ১ম-৩য় খণ্ড—ঐ
২৯। গিরীশ গ্রন্থাবলী—গিরীশচন্দ্র ঘোষ
৩০। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—ভারতচন্দ্র
৩১। কুরুক্ষেত্র—যোগীন্দ্রনাথ সরকার
৩২। শিবাজী—যোগীন্দ্রনাথ বসু
৩৩। বেতাল পঞ্চবিংশতি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সুখময় চক্রবর্ত্তী, পি ১১৬ সি. আই. টি স্কীম।৬-এম, কলিকাতা-৫৪

১। মহাভারত, ১ম—২য় খণ্ড

সুধীরকুমার বসু, ১২ ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

১। কলিকাতানামা এবং—সুধীরকুমার বসু

সুনীল দাস, ৪৫।৫ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

1. Reference service—S. R. Ranganathan

সুনীলকুমার দাস, ২০।১, বৈদ্যনাথ ঘোষাল রোড, কলি-৫৬

১। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিগ্‌দর্শন সুনীলকুমার দাস

সুবিমল মিশ্র, গ্রাম+পোঃ—চিঙ্গুরদনিয়া, মেদিনীপুর

১। নাট্যকার মধুসূদন—ক্ষেত্র গুপ্ত

সুধেন্দু মল্লিক, *পি ২১১, ভি ব্লক, লেক টাউন, কলি-৫৫*

১। কেয়াকে সর্বস্ব—সুধেন্দু মল্লিক

২। বৃষ্টিকে করেছে বৃষ্টি — ঐ

৩। কতগুলো ঢেউ - অর্চনা পুরী

৪। সারদাতত্ত্ব— ঐ

৫। A sheaf of waves—Archana Puri

সুশান্তকুমার মিত্র, ২৫ এ, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

১। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা -সুশান্তকুমার মিত্র

হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

১। রাঙাজবা—কাজী নজরুল ইসলাম

২। দ্বিজেন্দ্র গীতি—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৩। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ১ম-২য় খণ্ড—ঐ

৪। সামবেদ সংহিতা—পরিতোষ ঠাকুর, স°

হরিসাধন বেদপুরাণতীর্থ, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলি-৩৫

১। পথের আলো, ১০ম বর্ষ, ১৩৮২

হারাধন দত্ত, সরকারী আবাস. বালিটিকুরি, হাওড়া

১। নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—নবীনচন্দ্র সেন

২। সুরঞ্জনা, একটি নদীর নাম — খগেন মাইতি

৩। কমরেড হিরণ্ময় গাঙ্গুলীর রাজনৈতিক বক্তব্য— ঐ

৪। মুক্তিধারা—প্রফুল্লকুমার দত্ত

৫। *Indian Mirrer, 1904—1907*

হিমালয়নির্ঝর সিংহ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

১। অমিলের মিল—হিমালয়নির্ঝর সিংহ

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ১২৬, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪

১। চিত্রে নবদ্বীপ—শরদিন্দুনারায়ণ রায়

২। ব্রহ্মচারী বাবার জীবনী ও পত্রাবলী

৩। ব্রহ্মচারী বাবার পত্রাবলী —কণিকারঞ্জন কানুনগো স°

৪। রাজস্থান-কাহিনী

হৃষীকেশ ঘোষ, শিবপুর, হাওড়া

১। পল্লী উন্নয়ন, সমস্যা ও প্রস্তাব—হৃষীকেশ ঘোষ

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৪১ দেব লেন, কলিকাতা-১৪

১। বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক জীবনী, ১ম খণ্ড—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য

২। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীষের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পাশ্চাত্য বৈদিক সঙ্ঘের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সংশোধন

পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় ছত্রে 'মাঘ' স্থলে 'কার্ত্তিক' হইবে

ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ

রামদুলাল দে

(১৭৫২—১৮২৫)

শ্রীমদনমোহন কুমার রচিত

ভূমিকা : আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

"অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক প্রায়-বিলুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার করিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে বাঙ্গালাদেশের তরুণ গবেষকদের কাছে একটি নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইল।"

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"উহাতে যে কেবলমাত্র রামদুলাল দে প্রকট হইয়া উঠিয়াছেন তাহা নয়, সমসাময়িক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ও তৎকালীন বাণিজ্যিক পরিবেশের একটি পরিপূর্ণ চিত্রও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। *অনেক অজ্ঞাত ও স্বল্পজ্ঞাত তথ্য গ্রন্থটিতে বিধৃত হইয়া রহিল বলিয়া* ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও হইবে অপরিসীম। নিরাভরণ বর্ণনার গুণে গ্রন্থটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, পাঠকেরা ইহার মধ্যে বিগত কালের এক ভিন্ন জাতের ও বৃহৎ মাপের বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পাইয়া পুলকিত হইবে।"

—শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

পুরাতন উড্‌ এনগ্রেভিং হইতে ও প্রাচীন তৈলচিত্র হইতে মুদ্রিত চারখানি দুর্লভ ছবি। বোর্ড বাঁধাই। ১১৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় টাকা ॥

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও কাব্য

শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত

কবি করুণানিধানের ব্যক্তিজীবন; দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, হেমচন্দ্র বাগচী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সহিত করুণানিধানের সম্পর্ক; সতীশচন্দ্র বাগচি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, জগদিন্দ্রনাথ রায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সহিত অন্তরঙ্গতা; কবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা; কবির লিখিত ও কবিকে লিখিত অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ; বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বা গ্রন্থে প্রকাশিত করুণানিধানের সমগ্র কবিতার বর্ণানুক্রমিক সূচী সমন্বিত করুণানিধান ও সমসাময়িক সাহিত্য-জগৎ সম্পর্কিত আকর-গ্রন্থ ॥

"*এই বইখানি বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের আলোচনায় এবং যুগপৎ জীবনী-সাহিত্যের* উন্নয়নে একখানি বহুমূল্যবান আকর-গ্রন্থ হইয়া থাকিবে।"

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কবির স্বাক্ষরিত অপ্রকাশিত প্রতিকৃতি ও অন্যান্য ৪ খানি দুর্লভ হাফটোন চিত্র। সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই। ডবল ডিমাই ১৬ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৬৮০। মূল্য ২৮·০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

শরৎজন্মশতবার্ষিকীতে

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার সম্পাদিত

ভূমিকা : আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের বহু রচনার মূল পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, রবীন্দ্রনাথ-রচিত শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনপত্র, শরৎচন্দ্র-রচিত ও জগদীশচন্দ্র বসু স্বাক্ষরিত রবীন্দ্রজয়ন্তীর অর্ঘ্যপত্র ও 'পথের দাবী' সম্পর্কিত ব্রিটিশ সরকারের গোপন নথিপত্রের আলোকচিত্র // হিরণ্ময়ী দেবী, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল হোম, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, অবিনাশ ঘোষাল, শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সাহিত্যিক ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে লেখা শরৎচন্দ্রের অসংখ্য মূল পত্রের আলোকচিত্র // শরৎচন্দ্রের শেষ স্বাক্ষরে ব্যবহৃত কলম ও চশমা এবং এ যাবৎ অ-প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের জন্মপত্রিকার আলোকচিত্র // বিভিন্ন পরিবেশে শরৎচন্দ্রের আলোকচিত্র //

"এই পুস্তকখানিকে শরৎচন্দ্রের জীবনের নানা অপ্রকাশিত দিকের এক অভিনব প্রকাশভূমি বলিতে পারা যাইবে। নানা সূত্র হইতে এবং বহু ব্যক্তি ও বহু সংগ্রহশালা, সরকারী কাগজপত্র ইত্যাদির হেফাজৎখানা হইতে সম্পাদক যেসকল অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া, সেগুলির আলোকচিত্র প্রস্তুত করিয়া এবং ফোটোস্ট্যাট্ পদ্ধতিতে প্রতিলিপি করাইয়া তৎসম্বন্ধে টীকাটিপ্পনী দিয়াছেন, সেই প্রকার ভারতবর্ষের অন্য কোনও লেখক বা মনীষীর জীবনের ক্ষেত্রে, এইরূপ তথ্য-বহুল প্রামাণ্য আকর-গ্রন্থ ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।"

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অজস্র আর্ট প্লেট। ১০৬ খানি ব্লক। মূল্যবান্ আর্ট পেপার ও ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ। ২৪.৫ × ১৮ সে মি সাইজ।

মূল্য : ত্রিশ টাকা

শ্রীমদনমোহন কুমার, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭/এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।